বিশ্বখ্যাত ফোর্ড মোটরগাড়ি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা
হেনরি ফোর্ড-এর দুনিয়াব্যাপী সাড়া জাগানো বই
সিক্রেটস অব
জায়োনিজম
(বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির)
ভাষান্তর ।। ফুয়াদ আল আজাদ

প্রকাশকের কথা

এক সন্ধ্যায় ছেলেটা অফিসে এলো। সুদর্শন তরুণ, চেহারায় একটা মায়ামাখা দ্যুতি। কথা বলছেন খুবই বিনয়ী কণ্ঠে। নাম ফুয়াদ। পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কয়েক মিনিটেই টের পেয়েছিলাম—এই ছেলের মাথায় বিশেষ কিছু আছে।

আমতা আমতা করে বলল– 'আমি একটা বই অনুবাদ করেছি, *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*-কে দেখাতে চাই।' নীলক্ষেত থেকে সবুজ কভারে অনুবাদ গ্রন্থটি বাঁধাই করে নিয়ে এসেছিল ফুয়াদ। ওপরে লেখা-'The International Jew'। স্বাগত জানিয়ে বললাম– এখনই বইটি দেখা একটু কঠিন; আপনি কি বইটি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন, প্লিজ?'

খানিক সময় নিয়ে ফুয়াদ ভাই শুরু করলেন। বিশ্বখ্যাত গাড়ি কোম্পানি ফোর্ড এবং তার মালিক হেনরি ফোর্ড সম্পর্কে প্রথমে বললেন। এরপর ফোর্ড কেন বইটি লিখলেন, তা জানালেন। কীভাবে বইটি আমেরিকার বুক মার্কেট থেকে হাওয়া হয়ে গেল, ৫৫ বছর পরে আবার প্রকাশিত হলো, তা জানলাম।

ফুয়াদ ভাইয়ের ৩০ মিনিটের ভূমিকা শুনে 'থ' বনে গেলাম। কী বলে এই তরুণ! জায়োনিজমের বিরুদ্ধে কত-শত মানুষ বলছে, লিখছে; এমন কথা তো কখনো কোথাও শুনিনি! হুংকার শুনি, প্রতিহতের ডাক শুনি, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব শুনি, কিন্তু জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম কখনোই এভাবে কোথাও থেকে বুঝিনি। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। জায়োনিস্টরা তাহলে এভাবে ফাংশন করে! না জানি কখন আমরাও তাদের শিকারে পরিণত হই!

সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—আমরা এই অনুবাদগ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবো। কাজ শুরু হলো। বইটি প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে ফুয়াদ ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিন-তিনবার পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছি। নতুন করে কাজ করে নিয়েছি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অনুবাদক কাজ করে দিয়েছেন, উদ্যম হারাননি। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পর এক বছর পর্যন্ত প্রকাশনা সংস্থার অফিসে এলেও যে তরুণের মুখে হাসি লেগেই থাকে, তাকে কী বলে ধন্যবাদ দেওয়া যায়?

আলহামদুলিল্লাহ! ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এর বইমেলায় আসছে *সিক্রেটস অব জায়োনিজম : বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির*। মূল ইংরেজি বই চার খণ্ডের, আমরা বাংলাভাষায় এক খণ্ডেই প্রকাশ করছি। মূল বইয়ের ৮০ পর্ব থেকে কিছু পর্ব বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ, সেসব আলোচনা একান্তই আমেরিকার সমাজ ও নাগরিকদের জন্য বিশেষায়িত। বইয়ের কলেবর না বাড়ানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে কিছু কলামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা হয়েছে। ভিন্ন আলোচনার টপিক নিয়ে আমরা অধ্যায়ের নামকরণ করেছি। ১৯২০ সালে লেখা এই বইয়ে যেসব ডাটা ছিল, তার হালনাগাদ তথ্য রেফারেন্সসহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটা দারুণ গ্রন্থ এখন আপনাদের হাতে। আপনি এখন অবাক চোখে জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম পড়বেন, শিহরিত হবেন, আঁতকে উঠবেন। আগামী দিনের পৃথিবীকে যারা নেতৃত্ব দিতে চান, অবশ্যই তাদের এই গ্রন্থে একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া উচিত। আপনার চারপাশের সচেতন মানুষদের জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম নিয়ে সতর্ক করবেন– প্রত্যাশা এটাই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

অনুবাদকের কথা

কেন ইহুদিদের নিয়ে এত আলোচনা? নিশ্চয় সবাই একমত হবেন, আন্তর্জাতিক বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান এই আলোচনাতেই নিহিত। তাদের নিয়ে মানবতাবাদী বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং কৌতূহলীদের গবেষণার অন্ত নেই। কীভাবে হাজার বছরের একটি জাতি আজকের দুনিয়াতে প্রতাপশালী ভূমিকায় আবির্ভূত হলো, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য, এই অনুসন্ধানে ইহুদিদের পক্ষ হতে তেমন কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তাদের ব্যাপারে অপ্রীতিকর কিছু প্রকাশ পাক, এমনটি তারা কখনোই চায় না; হোক তা সত্য বা মিথ্যা। তাদের আকাঙ্ক্ষা– সাধারণ মানুষ সেভাবেই তাদের ইতিহাস জানুক, যেমনটা তারা চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্ট এমনই একটি উদাহরণ।

অনেকে বলে এবং স্বয়ং ইহুদিরাও দাবি করে, তাদের পেছনে অদৃশ্য একটি শক্তির আশীর্বাদ রয়েছে; যার কল্যাণে বহু নিপীড়ন সহ্য করেও তারা আজ ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হয়েছে। হেনরি ফোর্ড তাঁর *The International Jews* বইয়ে উপস্থান করেছেন– কী সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ!

ইহুদিদের বলা হয় প্রোপাগান্ডা মেশিন। এই মেশিন তারা দুই কাজে ব্যবহার করে। প্রথমত, নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যদের দ্বারা প্রচারিত যেকোনো মতবাদের বিরুদ্ধে। এই প্রোপাগান্ডা মেশিনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল হেনরি ফোর্ডকেও।

প্রথম দিকে ১৯১৯ সালের মে মাস হতে *The Dearborn Independent* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নিয়মিত ইহুদিদের বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আর্টিকেল প্রকাশ করতেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি থেকে তাঁর প্রতিটি আর্টিকেল ৯ লাখ কপি পর্যন্ত বিক্রি হতো। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তা পঠিত হতো। ইহুদিরা এ পর্যায়ে প্রোপাগান্ডা মেশিন নিয়ে মাঠে নেমে পরে। সত্যি বলতে বিশ্ব গণমাধ্যমের একটি বড়ো অংশ তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে। তারা দাবি করে, অবান্তর ও ভিত্তিহীন তথ্যের মাধ্যমে হেনরি ফোর্ড সাধারণ মানুষের মনে এন্টি-সেমিটিক ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে। একসময় মি. ফোর্ড থেমে যেতে বাধ্য হন। বইটিসহ তাঁর পত্রিকা প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বইটি সাধারণ মানুষের মনে যে দীর্ঘকালব্যাপী ইহুদিবিরোধী চেতনার দাগ কেটে গেছে, তা মুছে দিতে এই প্রোপাগান্ডা মেশিনকে আরও বহু বছর চলমান রাখতে হয়।

এ বইয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো– Protocols of the Elders of Zion। ইহুদিরা আজও এটিকে জার সাম্রাজ্য কর্তৃক ইহুদিবিরোধী প্রচারণার অংশ বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু প্রটোকলগুলোতে যা দাবি করা হয়েছে, তার সত্যতা কতটুকু? তার জবাব একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনা করলেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও চলচ্চিত্রশিল্প, ক্রীড়াশিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি, মাদকশিল্প ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাদের যে আধিপত্য, তার প্রারম্ভ যেভাবে হয়েছে– তা বিস্তারিত এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর পুনরায় ভিন্ন একটি ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তবে সময়ের প্রয়োজনে মূল আলোচনার পাশাপাশি বিগত দশকগুলোতে ঘটে যাওয়া প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

একটা কথা বলে রাখছি। পুরো ইহুদি জাতিগোষ্ঠীকে হেয় করা কখনোই এ বইটির উদ্দেশ্য ছিল না। তখনকার মতো এখনও অনেক বিখ্যাত ও কম-বিখ্যাত ইহুদি খুজে পাওয়া যাবে, যারা মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে; এমনকী তারা নব্য ইজরাইল রাষ্ট্রেরও বিরুদ্ধে। বইটির অধিকাংশ স্থানে যে ইহুদি জাতিয়তাবোধ ও চেতনার কথা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জায়োনিজমকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু মূল বইয়ের বেশিরভাগ স্থানে 'ইহুদি' শব্দটি উল্লেখ থাকায় এখানেও তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আরেকটি বিষয় বলে রাখা ভালো– বইয়ের কলেবর ছোটো রাখা ও সুখপাঠ্য করার স্বার্থে মূল বইয়ের চার খণ্ডের পরিবর্তে তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে মাত্র একটি খণ্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার জন্য কিছু কিছু স্থানে নতুন তথ্য উৎসসহ সংযোজন করা হয়েছে। তবে যেকোনো ভুলকেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ থাকল। অতিরঞ্জিত হলে তা জানানোর অনুরোধ করছি, যেন পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জিত আকারে পেশ করা যায়।

আশা করি বইটির অনূদিত সংস্করণটি পাঠকদের নিকট কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি মনোরঞ্জনেরও কাজ করবে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মনে এ বইটি ইহুদি বিতর্কের বিভিন্ন দ্বার উন্মোচনে সাহায্য করবে ।

ফুয়াদ আল আজাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ জানুয়ারি, ২০২০

ভূমিকা

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল। ইউরোপজুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া বইতে শুরু করে। ২৮ জুন, ১৯১৪, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী Archduke Franz Ferdinand সাইবেরিয়ান আততায়ীর হাতে নিহত হলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর হাঙ্গেরি যখন সাইবেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ইউরোপ দুই ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষ জার্মানি-হাঙ্গেরি-অস্ট্রিয়া-অটোমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি এবং অপর পক্ষ রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স-সাইবেরিয়ানদের মিত্রশক্তি। তখন জার্মানদের দাপটে মিত্রশক্তির খাবি খাওয়া অবস্থা।

তারা যে প্রযুক্তির সাবমেরিন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসে, তা ছিল সেই যুগের বিস্ময়। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে তারা তুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেয়। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ সেনা বিদ্রোহের আশঙ্কায় ফ্রান্স তখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। একই সময় রাশিয়ার আকাশে জমতে শুরু করে বলশেভিক বিপ্লবের কালো মেঘ। এমনিতেই জার সম্রাট কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এমন সব তরুণদের পাঠিয়েছিলেন, যাদের ছিল না কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ। ফলে বস্তাপঁচা লাশ হয়ে দেশে ফিরে আসে তারা। শুরু থেকেই মিত্রশক্তির ছিল তাল-মাতাল অবস্থা।

অপরদিকে, ১৯১৬ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত জার্মানির অভ্যন্তরে একটি গুলি পর্যন্ত ফোটেনি। তারা যেন হেসে-খেলে যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিল। ব্রিটেনকে শান্তি আলোচনায় আসার প্রস্তাব দেয় তারা। ব্রিটেনও ভাবছিল, একা একা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, তখন তার মিত্রশক্তিরা নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সামলাতে ব্যস্ত। ব্রিটেন শান্তি আলোচনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

কিন্তু জার্মান জায়োনিস্টরা ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীকে আশ্বস্ত করে, তারা চাইলে এখনও যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব। শান্তি-চুক্তিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা আমেরিকাকে এই যুদ্ধে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তবে এর বিনিময়ে তাদের হাতে প্যালেস্টাইনের চাবি তুলে দিতে হবে। কোনো উপায় না দেখে ব্রিটেন এই শর্তে রাজি হয়ে যায়। এরপর আমেরিকা তাদের রণতরি নিয়ে এগোতে শুরু করে। যুদ্ধের মোড় এখানেই পালটে যায়। পরবর্তী ছয় মাসের মাথায় কেন্দ্রীয় শক্তি পরাজিত হয়।

সাধারণ আমেরিকানদের মনে জার্মানবিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলতে সেখানকার ইহুদি মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো একের পর এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার শুরু করে। যেমন : জার্মানি একটি সন্ত্রাসী দেশ, তারা হান দস্যু, তারা রেডক্রসের নার্সদের বুকে গুলি ছোড়ে, নাবালক শিশুদের হত্যা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। মুহূর্তে যেন আমেরিকার সাধারণ জনগণ জার্মানদের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। যুদ্ধ শেষে শুরু হয় নতুন প্রচারণা। যেমন : জার্মানিতে ইহুদিরা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সেখানে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাদের ওপর সাধারণ মানুষ যুদ্ধের ঝাল মেটাচ্ছে, তারা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সহায্যের আশায় বসে আছে এবং সবাই যেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

এ নিয়ে ১৯১৯ সালে প্যারিসে শান্তি আলোচনার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল ১১৭ জন ইহুদি প্রতিনিধি, যাদের অনেকে ছিল জার্মান নাগরিক। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্যালেস্টাইন দাবি করে। জার্মান সম্রাট তখন মাথায় হাত দিয়ে বলেন– 'এই কি ছিল যুদ্ধের কারণ?' তিনি বুঝতে পারলেন, রাশিয়া হতে বিতাড়িত একদল বিশ্বাসঘাতককে নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্রিটেনের নিকট হতে আসে বেলফোর ঘোষণা।

'... A Jewish Defector Warns America (1961) '

Benjamin Freedman

ইহুদিরা পৃথিবীর প্রাচীন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের রয়েছে প্রায় তিন হাজার বছরের ইতিহাস। তবে এই ইতিহাস যতটা না ধর্মকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি জাত ও বংশকেন্দ্রিক। জনসংখ্যায় অতি নগণ্য হয়েও আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দিক থেকে তারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাদের প্রসঙ্গ সামনে এলেই যেন বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। এর পেছনে রয়েছে ঐতিহাসিক নানা দ্বৈরথ, গত কয়েকশো বছরের অসংখ্য ষড়যন্ত্র এবং প্যালেস্টাইনের ওপর চলমান নির্যাতন। যারা ছিল একসময়কার সবচেয়ে নিপীড়িত জাতি, তারাই আজ পৌঁছে গেছে নিপীড়কের নেতৃত্বে। সেই ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে তাদের যে উত্থান শুরু হয়েছে, তার ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মতো দেশগুলো একসময় ইহুদিদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, তারাই আজ তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করছে। কিন্তু তাদের এই উত্থান কীভাবে ঘটল? কীভাবে তারা আজকের ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হলো? কোন সে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তারা শাসন করে যাচ্ছে পুরো বিশ্বকে?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পরে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের উন্মাদনা। নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শিল্প-কারখানগুলোর চিত্র পালটে যেতে শুরু করে। পরিবর্তনের হাওয়ায় বদলে যায় বিশ্ব অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ। সে সময় পৃথিবী লক্ষ করে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব– 'জায়োনিজম'। বলে রাখা ভালো,

জায়োনিজম পৃথিবীর বহু প্রাচীন একটি মতবাদ। তবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে ১৮৯৭ সালে Theodor Herzl ও Max Nordau-এর হাত ধরে এই মতবাদটি একটি সাংগঠনিক রূপ পায়; 'World Zionist Organization'। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলে কীভাবে তারা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছে, তা অল্প কথায় এই অংশে কখনো উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

ইহুদিরাই তো পুঁজিবাদ এবং আধুনিক ব্যাংকিং শিল্পের জন্মদাতা। সুদভিত্তিক অর্থ-বাণিজ্যকে কাজে লাগিয়ে তারা সুকৌশলে কেড়ে নিয়েছে জ্যান্টাইল সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শেয়ারবাজারগুলোতে তাদের সংঘবদ্ধ দৌরাত্ম্য কত বিনিয়োগকারীকে যে পথের ফকির বানিয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। বিশ্ব শ্রমবাজার তাদের কণ্টকময় থাবায় জর্জরিত। লোহা, ইস্পাত, তামা, কপার, নিকেল ও স্বর্ণ-রৌপের খনিগুলো নিজেদের কবজায় নিয়ে কাঁচামাল শিল্পের ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য সৃষ্টি করেছে। জনমত নিয়ন্ত্রণে চারদিকে গড়ে তুলেছে অসংখ্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠান। চারদিকে বিপ্লব, আন্দোলন এবং বিভাজনের বীজ ছড়িয়ে দিতে সুকৌশলে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভয়ংকর সব মতবাদ। চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অশ্লীলতার সংযোজন ঘটিয়ে যুব সমাজের নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করে ফেলেছে। সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দিয়েছে নাস্তিকতার বীজ।

হেনরি ফোর্ড ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী; ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। শিল্প বিপ্লবের সেই সময়টিতে অন্যদের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন– অদৃশ্য সেই শক্তি তার প্রতিষ্ঠানেও থাবা বসাতে চাইছে। কিছু করতে না পারলে তার ভাগ্যেও অন্যদের মতো দেউলিয়ার থালা ঝুলবে। ব্যবসায় কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও পরিচালনা করতেন, যার নাম ছিল– *The Dearborn Independent*।

তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এই অদৃশ্য শক্তির মুখোশ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করেই ছাড়বেন। সে সময় একজন আমেরিকান হয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা যেনতেন কাজ ছিল না। বইটি পড়লেই এর কারণও জানতে পারবেন।

১৯২০ সাল থেকে তিনি ইহুদিদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের ওপর একের পর এক তথ্যপূর্ণ আর্টিকেল প্রকাশ করা শুরু করেন। এর ফলে তার পত্রিকার জনপ্রিয়তা খুব দ্রুতই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। সর্বত্র এটি নিয়মিত পঠিত হতে শুরু করে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া সেরা ৮০টি আর্টিক্যাল নিয়ে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন– *The International Jews*।

বইটি খুব দ্রুতই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এমনিতে জার্মান ও রাশিয়ানরা ইহুদিদের ওপর ক্ষেপে আছে, তার ওপর প্যালেস্টাইন ইস্যু তো রয়েছেই। এমতাবস্থায় এই বইটি সাধারণ মানুষকে যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে, তা তারা ভালো করেই আঁচ করতে পেরেছিল। সত্যের মতো এমন কোনো আধুনিক অস্ত্র নেই, যা সাধারণ মানুষকে এক করতে পারে। এ কারণে ইহুদিরা সত্যকে এত বেশি ভয় পায়।

শত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার পরও যখন ইহুদিরা বইটি বন্ধ করতে পারছিল না, তখন আমেরিকান প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্ট-এর বিশেষ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ১৯২৭ সালে ফোর্ড-এর বই ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান সিলগালা করে দেয়। তারপর থেকে সর্বত্র এর প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। মুদ্রিত যে কপিগুলো তখনও পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পড়ে ছিল, সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফোর্ড-এর ওপর প্রশাসনিক বল প্রয়োগ করা হয়, যেন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিছুদিন পর তার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি ফলাও করে চারদিকে প্রচার করা হয়। সাথে এও যোগ করা হয়– এই বইয়ের অধিকাংশ বিষয় ছিল মনগড়া, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে তারা কিছুটা হলেও জনমনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। ১৯৪০ সালে Gerald L.K. Smith ফোর্ড-এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তত দিনে তার মোটর গাড়ির জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী তুঙ্গে। আলোচনার এক পর্যায়ে বইটির প্রসঙ্গ চলে এলে ফোর্ড বলেন, তিনি বইটি প্রকাশের জন্য কখনোই ক্ষমা চাননি। Mr. Smith এ কথা শুনে প্রচণ্ড অবাক হন! তিনি বলেন– 'তাহলে সে সময় আপনার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি যে চারদিকে ফলাও করে প্রচার করা হয়!' উত্তরে ফোর্ড সাহেব বলেন– 'সব মিথ্যা, আমি কখনো ক্ষমা চাইনি। আমার কর্মচারী Harry Bennett সেই ক্ষমাপত্রে দস্তখত করেছিল, আমি নই। আমি এই বইটি আবারও প্রকাশ করতে চাই, তবে আদৌ তা সম্ভব হবে কি না জানি না।'

এই হলো বইটির প্রেক্ষাপট। বইটির অধিকাংশ কপি বাজার থেকে গায়েব করে দেওয়া হলেও তারপরও কিছু কপি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল। তাদের উত্তরসূরিগণ পরবর্তী সময়ে বইটির ডিজিটাল ভার্সন অনলাইনে আপলোড করে বলেই বইটি পুনরায় পাঠকদের কাছে ফিরে এসেছে। যারা বিশ্বে নানান ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। কোটি মানুষ বইটি পড়ছে। বাংলা ভাষায় বইটি পড়তে আপনাকে স্বাগতম।

সূচিপত্র

'ইহুদিদের ব্যতিক্রমধর্মী বেশকিছু নৈতিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : কঠোর শারীরিক শ্রমের প্রতি অনীহা, সন্তান উৎপাদনে অধিক আগ্রহী, তীব্র ধর্মীয় প্রেরণা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার অসাধারণ ক্ষমতা, সমবেত উপায়ে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার সক্ষমতা, যুদ্ধের মাঠে জীবন দেওয়ার অসীম সহাসিকতার অধিকারী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপায়ে শোষণধর্মী মানসিকতা, অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজেদের ফটকা পরিকল্পনাসমূহ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, প্রাচ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, সামাজিক প্রতিপত্তি নিয়ে অন্যদের ওপর অহংকার প্রদর্শন এবং সাধারণের চেয়ে উচ্চতর মেধাশক্তির অধিকারী হওয়া।' -*The New International Encyclopedia*

ইহুদি ইতিহাস

ইহুদিদের আবির্ভাব মানব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল কোনো যুগেই কম ছিল না। আজকের আধুনিক বিশ্ব যেসব খুঁটির (অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রতিটির পেছনেই রয়েছে ইহুদিদের অদৃশ্য আধিপত্য। জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হয়ে এক টুকরো নিরাপদ ভূমির খোঁজে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে যাযাবরের মতো।

পেরিয়ে গেছে প্রায় ২০০০ বছর। নির্যাতন-নিপীড়ন এখন তাদের জন্য নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। এ নির্যাতন ভোগের পেছনে তাদের প্রতি যে অন্যান্য সম্প্রদায়দের অ্যান্টিসেমেটিক[১] মনোভাব ছিল, তা বলা যায় না। কারণ, নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা আজ পর্যন্ত যত কৌশল উদ্ভাবন করেছে, তার অধিকাংশই সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধুসুলভ ছিল না। পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি ও অসাধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরুন তারা বারংবার বিতর্কিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

রাশিয়ায় ইহুদিরাই ছিল বলশেভিক[২] বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে তারা জবাই করেছে লাখো তাজা প্রাণ। সেই বিপ্লবের যারা খলনায়ক, তারাই আজ আমাদের চোখে মহানায়ক। জার্মান সাম্রাজ্য পতনের পেছনেও তারা সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক ছিল। তারা বিষাক্ত অণুজীব হয়ে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। এক এক করে দখল করে সেখানকার প্রতিটি শিল্প ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে তারা ইংল্যান্ডকে বানিয়েছে হাতের পুতুল। স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নিজেদের প্রাচুর্যতাকে করেছে পাহাড়সম। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে রক্তক্ষয়ী অন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে হাসিল করেছে নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

---

১. অ্যান্টি-সেমেটিক– ইহুদি বিদ্বেষী মনোভাব

২. বলশেভিক বিপ্লব– বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে এই বিপ্লবের সূচনা হয়, যার হাত ধরে কমিউনিস্ট সোভিয়েতের জন্ম হয়।

প্রবীণ ও তরুণ ইহুদিরা নিজেদের প্রাচুর্যতা ও উচ্চাভিলাসী মনোভাব কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে একটি যুদ্ধবাজ দেশে পরিণত করেছে, যা আজ তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। যেকোনো সরকারের শাসনামলে তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক পদ বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখা হয়। হোয়াইট হাউসেও রয়েছে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিষাক্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দিতে ইহুদি রাবাইদের[৩] যেন পরিশ্রমের শেষ নেই। তারা বলে– 'আশীর্বাদ চাইলে ইজরাইল যাও। কারণ, আমরাই সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায়।'

জনসংখ্যায় এত অল্প হয়েও তারা যেভাবে নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করেছে, তা ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জাতি পারেনি। পুরোনো ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির সবকিছু আজ তারা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিক পরিশ্রমী পদে কাজ করার ব্যাপারে তাদের রয়েছে তীব্র অনীহা। উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদগুলোতে সাধারণত জ্যান্টাইলদের[৪] ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সেলসম্যান, ম্যানেজার এবং ক্লার্কের মতো সহজ পদগুলো তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। প্রাচীন প্রুশিয়ানদের[৫] এক সমীক্ষা অনুযায়ী– তাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬৯৪০০ জন। এর মাত্র ছয় শতাংশ অর্থাৎ, ১৬১৬৪ জন ছিল ইহুদি, যার মধ্যে ১২০০০ জনই ছিল ব্যবসায়ী এবং ৪১৬৪ জন শ্রমিক। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ জ্যান্টাইল অর্থাৎ ২৫৩২৩৬ জনের মধ্যে মাত্র ১৭০০০ জন ব্যবসায়ী।

বর্তমান প্রেক্ষাপট অবশ্য ইতিহাস থেকে অনেক ভিন্ন। ব্যাবসা-বাণিজ্যের উঁচু পদগুলোতে আজ জ্যান্টাইলদের উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তাদের সংখ্যা যে হ্রাস পেয়েছে তা নয়; Jews Encyclopedia অনুযায়ী– বর্তমানে বিশ্বের বৃহদাকার প্রায় সকল বিপণিবিতান তারাই পরিচালনা করছে। ট্রাস্ট, ব্যাংক, কৃষি ও খনিজ সম্পদের মতো আরও অনেক শিল্প রয়েছে, যা তাদের কবজাধীন হয়ে পড়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও জ্যান্টাইলদের মালিকানায় রয়েছে, তার পেছনেও ইহুদিদের বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী কাজ করছে। প্রকাশনী শিল্পে তারা কতটা ক্ষমতাধর, তা সামনের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে। থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতে তাদের দ্বিতীয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

জার্মান লেখক Werner Sombart তার বই *Jews and Modern Capitalism*-এ উল্লেখ করেন–

---

৩. রাবাই–ইহুদিদের ধর্মীয় গুরু।

৪. জ্যান্টাইল–পৃথিবীর নন ইহুদি সকল সম্প্রদায়কে জ্যান্টাইল বলা হয়।

৫. প্রুশিয়ান–প্রাচীন এক ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র, যা জার্মানিসহ কয়েকটি দেশের সাথে মিশে গেছে।

'যদি আমেরিকার অভিবাসন হার, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্মহার এবং উন্নয়নসূচক একই ধারায় চলতে থাকে, তবে আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছর পর এ দেশ হবে নিগ্রো, ক্রিতদাস ও ইহুদিদের দেশ; যেখানে তারাই হবে ক্ষমতাধর জনগোষ্ঠী।'

আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে দুটি বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান রাখা উচিত।

প্রথমত : পৃথিবীর সব ইহুদিই সম্পদশালী নয়; তাদের মাঝেও ধনী-গরিব শ্রেণি আছে। তবে গরিব শ্রেণির দরিদ্র্যতার মূল কারণ– তাদের সম্পদশালী জ্ঞাতি ভাইয়েরা। মূলত কৌশলগত কারণেই তারা নিজেদের মাঝে এই শ্রেণি-পার্থক্যের জন্ম দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত : শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তারা নিজেদের ঐক্য ও জাতীয়তায় বিভাজন তৈরি করেনি। ফলে কৃতিত্ব ও সফলতা অর্জনের দিক দিয়ে অন্য কোনো সম্প্রদায় কখনোই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। আজকের আমেরিকা তো তারাই তৈরি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসন ও ক্ষমতার লড়াই নিয়ে পুরো পৃথিবী যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন অসংখ্য মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমেরিকায় অভিবাসী হয়। আর এই সুযোগ লুফে নিয়ে ইহুদিরাও দলে দলে আমেরিকায় প্রবেশ করা শুরু করে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর যেখানে একমাত্র অবলম্বন ছিল মেধা ও পরিশ্রম, সেখানে তাদের অবলম্বন অঢেল অর্থ-সম্পদ। তারা জন্ম দেয় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার। শুরু হয় শ্রমবাজারের সাথে পুঁজিবাজারের দ্বন্দ্ব। নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুঁজিপতিরা কিনে নিতে থাকে সাধারণ মানুষের মেধা ও শ্রম।

একটা সময় ছিল– যখন তারা শুধু কৃষি কাজ করত। রোমান সম্রাট কর্তৃক জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তাদের মূল পেশা। তাহলে কীভাবে তাদের আমূল পরিবর্তন হলো, আর কীভাবেই-বা উত্থান ঘটল?[৫]

আসলে Formative Period (১০০০ BC-৫০০ AD)-এর বিশেষ একটি শাসনব্যবস্থা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক কাঠামো ন্যায়সংগত করতে পয়গম্বর মোজেস[৬] 'Money aristocracy' আইনটির প্রচলন করেন। সুদ-বাণিজ্য এবং ঋণী ব্যক্তির জমি দখল করাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। তার আইনে চিরস্থায়ী আয়েশি জীবনের কোনো স্থান ছিল না। তিনি দখলদারদের হাত থেকে আত্মসাৎ হওয়া সকল জমি উদ্ধার করে জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করেন। এ আইন ৫০ বছর স্থায়ী ছিল; যাকে বলা হয় 'The Year of Jubilee'।

মোজেস–নবি মুসা (আ.)

কিন্তু এমন আইন মেনে চললে তো আর রাজকীয় সম্পদের মালিক হওয়া যাবে না। তাই মোজেস মারা যাওয়ার কিছুদিন পর তারা আবারও সুদ-বাণিজ্যে ফিরে আসে। মূলত, মুনাফার প্রশ্নে তারা কখনো আপস করতে রাজি ছিল না। তাই মোজেসের যেসব আইন অধিক মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধক, সেগুলোর প্রতিটি তারা পালটে দেয়। 'Law of Stranger' নামে তারা নতুন একটি আইন তৈরি করে। এ আইন অনুযায়ী অন্যান্য সম্প্রদায়দের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হতো। যেমন : একজন অপরিচিত জ্যান্টাইলের সাথে সুদ-বাণিজ্য করা যাবে, কিন্তু নিজ ধর্মের ভাইয়ের ওপর কখনোই সুদের বোঝা চাপানো যাবে না।

ইতিহাস বলে, ইজরাইল সব সময় একটি শাষকরাষ্ট্র হতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি রাজ্য তাদের কুর্নিশ করবে এবং তারাই হবে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না! জ্যাকব[৭] থেকে শুরু করে সকল পয়গম্বর চেয়েছিলেন– ইজরাইল পৃথিবীর বুকে একটি ন্যায়পরায়ণ জাতি হিসেবে টিকে থাকবে। ওল্ড টেস্টামেন্টও ঠিক একই কথা বলে। তাহলে কেন তাদের এই অধঃপতন। তা কীভাবেই-বা ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের ফিরে যেতে হবে ক্যানাইটদের[৮] যুগে।

আজ থেকে আনুমানিক ৩৯০০/৪০০০ বছর পূর্বে ইজরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান নীলনদের পূর্বাঞ্চলীয় অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল ক্যানাইটদের রাজত্ব। সে সময় পয়গম্বর আব্রাহামকে[৯] মেসোপটেমিয়ার কোনো এক স্থানে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। সৃষ্টিকর্তা তাকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করে ক্যানান ভূমিতে নিয়ে আসেন। আব্রাহাম যখন মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, তখনই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সাথে একটি সন্ধি করেন। বলা যেতে পারে এটা ইজরাইল জাতির মূল সূচনালগ্ন। আব্রামের নিরানব্বই বছর বয়সে প্রভু তাকে দেখা দিলেন এবং বললেন–

> 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাথে গমন করে পরিশুদ্ধ হও। আমি তোমার সাথে আপন নিয়ম স্থির করব এবং তোমার বংশকে অতিশয় বৃদ্ধি করব।'

আব্রাম তখন ভূমিষ্ট হয়ে পড়েন। ঈশ্বর বললেন–

> 'দেখ, আমি তোমার সাথে এই সন্ধি করছি, তুমি হবে বহু জাতির পিতা। তোমার নাম আর আব্রাম (মহাপিতা) থাকবে না; বরং হবে আব্রাহাম (বহুলোকের পিতা)। কারণ, তোমাকে বহু জাতির পিতা বানালাম। ...এই সমগ্র ক্যানান দেশকে আমি তোমাকে এবং তোমার ভাবী বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে প্রদান করব, আর আমি হব তাদের ঈশ্বর।' Genesis. 17:1-8

---

৭. জ্যাকব– নবি ইয়াকুব (আ.)

৮. ক্যানাইটদের– বাইবেলে উল্লিখিত এক অভিশপ্ত জাতি।

৯. আব্রাহাম–পয়গম্বর ইবরাহিম (আ.)

তারও অনেক আগে– সৃষ্টিকর্তা ঠিক এ রকমই একটি সন্ধি করেছিলেন পয়গম্বর নোয়াহের[১০] সাথে। পার্থক্য হলো– পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধরদের যেখানে ক্যানাইট ভূমির অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে পয়গম্বর নোয়াহের বংশধরদের সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ক্যানাইটরা হলো নোয়াহের কনিষ্ঠ পুত্র হ্যামের বংশধর। নোয়াহ সৃষ্টিকর্তার সাথে সন্ধি করেছিলেন– তার বংশধররা কেবল তারই উপাসনা করবে এবং তার প্রণীত সকল আইনকানুন মেনে চলবে। কিন্তু সেই সন্তানেরা একসময় একেশ্বারবাদের কথা ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতায় মেতে ওঠে। তারা ঈশ্বরের আইন অগ্রাহ্য করে নিজেদের মতো আইন রচনা এবং বিভিন্ন ভাস্কর্যের উপাসনা করতে শুরু করে। যেমন : আনাথ– যুদ্ধ-বিগ্রহের কুমারী দেবী, আথিরাত– সমুদ্র পরিভ্রমণকারী, আত্তার– প্রভাতের দেবতা ইত্যাদি। তাদের এই পেগানবাদ[১১] তত দিনে ক্যানানসহ অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরও অনেক পাপকর্মের দরুন তারা একসময় সৃষ্টিকর্তার অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়।

অপরদিকে, পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধরদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তাঁর পৌত্র জ্যাকবের অপর নাম ইসরাইল। এই নাম অনুযায়ী তাঁর ১২ পুত্র এবং তাদের বংশধরদের একত্রে বনি ইসরাইল বলা হয়। সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় ফেরাউনের রাজত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসার পর তাদের নিকট ঐশী বাণী আসে, তারা যেন ক্যানাইটদের সেখান থেকে বের করে দেয়।

কিন্তু তারা এই নির্দেশ অমান্য করে। তারা এই অভিশপ্ত জাতির সম্পদ ও প্রাচুর্যের মোহে পড়ে যায়। এমন একটি জাতিকে নির্বাসিত করে তারা সম্পদের মহাসমুদ্র হাতছাড়া করতে চায়নি। অবাধ্যতার সূচনা এখান থেকে শুরু। ধীরে ধীরে তারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বস্তুবাদী বিশ্বাসে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বর্গীয় নির্দেশ অমান্য করার দরুন তাদের ওপর যে শাস্তি নেমে আসে, তা বহুকাল বয়ে বেড়াতে হয়। অনেকের ধারণা– এই ক্যানাইটরাই আজকের ইহুদিদের সকল ক্ষমতা ও প্রাচুর্যতার মূল কারণ।

যাযাবর হলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রদূত হিসেবে তারা যে পুরো পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে, তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। একসময় চায়নাতে তাদের একটি জনগোষ্ঠী ছিল। সেক্সনদের[১২] সময় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তারা দলবলে ইংল্যান্ডে হাজির হয়। পিলগ্রিম ফাদাররা[১৩] দক্ষিণ আমরিকার প্লেমাউথ শিলায় আসার শত বছর আগ থেকে তাদের বণিকরা

---

১০. নোয়াহ– পয়গম্বর নুহ (আ.)

১১. পেগান–ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম ব্যতীত সব ধর্মকে পেগান বলা হয় এ ছাড়াও যারা মূর্তি ও প্রকৃতির উপাসনাকারী, তাদেরকেও এ নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

১২. সেক্সন–ইউরোপিয়ান এক প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী, যারা আজ বিভিন্ন জাতিতে ছড়িয়ে পরেছে।

১৩. পিলগ্রিম ফাদার–ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রথমে যে ইংলিশ নাগরিকগণ আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে, তাদের পিলগ্রিম ফাদার বলা হয়।

সেখানে রমরমা বাণিজ্য করত। ১৪৯২ সালে সেন্ট থমাস দ্বীপে তারা প্রথম চিনি কারখানা গড়ে তোলে। ব্রাজিলেও ছিল তাদের আফিম বাণিজ্য। তারা যে পৃথিবীর কোথাও চষে বেড়ানোর বাকি রাখেনি, তা ছোট্ট একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব; জর্জিয়াতে প্রথম যে সাদা বর্ণের শিশুটি জন্ম নেয়, সেও ছিল একজন ইহুদি– Isaac Minis।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিত্যনতুন কৌশল এবং উপকরণ উদ্ভাবনের প্রতিভা– সব যুগেই তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে সাহায্য করেছে। আজকের দিনেও ব্যবসায়িক লেনদেনে এমন অনেক জিনিসের ব্যবহার হচ্ছে, যার প্রকৃত আবিষ্কারক তাদের-ই কোনো না কোনো সদস্য। যেমন : পৃথিবীর প্রাচীনতম বিল অব এক্সচেইঞ্জের আবিষ্কারক হলো– Simon Rubens। তা ছাড়া কাগজের নোট, ব্যাংক নোট, বিভাগীয় বিপণিবিতান, দ্বৈত্ব করব্যবস্থা ইত্যাদি তাদেরই আবিষ্কার।

'Payable to Bearer (বাহককে প্রদেয়)' নিয়ে মজার একটি গল্প আছে। সাধারণত ধনী ব্যবসায়ীদের শত্রুর অভাব হয় না। এ কারণে ইহুদিদের শত্রুর অভাব ছিল না। কেউ যেন তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে না পারে, সে জন্য তারা সম্পদের পরিমাণ বা মালিকানা কখনো প্রকাশ করত না; বরং একজন বাহক-এর নামে এর মালিকানা গোপন রাখত। সে সময় তাদের সম্পদ জব্দ করা জলদস্যুদের জন্য বৈধ ছিল। তারা পণ্যের ওপর নিজেদের নাম না লিখে 'Bearer bill' ব্যবহার করত। তাই বোঝার কোনো উপায় থাকত না, কোনটা তাদের পণ্য আর কোনটা জ্যান্টাইলদের। তখন ব্যবসায়িক লেনদেনে ব্যক্তি-বিশেষকে জামানত হিসেবে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাণিজ্যের চেয়ে পণ্যকেন্দ্রিক বাণিজ্যকে তারা অধিক গুরুত্ব দিত। কারণ, অর্থ পরিশোধের পূর্বে যদি ক্রেতা সাহেবের মৃত্যু হয়, তবে বিক্রেতা কখনো সে অর্থ দাবি করতে পারবে না, কিন্তু পণ্যকেন্দ্রিক বাণিজ্যে ক্রেতা সাহেব মারা গেলেও বিক্রেতা অন্তত তার পণ্য দাবি করতে পারবে। নতুন এই পদ্ধতি ব্যবসায় জগৎকে অনেক নির্দয় করে তোলে। কারণ, তখন মানুষ ব্যক্তি-বিশেষের চেয়ে পণ্য-সম্পদ রক্ষায় অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আজকের যে পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা, তার জন্মদাতা তো তারাই! তবে নিজেদের এ কীর্তি গোপন রাখতে 'জ্যান্টাইল ফ্রন্ট' নামে তারা নতুন এক কৌশল উদ্ভাবন করে। অর্থাৎ মুখোশ হিসেবে জ্যান্টাইলদের ব্যবহার করে, যেন ভেতরের মানুষটাকে কেউ চিনতে না পারে। এ জন্য বিপণিবিতান, ব্যাংকিং কোম্পানি, সংগীতের দোকান, থিয়েটার হল ও মদের দোকানগুলোতে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান, মুসলিম বা পেগানদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু পেছন থেকে যে এগুলোর কলকাঠি কোনো ইহুদি বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী নাড়ছে, তা অনেকের পক্ষেই বোঝা অসম্ভব।

যে স্টক একচেঞ্জ শিল্পকে কেন্দ্র করে আজ প্রতিটি দেশ বড়ো বড়ো পুঁজিবাজার গড়ে তুলছে, তাও তাদের প্রতিভার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ। বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, ফ্রাঙ্কফুর্ট

ও হাম্বার্গারের প্রথম সব স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রকগোষ্ঠী তারাই। ভেনিস ও জেনওয়াককে তো বলাই হতো ইহুদিদের শহর। আধুনিক ব্যাংকিং শিল্পের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর সেখানেই গড়ে ওঠে। তা ছাড়া ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ব্যাংক অব আমস্টারডাম, ব্যাংক অব হাম্বার্গ, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম ইত্যাদি তাদেরই পরিকল্পনায় গড়ে উঠে, যা আজও টিকে আছে।

তারা পৃথিবীর যেখানে গিয়েছে, সেখানেই পুরো অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। একসময় স্পেন ছিল স্বর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের বের করে দিলে স্পেনের অর্থনীতি এমনভাবে ভেঙে পড়ে, যা আজও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিভাগের ছাত্ররা প্রায়ই একটা বিষয় ভেবে খুব অবাক হয়– বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু কেন বারবার পরিবর্তিত হয়েছে?

জ্যান্টাইলদের রক্ত যেন ইহুদিদের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে, তাই বিয়ে-শাদির ব্যাপারে তাদের রয়েছে বিশেষ আইন। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন দলিল থেকে জানা যায়– তাদের সংগ্রহে এমন অনেক তথ্য থাকত, যা তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছেও থাকত না। দূরদর্শী ক্ষমতার দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য পৃথিবীতে আর কোনো জাতি ছিল না। ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা তারা পূর্বেই অনুমান করতে পারত। পরবর্তী সময়ে তা নিউজ লেটার আকারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করত। রাজ্য পরিচালনায় আগাম তথ্য যে কতটা মূল্যবান, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তাই এই অমূল্য তথ্যের প্রধান জোগানদাতা হিসেবে তারা সব সময়-ই কাজ করত; তা গুপ্তচর বৃত্তি করে হোক বা অন্য যেকোনো উপায়ে-ই হোক। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছিল তাদের আরেকটি কৌশল।

এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তারা প্রতিটি রাষ্ট্রে ঋণ ব্যবস্থার এজেন্ট বনে যায়। গড়ে তোলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক। প্রতিটি রাষ্ট্রে তাদের কিছু এজেন্ট থাকত, যারা সেখানকার আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখত। প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বড়ো অঙ্কের ঋণ দেওয়ার এখতিয়ার পর্যন্ত তাদের ছিল। তাদের বলা হতো 'Court Jew'। পরে এই ঋণ প্রতিটি রাজা-বাদশার ওপর বিশাল অঙ্কের দায় হিসেবে চেপে বসত। তারা কখনো রাশিয়ান জনগণকে নিয়ে ভাবত না; বরং ভাবত কীভাবে রাশিয়ার সরকারকে কবজায় আনা যায়। একই পরিকল্পনা করত জার্মানি, ফ্রান্স ও ইটালিসহ পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিয়ে। খুব কৌশলে তারা এক রাজাকে অন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দিত। ভয় ও কুসংস্কারের জাঁতাকলে কাবু করে রাখত প্রতিটি জাতিকে।

তবে এটা ঠিক যে, ব্যক্তি হিসেবে কিছু সৎ ও পরোপকারী ইহুদি সব যুগেই খুঁজে পাওয়া যাবে। শান্তির বাণী প্রচার করাই যে ইজরাইলের একমাত্র উদ্দেশ্য, এমন চেতনা কেবল তারাই লালন করে। তারপরও জাতিগতভাবে তাদের ওপর সাধারণ মানুষের যে বিদ্বেষ, তা কখনো বন্ধ হয়নি। তাদের নিয়ে একটি প্রবাদ আছে–

'ইজরাইল অনেকটা আঙুর গাছের মতো; তার শাখা-প্রশাখা যতই কাটা হোক না কেন, তা আবারও গজাবে। কারণ, তার শেকড় রয়েছে আছে মাটির অনেক গভীরে।'

আজকের যে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, তার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। জার্মান ইহুদি পরিবার রথসচাইল্ড হলো এই শিল্পের কান্ডারি। ইংল্যান্ড, ইটালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াসহ আরও অনেক দেশে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যখনই কোনো রাজার অর্থের প্রয়োজন হতো, তারা এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরবরাহ করত। আবার যদি কোনো রাজা মূল্যবান সম্পদ (স্বর্ণ, রৌপ্য, কপার ইত্যাদি) ব্যবহার না করে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে চাইত, তবে ব্যাংকারগণ চেকের মতো ছোট্ট একটি কাগজের টুকরো স্বাক্ষর করে সেই দেশের শাখায় পাঠিয়ে দিত। এই কাগজের টুকরো আজকের দিনে ব্যাংক চেক-এ রূপ নিয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম যে সামরিক বাহিনী গঠিত হয়, তাতেও ছিল ইহুদিদের মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ।

বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক অফিস স্থাপনের ধারণা সর্বপ্রথম তাদের মাথা থেকেই উদ্ভাবিত হয়। ফলে ইউরোপের দেশগুলোতে যখন নতুন কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা দেখা দিত, প্রথম তারাই সে খবর পেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'Peaceful Penetration' নামে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার দরুন আমেরিকার বাজার জার্মানদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এতে করে সে দেশের সাধারণ জনগণ লাভবান হয়েছে তা নয়। কারণ, পুরো ঘটনার আড়ালে ছিল সেখানকার ইহুদিরা। তারা জার্মানির নাগরিকত্বকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আমেরিকায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। সিন্ডিকেট উপায়ে প্রতিটি শিল্পের ওপর থাবা বসাতে শুরু করে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী নিরূপায় হয়ে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে আমেরিকা জার্মানি হতে প্রচুর তুলা আমদানি করে। আরও অনেক তুলা রপ্তানির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর তা আর রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি। মালিক সমিতি এত তুলা নিয়ে কী করবে? সব তো নষ্ট হয়ে যাবে! ফলে তারা বাধ্য হয় তুলা নিলামে ওঠাতে। এ সময় লন্ডনে থাকা ইহুদিরা সেই পাহাড় পরিমাণ তুলা নিলামের ভিত্তিতে কিনে নেয়। তারা যে মূল্যে তুলা ক্রয় করে, তা ছিল আমেরিকান বাজারমূল্য থেকে অনেক কম। এর উদ্দেশ্য ছিল বাজারে তুলার দাম কমিয়ে আনা। ফলাফল তাই হলো; রাতারাতি তুলার দাম কমতে শুরু করে। এই সুযোগে তারা আরও অনেক তুলা কিনে বাজারকে তুলাশূন্য করে। বাজার খালি হওয়ার পর তারাই আবার তুলার দাম বাড়াতে শুরু করে। কারণ, বাজারে তুলার ছিটেফোঁটা পর্যন্ত ছিল না। তারা প্রচার করে– বাজারে তুলার খুবই অভাব, তাই তুলাজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে বিশ্বযুদ্ধে তারা প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপট কতটা কঠিন রূপ নিয়েছে, তা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নির্দয় পুঁজিবাজার কখনো শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে পারেনি। শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহলগুলো সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। পুঁজিকে কুক্ষিগত করে স্বার্থান্বেষী মহল কুলি-মজুরদের পারিশ্রমিক পানির দরে নামিয়ে এনেছে। পুঁজিবাজার হলো শ্রমবাজারের ছাদস্বরূপ, কিন্তু এই ছাদ কখনো শ্রমজীবী মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারেনি।

পুঁজি বলতে আমরা মূলত অর্থকে বুঝি, যা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। আমরা ভুলবশত উৎপাদক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক ম্যানেজার ও চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাদ বলে থাকি। কিন্তু কীভাবে তাদের পুঁজিবাদ বলব, যখন তাদের ব্যবসায়িক পুঁজির জোগানদাতা অন্য কোনো বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী! মূলত এই বিনিয়োগকারীদের চাপে পড়ে উৎপাদক, ম্যানেজার এবং চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বভাবগত ভালো রূপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পায়ের নিচে মাটি ধরে রাখতে এবং বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ মেটাতে তারা শ্রমবাজারের ওপর কঠিন রূপ ধারণ করে। ফলে পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের মধ্যে সব সময় বিরোধ লেগে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ কখনোই সম্ভব নয়; যতদিন না বিশ্ব অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এই স্বার্থান্বেষী মহলের থেকে ছিনিয়ে আনা যাবে।

আজ পুরো পৃথিবী এমন কয়েকটি ভয়ংকর মতবাদে পরিচালিত হচ্ছে, যার অধিকাংশই আমাদের অজানা। যেমন : 'সুপার ক্যাপিটালিজম'- যেখানে বলা হয় 'স্বর্ণই প্রকৃত সম্পদ'। 'সুপার গভর্নমেন্ট' একটি পৃথক ও স্বাধীন সরকারব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠা করা। যতদিন না এই ভয়ংকর মতবাদ দুটোর অবসান ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে।

আমেরিকা আবিষ্কার

ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, আমেরিকা আবিষ্কার করেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তবে এটা শেখায়নি, তিনি কাদের সহযোগিতায় এ দেশের সন্ধান পান।

আজ অবধি যে সকল ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযান মানুষকে নতুন সব জ্ঞান ও প্রাচুর্যতা এনে দিয়েছে, তার অর্ধেক সম্ভব হয়েছে কেবল ইহুদিদের জন্য। যাযাবর জাতি হওয়ায় ইহুদিদের একটি বিশেষ সুবিধা হলো- পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কোথায় কী আছে, তা তারা খুব ভালো করেই জানে। তা ছাড়া সমুদ্রযাত্রায় মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি বহুকাল ধরে ব্যবহার করেছে, তার অধিকাংশই ইহুদিদের আবিষ্কার। যেমন : ম্যাপ, কম্পাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। এ কারণে সমুদ্র অভিযান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাদের মতো দক্ষতা আর কোনো জাতির ছিল না। এ জন্য প্রতিটি দেশের নৌবিভাগে তাদের আলাদা কদর ছিল।

/১৪৯২ সালের ২ আগস্ট ইহুদিদের তিন লাখ অধিবাসীকে স্পেন থেকে নির্বাসিত করা হয়। ঠিক তার পরদিন ৩ আগস্ট কলম্বাস তাদের মধ্যে একদল নাবিককে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমসমুদ্র পথে বেরিয়ে পড়েন। বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীর সাথে সখ্যতার কথা কলম্বাস বহুবার নিজ মুখে স্বীকার করেছেন। নিজের নতুন সব অভিযান পরিকল্পনা এবং আবিষ্কারের কথা প্রথমে তিনি এ দলকে জানাতেন।/

ছোটোকাল থেকেই শুনে আসছি, সমুদ্র অভিযানের প্রতি কলম্বাসের এতটা আগ্রহ দেখে রানি ইসাবেলা নিজের বহু স্বর্ণালংকার তাকে দান করে দিয়েছিলেন। সেই দানের অর্থে নির্মিত হয় জাহাজ, ক্রয় করা হয় প্রয়োজনীয় সব রসদপত্র। তবে এই দান যে তিনি এমনি এমনি করেননি, সেই তথ্য সহজে কোথাও উল্লেখ করা হয় না।

তৎকালীন স্পেন সাম্রাজ্যে রানি ইসাবেলার ঘনিষ্ঠ তিনজন ইহুদি উপদেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা হলেন– ভ্যালেন্সিয়ার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং রয়েল টেক্সাসের ইজারাদার Luis de Santagel, স্পেনের সরকারি কোষাধ্যক্ষ Gabriel Sanchez এবং রয়েল চ্যাম্বারলিনের সদস্য Juan Cabrero। মানুষের কল্পনাশক্তি কীভাবে প্রভাবিত করতে হয়, সেই জ্ঞান তাদের খুব ভালো করেই ছিল।

সে সময় স্পেনের অর্থনীতিতে খুব বাজে সময় যাচ্ছিল। বাণিজ্যে হিমশিম খাচ্ছিল বলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদের পরিমাণ কমতে থাকে। বিভিন্ন দেশ থেকে ধার-দেনা করে তাদের খাদ্য ক্রয় করতে হচ্ছিল। অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। সেকালে মানুষের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তারা বিশ্বাস করত, নতুন কোনো ভূমি খুঁজে পেলে হয়তো গুপ্তধন পাওয়া যাবে। মূলত এটি ছিল ইহুদিদের দীর্ঘকালীন প্রোপাগান্ডার[১৪] ফল। তারা সুকৌশলে রানির মগজেও এ বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দেয়। তিনি ভাবেন, সত্যি যদি কলম্বাস নতুন কোনো ভূমি খুঁজে পায়, তবে অবশ্যই সেখানে অনেক ধন-সম্পদ পাবে; যা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাই নিজের বহু স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেন। Luis de Santagel অভিযান শুরুর আগেই রানির নিকট অর্থের আবেদন করেন। তাকে ১৭,০০০ ইউরোপিয়ান স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয় (১৯২৩ সালের ১,৬০,০০০ ডলার মূল্যের সমান), যা সম্পূর্ণ অভিযানের খরচের চেয়েও অনেক বেশি।

---

১৪. প্রোপাগান্ডা–কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা অবস্থানের দিকে জনমত তৈরির উদ্দেশ্য বা অবস্থানের দিকে জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে এমন সব বিষয় প্রচার করা, যাতে সাধারণ জনগণের ধ্যানধারণা ওই একটি দিকে পরিচালিত হয়।

কলম্বাসের সঙ্গী হিসেবে জাহাজে ছিল উচ্চপদস্থ পাঁচজন ইহুদি নাবিক। তাদের পরিচয়– দোভাষী Luis de Torres, শল্য চিকিৎসক Marco, চিকিৎসক Bernal, Alonzo de la Calle ও Gabriel Sanchez। অভিযানের মাঝপথে Luis de Torres কিউবাতে নামেন। সেখানে তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তামাক চাষ শুরু করেন, আর রাতারাতি বনে যান তামাক শিল্পের সম্রাট।

Luis de Santagel ও Gabriel Sanchez এই অভিযানের ছুতোয় রানির কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেয়, কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের পর তারাই আবার কলম্বাসকে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে ফেলে। Bernal এই কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উপদেষ্টাদের কথায় শেষ পর্যন্ত রানিও ক্ষেপে ওঠেন। কারণ, যে কল্পিত গুপ্তধনের লোভে তাকে আমেরিকা পাঠানো হয়েছিল, বাস্তবে তার কিছুই পাওয়া যায়নি। উলটো পুরো অভিজান আর্থিক ক্ষতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তা ছাড়া রেড-ইন্ডিয়ানদের সাথে তাদের যুদ্ধ তখন চরমে। শেষমেষ এই বিখ্যাত নাবিকের স্থান হয় জেলখানায়।

এবার তারা ভাগ্যের সন্ধানে আমেরিকাকে নিয়ে পরিকল্পনা আঁটা শুরু করে। মূলত ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার কোথাও দীর্ঘদিন থাকার সুযোগ পাচ্ছিল না; কিছুদিন পরপরই তাদের বিভিন্ন দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছিল। তাই তারা এমন একটি ভূমির সন্ধান করছিল, যেখান থেকে আর বের হতে হবে না। জেরুজালেম পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তা-ই হবে তাদের নিরাপদ আবাসভূমি।

শুরুতে তারা দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করে, কিন্তু সে সময় ব্রাজিলের সাথে ডাচদের সামরিক রেষারেষী চলছিল বলে তারা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনে। পরে তারা ডাচদেরই একটি উপনিবেশের দিকে যাত্রা করে, যা আজ নিউইয়র্ক নামে পরিচিত। কিন্তু ডাচ গভর্নর Peter Stuyvesant এই অভিবাসী গোষ্ঠীকে সেখানে থাকার অনুমতি দেননি। তিনি তাদের দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আগে থেকেই নিজেদের সুরক্ষা বলয় তৈরি করে রেখেছিল। ফলে অভ্যর্থনা না জানালেও গভর্নর সাহেব তাদের একেবারে ফেলে দিতে পারলেন না। কিছু শর্তের বিনিময়ে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন। শর্তগুলো ছিল–

১. ডাচ কোম্পানিগুলোতে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে।
২. সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. পাইকারি শিল্পসহ সকল ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সামান্য সুযোগ পেলে তারা কী করতে পারে, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তাদের কোনোভাবে আটকে রাখা যায় না। একদিকে আটকে রাখলে অন্য দিকে ঠিকই উপায় বের করে নেয়।

যখন ইহুদিদের নতুন কাপড়ের বাণিজ্যে একঘরে করা হলো, তখন তারা পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে বিক্রি করা শুরু করল। মুহূর্তেই পুরাতন কাপড়ের বাণিজ্যে হইচই পড়ে গেল। এমন কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। এটা কী করে সম্ভব! ইহুদিদের পণ্য বাণিজ্যে নিষিদ্ধ করা হলে– তারা ফেলে দেওয়া নষ্ট পণ্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যাবসা করতে শুরু করে। পৃথিবীতে তারাই প্রথম জাতি, যারা ফেলে দেওয়া নষ্ট পণ্যের বাণিজ্য করেছে।

ইহুদিরাই প্রথম সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মালামাল উদ্ধারের (Salvage) ধারণা জন্ম দিয়েছে; বিষয়টি অনেকটা গুপ্তধনের মতো। তারাই শিখিয়েছে– কীভাবে পুরাতন কাপড় ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে পুরাতন পালক পরিষ্কার করতে হয় এবং কীভাবে কাজুবাদাম ও খরগোসের চামড়া ব্যবহার করতে হয়। পশমি শিল্পে তাদের আগ্রহ সব সময়ই অনন্য পর্যায়ের ছিল। বর্তমানেও এই শিল্প ইহুদিরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। পশমি পণ্য উৎপাদনকারী যেসব বড়ো বড়ো ব্রান্ড ও কোম্পানির নাম সচরাচর শোনা যায়, তাদের সিংহভাগ শেয়ার-ই এই বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর। যেকোনো প্রতিকূল প্ররিস্থিতি কীভাবে নিজেদের আওতায় আনতে হয়, তা ইহুদিদের চেয়ে ভালো আর কেউ দেখাতে পারবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও Mr. Stuyvesant একসময় তাদের নিউইয়র্ক বন্দর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে বাধ্য হন। তাদের চোখে এই অঞ্চলটি ছিল মর্তের স্বর্গ। তারা দলবেঁধে সেখানে পাড়ি জমাতে শুরু করে। এভাবে নিউইয়র্ক হয়ে উঠে তাদের সর্বাধিক জনবসতির শহর এবং আমেরিকার প্রধান আমদানি ও রপ্তানিবন্দর। কোনো ব্যবসায়ী এ বন্দর ব্যবহার করতে চাইলে তাকে বন্দর মালিকদের কর (Tax) দিতে হতো। যেহেতু এই শহর তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ এনে দিয়েছে, তাই তারা গর্ব করে বলত– হয়তো তাদের ধর্মে এ ভূমি সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল, আর এটাই হলো নিউ জেরুজালেম। যতদিন না তারা প্রকৃত জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত এখানেই থাকবে।

George Washington-এর শাসনামলে আমেরিকায় তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০০, কিন্তু এদের সবাই ছিল সচ্ছল ব্যবসায়ী। আমেরিকা যেন ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পায়, সে জন্য Haym Saloman (একজন ইহুদি ব্যবসায়ী) তার সকল সম্পদ স্বাধীনতাযুদ্ধে বিনিয়োগ করে। বিনিময়ে আমেরিকান সরকার তাকে এবং তার জাতিগোষ্ঠীকে অবাধে বাণিজ্য করার লাইসেন্স দেয়। ফলে মুনাফা উপার্জনের পথে তাদের আর কোনো বাধাই থাকল না।

তাদের নিকট সম্পদ ও ব্যক্তিসত্তা দুটি আলাদা বিষয়। কেউ বিপদে পড়লে তারা অবশ্যই সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করার ঘটনা খুবই কম।

মনে করুন, নিজের ভিটে বাড়ি বন্ধক রেখে আপনি তাদের কাছ থেকে কিছু ঋণ নিলেন এবং ব্যাবসার জন্য পণ্য কিনলেন, কিন্তু গুদামঘরে আগুন লেগে সব পণ্য পুড়ে গেল।

পরিবার নিয়ে আপনার এখন পথে বসার অবস্থা। এমতাবস্থায় আপনি ঠিকই তাদের সহানুভূতি পাবেন, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে আপনার ভিটে-বাড়ির দাবি ছেড়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তাদের চোখে It was only Business; তবে ব্যতিক্রমী কিছু উদাহরণ থাকতেই পারে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানিতে যে সুইটশপ[১৫] প্রতিষ্ঠা পায়, তা বহু আগেই নিউইয়র্কের অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আজকের দিনে সুইটশপকে তো সমাজ ব্যবস্থার অংশই বলা যায়। সবার ওপর প্রভুত্ব কায়েমের যে মনোভাব তারা যুগ যুগ ধরে লালন করে এসেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের শ্রমবাজার। তারা যা চেয়েছে তাই হয়েছে। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় বলতে এখন আর কিছুই নেই। কারণ, এসব শিল্প-কারখানায় তারা যা-ই তৈরি করে, তা-ই আমাদের ক্রয় করতে হচ্ছে। তাদের পারিশ্রমিকের ওপর মুনাফা যোগ করে যখন বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই এত সব কর্মসংস্থান করেও মানুষের আহার-বস্ত্র নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইহুদিদের মনে দেশপ্রেমের কোনো বালাই নেই। নাগরিকত্ব বিষয়টি তাদের কাছে মুনাফা উপার্জনের হাতিয়ার। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সবাই বিশ্বাস করে আমেরিকা হলো খ্রিষ্টানদের দেশ। এ দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সবকিছু তারা-ই পরিচালনা করছে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা কোনো খ্রিষ্টান এ দেশের পণ্য হাতে পেয়ে এই ভেবে খুশি হয়– এটা হয়তো তার-ই কোনো ধর্মীয় ভাই তৈরি করেছে। কিন্তু ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এ দেশের নাম করা প্রায় সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকই ইহুদি। জ্যান্টাইলদের কিছু শেয়ার থাকলেও তা পরিমাণে অনেক কম। প্রতিষ্ঠানের উঁচু পদগুলো তো ইহুদিদের জন্যই বরাদ্দ রাখা হয়! কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে ব্যাবসা পরিচালিত হবে এবং কীভাবে মুনাফা বণ্টন করা হবে, তার সবই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করে। 'American Importing Company' অথবা 'American Commercial Company' নামগুলো ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো– আমেরিকার সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে না পারে এগুলো ইহুদিদের প্রতিষ্ঠান। যেসব শিল্পে তারা ইতোমধ্যেই একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

- চলচ্চিত্রশিল্প
- থিয়েটারশিল্প
- চিনিশিল্প
- তামাকশিল্প
- মাংসশিল্পের ৫০ ভাগ

---

[১৫]. সুইটশপে–যেখানে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকদের দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি করিয়ে নেওয়া হয়।

- জুতাশিল্পের ৬০ ভাগ
- পোশাকশিল্প
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রশিল্প
- অলংকারশিল্প
- খাদ্যশস্য
- বর্তমানে তুলাশিল্প
- কলরাডো অঙ্গরাজ্যের ধাতু বিগলনশিল্প
- ম্যাগাজিন প্রকাশনী
- খবর প্রকাশনী
- তরল পানীয়শিল্প
- ঋণ ব্যবসায়

আজ তাদের যে সাফল্য, তা অগ্রাহ্য করার বিষয় নয়। তাদের পন্থা অনুসরণ করে যে কেউ-ই সম্পদশালী হতে পারবে। যেমন : বাজারে পণ্যের মূল্য বাড়ানো, পণ্যকে ব্যবসায়ের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা, সুদের বিনিময়ে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু জ্যান্টাইলদের পক্ষে এসব কাজ গুছিয়ে করা অসম্ভব।

কেবল কৃষি কাজে ইহুদিরা কখনো সফল হতে পারেনি। কারণ, ইহুদিরা কায়িক শ্রম একদম-ই করতে পারে না। তারা হলো পরজীবী; বেঁচে থাকে অন্যের জীবিকা ভোগ করে। সারা বছর পরিশ্রম করে একজন কৃষক যে ফসল ফলাবে, তা তারা কেড়ে নিয়ে বাণিজ্য করবে। এ পর্যন্ত তারা বহুবার পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কৃষি উপনিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছে এবং প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। তবে, দুগ্ধ ও পশু পালন শিল্পে তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

আসলে মাটির সাথে তাদের সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। তারা জন্মেছে শুধু বাণিজ্য করার জন্যই। এই ছোট্ট বিষয়টি-ই পরিষ্কার করে দেয়, কেন প্যালেস্টাইন নিয়ে তাদের এমন ব্যাকুলতা! প্যালেস্টাইনকে বলা হয় প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের বাণিজ্যিক দ্বার। এই ভূমিকে নিজেদের করে নেওয়ার অর্থ হলো এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা ও মেডিট্যারিয়ান সাগরের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা।

০

ইহুদি বিতর্ক : সত্য না কল্পকাহিনি

জ্যান্টাইলদের অনেকেই 'হিব্রু' ও 'সেমাইট' শব্দ দুটি দ্বারা ইহুদি জাতিকে সম্বোধন করে থাকে। ইহুদি শব্দটি মুখে এনে তারা কোনো বিপদে পড়তে চায় না।

একটা সময় ছিল যখন রাস্তা-ঘাটে তাদের নিয়ে হরদম আলোচনা হতো। যে পরিবারটির কারণে আজ তারা এতটা ক্ষমতাধর, তার প্রতিষ্ঠাতা মেয়র এমসেল রথসচাইল্ডের বাড়িতে পুলিশ নিয়মিত হানা দিত। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খবর পত্র-পত্রিকায় বড়ো অক্ষরে ছাপানো হতো। তাহলে কী এমন ঘটেছিল, যার দরুন বিংশ শতাব্দীতে মানুষ ইহুদিদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে!

১৯১৩ সালে Anti-Defamation League প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক এ সংগঠনটির সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বত্রিশটি শাখা অফিস। ইহুদিদের প্রতি সাধারণ মানুষের যত ক্ষোভ, তা মোকাবিলা করাই এই সংগঠনটির মুখ্য উদ্দেশ্য। একে ইহুদিদের প্রতিরক্ষা বাহিনী বললেও ভুল হবে না।

১৯৫৮ সালে W. Cleon Skousen (সাবেক এফ.বি.আই কর্মকর্তা) *The Naked Communist* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। সেই বইয়ে উল্লেখ করেন– কোনো সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাইলে, সেখানকার অন্তত একটি প্রজন্মকে টার্গেট করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ২০-২৫ বছরের একটি পরিকল্পনা।

Anti-Defamation League ঠিক এই কাজটিই করে। তারা ইউরোপ-আমেরিকার সেই সব দেশকে টার্গেট করে, যেখানকার প্রশাসনিক পদগুলোতে যথেষ্ঠ ইহুদি রয়েছে। শিক্ষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিভাগগুলোতে তারা পর্যায়ক্রমে আঘাত হানতে শুরু করে। ধর্মীয় শিক্ষা উঠিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে সেক্যুলারিজম। সেন্সর বোর্ড এমন সব নাটক ও চলচ্চিত্র অনুমোদন দিতে শুরু করে, যা যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুকৌশলে তারা খ্রিষ্টান নারী সমাজের পর্দাপ্রথা উঠিয়ে দেয়। অতীতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে– এমন প্রতিটি বই তারা লাইব্রেরি থেকে সরিয়ে ফেলতে শুরু করে।

যেমন : *শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিস*। পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বাধ্য করে, যেন তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ না করে। মানুষের মনে অদৃশ্য ভয় ঢুকিয়ে দিতে তারা জন্ম দেয় অসংখ্য উদ্‌ভট মতবাদ। যেমন : 'অ্যান্টি-সেমিটিজম'।

তারা চায় বিশ্ববাসী তাদের সমীহ করুক। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুক। যুগ যুগ ধরে তাদের ওপর যত নিপীড়ন চালিয়েছে, এবার তার দায় মিটাক। তবে তাদের সাথে যে কেউ-ই সন্ধি করতে চায়নি– এমনটা নয়। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র ইহুদিদের অনুরোধ করেছে, যেন তারা পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি থেকে সরে আসে এবং একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতিতে তারা কতটা ঐক্যবদ্ধ– তার একটি নমুনা দেওয়া যাক।

একতাবদ্ধ জাতি মানে এই নয়, তাদের মধ্যে হানাহানি-মারামারি কিছুই ঘটে না। ক্রোধ-ঘৃণা-মারামারি সব সমাজেই বিদ্যমান। অন্যদের মতো তাদের সমাজেও এসব ঘটনা নিয়মিত ঘটতে দেখা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে– রেষারেষি শুরু হলে আমরা তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ দিই, কিন্তু তারা দেয় না। যত যাই হোক না কেন, তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটায়। আবার জাতীয় ইস্যুতে তারা এক হয়ে যায়। আজ যারা মারামারি করছে, কাল তারা বন্ধুও হয়ে যেতে পারে; যদি জাতীয় স্বার্থে কোনো আঘাত আসে। এই গুণগুলো জ্যান্টাইলদের মাঝে কখনো দেখা যায় না।

জ্যান্টাইলদের মাঝে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাদের রয়েছে বহু জাত, ধর্ম ও বিভাজন। ফলে তারা এক হতে চাইলেও সূক্ষ্ম কোনো ইস্যুতে তাদের মাঝে সংঘাত উসকে দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। এ কারণে ঐক্য বজায়ের ক্ষেত্রে ইহুদিরা সব সময় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

তবে সস্তা সহানুভূতি দিয়ে তো আর ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়; এ জন্য প্রয়োজন যুদ্ধ। যতদিন না পৃথিবীর অন্য সব রাজত্বের পতন ঘটবে, ততদিন এই ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া সম্ভব নয়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রথম জায়োনিস্ট সম্মেলনের পূর্বে তারা একটি নীলনকশা তৈরি করে। কীভাবে অন্যান্য সাম্রাজ্যে আঘাত হানবে, কীভাবে জনমত তৈরি করবে, কারা এর পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সেই নকশায় স্থান পায়। এরপর থেকে তারা কতটা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে, তা বিংশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া যুদ্ধগুলোর দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

সবাই বলে– দুষ্ট লোকের কোনো ধর্ম নেই। তারা যে দুষ্ট, এটাই তাদের পরিচয়। তাই তাদের পরিচয় প্রকাশে ধর্মকে না জড়ানোই উচিত। কারণ, এর সাথে জড়িয়ে থাকে

সমাজের বহু মানুষের আবেগ-অনুভূতি। কিন্তু যদি কোনো সম্প্রদায় নিজ ধর্মকে পুঁজি করে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করে এবং ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন কি তাদের ধর্মীয় পরিচয় লুকিয়ে রাখার আর কোনো উপায় থাকে?

পৃথিবীতে এখনও যে বহু সৎ ও আদর্শবান ইহুদি বেঁচে আছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিছু নৈতিকতা সব ধর্মেই পাওয়া যায়। এমন যদি হতো, বিশ্ববাসীরা সকল সমস্যার সমাধান শুধু এই ধর্মটিতে খুঁজে পাচ্ছে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হতে পারত, কিন্তু সেখানেও তারা ব্যর্থ।

ইহুদিরা নিজেদের ধার্মিক বলে দাবি করলেও তাদের সম্পদশালীদের ধর্মীয় অনুশাসনের ধারের কাছেও দেখা যায় না। তাদের মধ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের ছিটেফোঁটাও নেই। যারা কঠিন দরিদ্রতায় দিন পার করছে, কেবল তাদেরই প্রকৃত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে দেখা যায়। বেচা-বিক্রি কম হবে তা জেনেও সাব্বাতের[১৬] দিনে দোকান বন্ধ রাখে এবং ইওম কিপুর[১৭] দিনটিতে রোজা রাখে। ধর্মীয় চেতনা এই গরিবদের কখনো ক্ষমতার গদি এনে দিতে পারেনি। মূলত সঠিকভাবে নিজ ধর্ম পালন, আর ধর্মকে পুঁজি করে ব্যাবসা ও সন্ত্রাসবাদ কায়েম– কখনো এক বিষয় নয়।

প্রকৃতিকভাবেই তাদের প্রতিটি প্রজন্ম এমন কিছু গুণ পেয়ে থাকে, যা জ্যান্টাইলদের মাঝে সাধারণত দেখা যায় না। তাদের সবার মাঝেই কমবেশি এই গুণগুলো উপস্থিত থাকে। এ জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য পাঠকদের জানা উচিত বলে মনে করি। যেমন :

১. ব্যাবসা-বাণিজ্যে ইহুদিদের মতো প্রতিভাধর জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। এর রহস্য কেবল সৃষ্টিকর্তাই জানেন, কেন তিনি তাদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন।

২. ইহুদিদের মতো সূক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই এসেছে। ব্যাবসা-বাণিজ্যে অসামান্য দক্ষতা অন্যদের চক্ষুশুলে পরিণত করেছে। অনেক সম্প্রদায় তো তাদের সাথে বাণিজ্য করতেই অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এমনকী বহুবার তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছিল। তবে ইহুদিদের রাজনৈতিক পরিকল্পনাগুলো এতটাই বিস্ময়কর ছিল, বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহরা পর্যন্ত তাদের অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারত না।

৩. ইহুদিরা অসংখ্য মতবাদের জন্মদাতা। একটি সমাজকে বহু অংশে বিভক্ত করার সহজ উপায় হচ্ছে– তাদের মাথায় নতুন নতুন মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া। ধরুন, একটি মাঠে ১৬টি বিড়াল আছে। এখন যদি একটি বড়ো গামলায় বিড়ালগুলোকে দুধ পান করতে দেন, তবে তারা একত্রিত হয়ে দুধ পান করবে। কিন্তু এই দুধ যদি

---

১৬. প্রতি সপ্তাহের শনিবার হলো সাব্বাত। ইহুদিদের নিকট তা হলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

১৭. ইওম কিপুর– এটি ইহুদি নিকট বছরের সবচেয়ে পবিত্র দিন। দিন-রাত মিলিয়ে ২৫ ঘণ্টা রোজা রেখে তারা এই দিনটিকে পালন করে থাকে এবং সব পাপকর্মের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

চারটি আলাদা পাত্রে ভাগ করে মাঠের চার কোনায় রেখে দেওয়া হয়, তবে খুব সম্ভাবনা আছে বিড়ালগুলো চারটি দলে বিভক্ত হয়ে দুধ পান করবে; দলগুলোতে যদিও সদস্য সংখ্যায় পার্থক্য থাকতে পারে। নতুন নতুন মতবাদ ঠিক একই রূপে কাজ করে, যার জন্য আমাদের সমাজ আজ বহু ভাগে বিভক্ত।

প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা নিজেদের লেখক, কলামিস্ট ও চিত্রকর নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিছুদিন পরপর পরিকল্পিত উপায়ে নতুন সব তত্ত্ব ও মতবাদ বাজারে নিয়ে আসে। এসব পড়ে পাঠকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়, তা সত্য-মিথ্যা যাচাই করার উপায় তো আর সবার থাকে না। ফলে পত্রিকা পড়ে মানুষ যা বোঝে, তা নিয়েই অন্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেয়। আর আলোচনায় যদি সমর্থন না পায়, তবে অনেক সময় তা মারামারি পর্যন্ত গড়ায়।

ইহুদিরা আজ পর্যন্ত এত নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়তো অনেকেই দিতে পারবে না। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যাক। প্রাচীন ইংল্যান্ডে ব্যবসায়ী ও বণিক দলগুলোর মাঝে বেশ কিছু নিয়মকানুনের প্রচলন ছিল, যা মেনে চলা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এগুলোকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অনুশাসনও বলা হতো।

যেমন : একজন প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত ঠিকাদারকে কখনো পরবর্তী কাজের জন্য দরপত্র (টেন্ডার) জমা দিতে হবে না; বরং কাজ নিজ থেকেই তার নিকট চলে আসবে। নিজ দোকানের বিক্রয় বাড়াতে এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা অন্যান্য ব্যবসায়ী ভাইদের প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দেয়। একই সঙ্গে একাধিক পণ্যের বাণিজ্যে ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা। যেমন : যদি কোনো ব্যক্তি চা-পাতা বিক্রি করে, তবে সে কখনো চা-চামচ বিক্রি করতে পারবে না। যদি কোনো বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে জনগণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং বিজ্ঞাপিত পণ্য ক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানকে কঠিন অপমানের মুখোমুখি হতে হতো; এমনকী ব্যাবসাও বন্ধ হয়ে যেত।

সে সময় সামাজিক অনুশাসনগুলোকে মানুষ স্বর্গীয় আইনের মতো শ্রদ্ধা করত। যারা এই আইন লঙ্ঘন করত, তাদের ওপর নেমে আসত কঠিন শাস্তি। আইন অমান্যকারীর জন্য কোনো ক্ষমার বিধান ছিল না। কিন্তু ইহুদিরা ইংল্যান্ডে আসার কিছুদিন পর সকল ব্যবসায়িক অনুশাসন ভেঙে দেয়। পণ্য বিক্রয়ে তারা এতটাই অধৈর্যশীল ছিল, একসঙ্গে অনেক পণ্য বিক্রি করতে শুরু করে। সামাজিক প্রথা ভেঙে এক দোকানে একাধিক পণ্য সাজিয়ে রাখতে শুরু করে, যা থেকে জন্ম নেয় বিভাগীয় বিপণিবিতান (Departmental Store)।

স্বল্প মুনাফা অধিক বিক্রয়– এ ধারণাটি প্রথম ইহুদিদের মগজ থেকেই বের হয়। উৎপাদন ব্যয় কম রাখতে তারা পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো শুরু করে। জ্যান্টাইলরা গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে পণ্য উৎপাদন করত, কিন্তু ইহুদিদের দৌরাত্ম্যে সেই সংস্কৃতি ভেঙে পড়ে। তা ছাড়া কিস্তিতে ধার পরিশোধের বিষয়টি প্রথম তাদের মাথা থেকেই বের হয়। মোটকথা ব্যবসায়ে অচলাবস্থা তারা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না। যেকোনো মূল্যেই হোক বাজারে পণ্য বিক্রয় সচল রাখতেই হবে।

ইহুদিরাই প্রথম ব্যবসায়িক কাজে বিজ্ঞাপন প্রথা সংযোজন করে। দোকানের অবস্থান, পণ্যের বিবরণ, মূল্যের পরিমাণ ইত্যাদি কাগজে লিখে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারিং-এর ধারণা তারাই বাজারে নিয়ে আসে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করত, যেন প্রয়োজনের সময় অর্থ-সাহায্য পাওয়া যায়। অসাধু ও অনৈতিক উপায়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া তাদের কাছে ছেলেখেলার মতো। অথচ জ্যান্টাইলরা কাউকে ঠকিয়ে বাণিজ্য করাকে আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দেওয়া মনে করত। কারণ, ধরা পড়লে তার জন্য অসহনীয় অপমান অপেক্ষা করত।

আশা করি এবার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, কেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের অসংখ্যবার নির্বাসিত করা হয়েছে। ১১০০-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের নির্বাসনের একটি সংক্ষিপ্ত ছক নিচে উপস্থাপন করা হলো–

রাষ্ট্র/দেশ	সাল/ নির্বাসনের বছর
ইংল্যান্ড	১২৯০
পর্তুগাল	১৪৯৭
স্পেন	১৪৯২
ফ্রান্স	১১৮২, ১৩০৬, ১৩২১, ১৩৯৪
জার্মানি	১৩৪৮, ১৫১০, ১৫৫১
সার্ডিনিয়া	১৪৯২
লিথুনিয়া	১৪৪৫, ১৪৯৫
ডসলিসিয়া	১১৫৯, ১৪৯৪
অস্ট্রিয়া	১৪২১
হাঙ্গেরি	১৩৪৯, ১৩৬০
নেপোলিস	১৫৪১
ক্রিমিয়া	১০১৬, ১৩৫০

তবে একবিংশ শতাব্দীর এ যুগে তাদের নতুন করে নির্বাসিত করবে– এমন ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের নেই। মূলত তারা এ ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আজ তারা ঠিক ততটাই ক্ষমতাধর, যতটা বাইবেলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম তথা বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর সব সম্পদ শুষে খাচ্ছে। মানুষ যদি জানত কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে কাজ করে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের নামে তারা কী করছে, তাহলে আগামীকাল সকালেই মহাসড়কে গণজোয়ার বয়ে যেত।

যে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে পৃথিবীর প্রত্যেক পয়গম্বর নিষিদ্ধ করে গেছেন, তা-ই আজ ইহুদিরা পৃথিবীর সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এখন দেখার বিষয়, এই রাজকীয় ক্ষমতা কখন নিউইয়র্ক থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত হয়; যেমনটা ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে। আর তখনই বুঝতে হবে– পৃথিবীর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।

অ্যান্টি-সেমিটিজম কী?

কোনো অপরাধী কখনোই চায় না, তার অন্ধকার জীবনের ইতিহাস সাধারণ মানুষের সামনে ফাঁস হয়ে যাক। তাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নেতিবাচক কিছু লেখা হোক এবং আইন বিভাগ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করুক।

সে চায় পৃথিবীর সব সম্পদ একাই ভোগ করবে, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে যেন কেউ নেতিবাচক কিছু লিখতে না পারে, সে জন্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের বিনিময়ের কিনে নেয়। আবার সম্পদের লোভ দেখিয়ে পুরো প্রশাসনকে নিজের পকেটে পুরে রাখে। এভাবে সে সমাজে ভিআইপির মর্যাদা পেতে শুরু করে। তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই যেন আইন বিভাগের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই জন্ম নেয় নতুন সব গডফাদার, যারা সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থেকে একসময় শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। তারা এতটাই ক্ষমতাধর হয়ে উঠে, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গেলে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে অন্তত কয়েকবার ভাবতে হয়।

আর যখন কোনো সাহসী ব্যক্তি তথ্য-প্রমাণসহ এই অপরাধীদের অন্ধকার জীবনের ইতিহাস ফাঁস করার প্রচেষ্টা করে, তখন সমাজের চতুর্দিক থেকে একের পর এক বিদ্রুপাত্তক সমালোচনা আসা শুরু করে। যেহেতু সংবাদ সংস্থাগুলো আগেই বিক্রি হয়ে গেছে, তাই মনিবের সম্মান রক্ষায় তারা উঠেপড়ে লেগে যায়। তারা সেই সাহসী ব্যক্তিকে একের পর এক মনগড়া অভিযোগে ফাঁসাতে শুরু করে। মূলত কিছু পূর্বপরিকল্পিত কৌশল প্রতিটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানই তৈরি করে রাখে, যেন উদ্ভূত প্রতিটি পরিস্থিতি তৎক্ষণাৎ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

সাহসী সেই ব্যক্তিটি যে তথ্যই উপস্থাপন করুক না কেন, বিক্রি হয়ে যাওয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো তার সকল প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে একসময় সাধারণ মানুষ গডফাদারদের বিরুদ্ধে কথা বলার ন্যূনতম সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলে। জরাজীর্ণতা ও বিভিন্ন কুসংস্কার সাধারণ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সবাই ভাবে, এদের নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কথা বলতে গেলে না জানি কোন মিথ্যা অপবাদে দোষী হতে হয়। ফলে গডফাদাররা সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। সাংবাদিকতা শিল্পের ওপর Noam Chomsky তার স্বরচিত বই *Manufacturing Consent*-এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ওপরের উদাহরণ আজকের সাম্রাজ্যবাদী ইহুদিদের সাথে মিলে যায়। মানুষ যেন তাদের বিরুদ্ধে এক হতে না পারে, সে জন্য তারা স্বাধীন তথ্য প্রবাহের ওপর আঘাত হেনেছে। ভয় ও কুসংস্কারের রাজত্ব কায়েম করতে তারা অ্যান্টি-সেমিটিজম ধারণার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি যে নতুন কিছু– তা নয়; আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা শিল্পে এটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত একটি বিষয়। ইজরাইল সম্পর্কিত অনেক ইস্যুতে আজ এই শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে; যদিও এর প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ১৮৭৯ সালে জার্মানিতে। তবে অধিকাংশের কাছে এই শব্দকে নতুন বলে মনে হতে পারে।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের নেতিবাচক ধারণা পোষণ করাকে অ্যান্টি-সেমিটিজম বলা হয়। আর যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে এই ধারণা পোষণ করে, তাকে বলা হয় অ্যান্টি-সেমাইট। আপনি সত্য না মিথ্যা বলছেন, তা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

- প্যালেস্টাইনে আরবদের অধিকার নিয়ে কথা বলুন
- বলশেভিক বিপ্লবে তাদের গণহত্যার কথা বলুন
- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলুন
- চলচ্চিত্রশিল্পে তাদের অশ্লীলতার কথা বলুন
- বিশ্বযুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলুন
- শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলুন
- ধর্ম প্রচারের নামে রাবাইদের বিভ্রান্তি ছড়ানোর কথা বলুন
- অনুসন্ধানী কোনো রিপোর্টে তাদের জড়িত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করুন

তবে মনে রাখুন, এ জাতীয় কোনো একটি কাজ করেছেন– তো আপনার ওপর অ্যান্টি-সেমাইট লেবেল চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এশিয়া বা আফ্রিকায় এ বিষয়টির খুব একটা প্রচলন না থাকলেও ইউরোপ-আমেরিকায় এটি রীতিমতো হইচই-এর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তরের সবচেয়ে উচ্চপদ থেকে

নিম্নপদ পর্যন্ত সবাই এ সম্পর্কে অবগত। গত একশো বছরের ইতিহাস ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি অ্যান্টি-সেমাইট হয়েও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন। প্রতিটি দেশে কিছু রাজনৈতিক আঁতুরঘর থাকে, যেখানে নতুন নতুন রাজনীতিবিদদের জন্ম হয়।

শুনে অবাক হবেন, বিশ্বের অধিকাংশ রাজনৈতিক আঁতুরঘরগুলোকে তারা একটি চেইন প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কেউ-ই কথা বলবে না। তাদের মূল লক্ষ্য জেরুজালেম। তারা জানে– হাজার বছরের পুরোনো এই ভূমিকে পুনরায় ইজরাইলের রাজধানী করা অতটা সহজ নয়। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা তাদের সব সময় বিচলিত করে রাখে। তারা ভৌগোলিক সীমারেখায় ফাটল সৃষ্টি করে অসংখ্য নতুন রাষ্ট্র তৈরির ইন্ধন জুগিয়েছে। জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার নামে এক দেশের সাথে অপর দেশের দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়েছে।

ধরুন, গাজায় ইজরাইলি বিমান হামলার প্রতিবাদে ইউরোপের কয়েকটি দেশ তাদের পার্লামেন্টে ইজরাইলবিরোধী আইন পাস করল। এবার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে তারা নিজেদের অতীত নির্যাতনের ইতিহাস এমনভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করবে, যেন মানুষের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কবে কোন হলোকাস্টে ১৫ বছরের এক কিশোরী শত্রু বাহিনীর নির্মম নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে, তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কলাম ছাপানো শুরু হবে। ব্যবিলন সেনাপতি নেবুচাদনেজারের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারা যত নিপীড়নের স্বীকার হয়েছে, তা নিয়ে একের পর এক প্রামাণ্যচিত্র তুলে ধরা হবে। সবশেষে সমাপ্তি টানবে এই বলে– যে জাতি হাজার বছরের নির্যাতন সহ্য করে একবিংশ শতাব্দীতে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস ফিরে পেয়েছে, তাদের প্রতি ইউরোপিয়ান দেশগুলোর এমন অ্যান্টি-সেমেটিক মনোভাব বিশ্ববাসীকে হতাশ করেছে।

এ নিয়ে ইহুদিরা টকশোর আয়োজন করবে, যেখানে তাদেরই নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্টরা প্রতিনিধিত্ব করবে। এমন সব যুক্তি উপস্থাপন করবে, যা শ্রোতা সমাজের মগজ ধোলাই করে ছাড়বে। তারা বুঝিয়ে ছাড়বে, তাদের ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনগুলো-ই ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম ও হৃদয়বিদারক। তাদের প্রতিটি জীবন খুবই মূল্যবান। কেবল আত্মরক্ষা করতেই তারা গাজার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা করেছে। যারা এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং যারা তাদের পক্ষ নিয়ে পার্লামেন্টে আইন পাশ করেছে, তারা উভয়েই অ্যান্টি-সেমাইট। এমনকী সেই ফেরাউন, যার হাতে বনি ইজরাইলের হাজারও শিশুপুত্র নিহত হয়েছে, সেও ছিল অ্যান্টি-সেমাইট।

তাদের প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে সফলও হয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক মহলগুলোতে ইহুদিদের নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয় না। সবাই তাদের পাশ কাটিয়ে চলার পথ অবলম্বন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে তারা যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, তা আজ পুরো বিশ্বে কায়েম হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে একটি বা দুটি মহল ইহুদিদের নিয়ে আলোচনা করলেও সামগ্রিকভাবে বড়ো কোনো মহল তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করে না।

পৃথিবীর বড়ো বড়ো শহরগুলোতে আজ ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চারদিকে বারুদের গন্ধ। আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ যেন পৃথিবীর দরজার টোকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কবে, কখন, কোথা থেকে এই যুদ্ধ শুরু হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ইহুদিরা চায় না চূড়ান্ত মঞ্চ তৈরির পূর্বে বিশ্ববাসীর নিকট তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হোক। কারণ, এটাই একমাত্র ইস্যু, যা পুরো জ্যান্টাইল বাহিনীকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে এক করে তুলতে পারে। অ্যান্টি-সেমিটিজমকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–

১. কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়াই ইহুদিদের অপছন্দ করা প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যাপারে খুব সীমিত জ্ঞান রয়েছে– এমন মানুষদের মনেই কেবল এ জাতীয় মনোভাব লক্ষ করা যায়। এমন অনেকে আছে, যদি জিজ্ঞাসা করা হয়– আপনি কেন তাদের ঘৃণা করেন? তবে সেই ব্যাক্তি এর গঠনমূলক কোনো উত্তর দিতে পারবে না।

২. ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অপছন্দ করা আর শত্রুতা পোষণ কখনো এক বিষয় নয়। যেমন : চায়ের সাথে দুধ মেশানোকে অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু তার মানে এই নয়, আপনি দুধ ঘৃণা করেন।

৩. ইহুদিদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংঘাতমূলক মনোভাব তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ের মানুষ প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠে, যার দরুন তাদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার নেমে আসে।

অভ্যাসগত কারণে অ্যান্টি-সেমিটিজম আজ পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে এক হতে শুরু করেছে। তবে ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে পুরো পৃথিবীকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে এই একতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে পারছে না। তারা জানে, সংখ্যায় অল্প হয়েও বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র সূত্র হলো– 'Divide and Rule' (ভাগ করো, শাসন করো)।

তারা যে কেবল আলাদা আলাদা ভূরাষ্ট্র-ই তৈরি করেছে তা নয়; বরং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদের বীজ ছড়িয়ে প্রতিটি দেশে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক দল। এরা প্রতিনিয়ত ক্ষমতার লোভে একের অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। যে চাকার ওপর ভর করে আপনি গন্তব্যে পৌছাবেন, সে চাকাতেই যদি ঘৃণা থাকে, তবে আর গন্তব্যে পৌছাতে হবে না।

জার্মানদের অবস্থান ইহুদিদের বিরুদ্ধে কেন

জার্মানিকে বলা হয় কবি ও চিন্তাবিদদের দেশ। এ দেশের মাটিতে বহু প্রতিভাধর কবি, লেখক ও দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের রয়েছে অসামান্য অবাদান। শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির মতো প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে তারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু কে বলবে, মাত্র তিন দশক পূর্বেও তারা দুই ভূখণ্ডে (পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি) বিভক্ত ছিল, যা পরিচালিত হতো দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক মাতদর্শ দ্বারা! আধুনিক জার্মানির উত্থান ঠিক কবে থেকে শুরু হয়, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের ইতিহাসে রয়েছে অনেক জটিলতা। পথ চলতে গিয়ে তারা যত ধাক্কা খেয়েছে, তাদের ইতিহাস ততই সমৃদ্ধ হয়েছে।

যে দেশটিকে নিয়ে এত আলোচনা, তারা মাত্র একশো বছর পূর্বেও কী পরিমাণ ভয়ংকর কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তা কি কখনো কল্পনা করা সম্ভব? একটি জাতি তাদের ওপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বিষাক্ত অণুজীব হয়ে প্রবেশ করে জার্মানদের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ধ্বসিয়ে দেয় তাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি কাঠামো। অভাব ও দারিদ্র্যতার দরুন নেমে আসে ভয়াভয় দুর্ভিক্ষ। ১৯২৩ সালে তাদের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তা আজও বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে অন্যতম বড়ো বিপর্যয়। ঠিক তখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার কথা পুরো পৃথিবী আজও স্মরণ করে; যদিও তা নেতিবাচক অর্থে। তিনি হলেন এডলফ হিটলার। তার হাতেই নাৎসি বাহিনী প্রতিষ্ঠা পায়। প্রচলিত আছে, তার এই বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৬০ লাখ ইহুদি হত্যা করে; যা হলোকাস্ট নামে পরিচিত।

হিটলারের হলোকাস্ট বিষয়টি যেমন সত্য, তেমনি তার ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা-ও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে *Les Annales* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জার্মান ইহুদি লেখক Emil Ludwig Cohn বলেছিলেন–

> 'হিটলার কোনো যুদ্ধে যাবে না। এমনকী সে কোনো যুদ্ধে জড়াতেও চায় না। কিন্তু আমরা তার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবো। হয়তো এ বছর, নয় পরের কোনো বছর।'

এ প্রসঙ্গে My Political Testament-এ হিটলার উল্লেখ করেন–

> 'এটা পুরোপুরি অসত্য, আমি বা জার্মানির কেউ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধে জড়াতে চেয়েছি। এর নেপথ্যে ছিল আন্তর্জাতিক ইহুদি সংগঠনগুলোর ষড়যন্ত্রময় পরিকল্পনা। তারাই আমাদের যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করেছে। ধ্বংসাত্মক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরেকটি যুদ্ধের কথা আমি কখনো কল্পনাও করিনি; হোক তা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।'

এই সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল ইহুদিদের অসংখ্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যা আজও পুরো বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছে। জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হয়ে নিজেদের একতা ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে তারা 'আল-জুদান'[১৮] নামে নতুন এক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়, কিন্তু এ রাষ্ট্রকে চোখে দেখা যেত না। কারণ, এর নিজস্ব কোনো ভূমি ছিল না। তাদের সদস্যরা পৃথিবীর যে প্রান্ত অবধি ছড়িয়েছে, রাষ্ট্রের সীমানা ছিল ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তারা 'কাহাল'[১৯] নামে নতুন এক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেয়, যা মেনে চলা সকল ইহুদিদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় তাদেরও ছিল পার্লামেন্ট। সেখানে নিয়মিত অধিবেশন বসত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিদের অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিরা (বিশেষত রাবাইগণ) এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করত। পরবর্তী বছরের অধিবেশনে কাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, তা চলতি বছরে কাজের গুণাগুণ দেখে নির্ধারণ করা হতো। সে অধিবেশনে নতুন বছরের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বাজেট পাশ করানো হতো। সেই পার্লামেন্টের নাম 'সেনহাড্রিন'।[২০] পার্লামান্টের পাশাপাশি এটা ছিল তাদের ধর্মীয় আদালত।

প্যারিস, ওয়ারসো, হ্যানয়, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহরে তাদের অধিবেশন বসত। গোপনীয়তা ছিল তাদের সকল কাজের প্রথম শর্ত, যেন সাধারণ মানুষ এসবের ব্যাপারে কিছুই আঁচ করতে না পারে। আল-জুদানের প্রথম সদর দপ্তর ছিল প্যারিসে। পরে তা লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং ওয়ারসোর মতো আরও অনেক শহরে স্থানান্তরিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠে এর শাখা সংগঠন। গুপ্তচরের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে পুরো পৃথিবীতে। ইজরাইল পুনরুদ্ধার এবং জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের সকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

ছোট্ট এই শহরটিকে নিয়ে মানুষের হানাহানি-রক্তারক্তির যেন শেষ নেই। অনেকে ছন্দ করে বলে– পৃথিবীর আদি শিকড় হয়তো এই ভূমিতেই গজিয়েছে, যার জন্য সবাই এখানে ফিরে আসে। আর এখান থেকে সকল হানাহানির সূত্রপাত। তারা বিশ্বাস করে, যখন বহু প্রতীক্ষিত মসিহ[২১] পৃথিবীতে আসবেন, তখন তাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তবে তাঁর আগমন নিশ্চিত করতে এই ভূমিকে অবশ্যই ইজরাইলের রজাধানী হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ পথে কোনো কাঁটা সহ্য করা হবে না। তাই আজ অবধি যারাই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কালের পরিক্রমায় তাদের সীমাহীন দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে; যেমনটা ঘটেছে জার্মান ও রাশিয়ানদের ভাগ্যে।

---

১৮. আল জুদান (Al Judan)– ইহুদিদের অদৃশ্য রাষ্ট্রের নাম। ধারণা করা হয়, Judah থেকে Judan শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে।

১৯. কাহাল (Qahal)– ইহুদিদের বিশেষ এক সমাজব্যবস্থা।

২০. সেনহাড্রিন (Sanhedrin)– আল জুদান রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট।

২১. মসিহ– ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মে তিনি ঈসা (আ.) বা যিশুখ্রিষ্ট, কিন্তু ইহুদিরা যার জন্য অপেক্ষা করছে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সে হলো একচোখওয়ালা দাজ্জাল।

১৯২২ সালে পূর্ব ইউরোপে যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সূচনা ঘটে, তা ছিল ইহুদিদের কাহাল ব্যবস্থার অনুরূপ। সোভিয়েত নিয়ে তাদের ছিল সুদীর্ঘ পরিকল্পনা। তবে ১৯০৫ সালে সেই পরিকল্পনা ফাঁস হলে, রাশিয়ান সম্রাট নিকোলাস ইহুদিদের নাগরিকত্ব বাতিল করেন। ফলে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

সেকালে জার্মানির ৫০ শতাংশ পত্রিকা ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পত্রিকায় কী ছাপানো হবে আর কী বাদ যাবে, তা কেবল তারাই নির্ধারণ করত। খুবই করুণ ভঙ্গিতে তারা এই উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মানবেতর জীবন চিত্র চারদিকে প্রচার শুরু করে। কিন্তু সম্রাট নিকোলাস কেন তাদের নাগরিকত্ব হরণ করলেন এবং কেনই-বা তাদের বের করে দিলেন, তা নিয়ে কোনো কিছুই প্রকাশ করা হলো না। ফলে সাধারণ মানুষ মূল ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেল। তাদের সামনে যা উপস্থান করা হলো, তাই গিলে খেল। উদ্বাস্তু এই জনগোষ্ঠীটির জন্য চারদিকে মায়া ও ভালোবাসার রোল পড়ে গেল। জনগণের আকুল আবেদনে জার্মান সম্রাট তার দেশের সীমানা খুলে দিলেন। কিন্তু এত অভ্যর্থনা জানিয়ে জার্মানরা যাদের আশ্রয় দিলো, কিছুদিন পর তারাই যে জোঁক হয়ে তাদের ওপর জেঁকে বসবে, তা কি জার্মানরা ভুলেও কল্পনা করেছিল!

আশ্রয় লাভের কিছুদিন পর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উপমন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগরে মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা সুকৌশলে প্রবেশ করতে শুরু করে। জনসংখ্যায় মাত্র দুই শতাংশ হয়েও পুরো জার্মান প্রশাসনের হর্তাকর্তা বনে যায়। ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হয়ে ইহুদিদের হাতে আসত মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ; যা দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তারা তুড়ি মেরে কিনে নিত। ইহুদিদের এক দল ব্যাংকারের কাছে পুরো দেশ আটকা পড়ে। শুরু হয় অর্থনৈতিক অধঃপতন, যার চূড়ান্ত রূপ দেখা দেয় ১৯২৩ সালে। Frederick Taylor-এর লেখা *The Downfall of Money* বই থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯২২ সালে তাদের বাজারে ১৬৩ মার্ক[২২] দিয়ে একটি পাউরুটি পাওয়া যেত। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তার মূল্য হয় ১.৫ মিলিয়ন মার্ক এবং নভেম্বর শেষ হতে না হতেই তা বেড়ে দাঁড়ায় দুই বিলিয়ন মার্কে। দ্রব্যমূল্যের এমন উর্দ্ধগতির দরুন জনজীবনে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। ঋণের দায় মেটাতে না পেরে প্রচুর প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়। বেকার ও গৃহহীন হয়ে পড়ে প্রায় ৬০ লাখেরও অধিক মানুষ।

৮ নভেম্বর ১৯২৩ হিটলার প্রায় দুই হাজার সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে মিউনিখ আক্রমণ করে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা চালায়। সেদিন মিউনিখের Bürgerbräukeller Beer Hall-এ এক প্রশাসনিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় তিন হাজারের অধিক সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিল। অর্থনৈতিক অচলাবস্থা থেকে উত্তরণ লাভের উপায় নিয়েই এ আলোচনা চলছিল।

---

২২. মার্ক (Mark)– জার্মান মুদ্রার নাম।

হিটলার তার বাহিনীসমেত আচমকা হলে প্রবেশ করে ফাঁকা গুলি ছুড়তে শুরু করে। সবাইকে বলে, এই অচলাবস্থা থকে মুক্তির পথ সে খুব ভালো করে জানে। সবাই যেন তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতীয় বিপ্লবে অংশ নেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাকে মিউনিখ মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের সাথে বন্দুকযুদ্ধে মুখোমুখি হতে হয়। এই যুদ্ধ দুই দিন ধরে চলে। এতে তার বহু সৈনিক নিহত এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়। হিটলার জীবিত পালালেও ১১ নভেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে হিটলারকে বিচারের মুখোমুখি করা হলে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই পুরো ঘটনা ইতিহাসে Beer Hall Putsch নামে পরিচিত। ১৯২২ সালে মুসোলিনি যেভাবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইটালির ক্ষমতা দখল করে, হিটলারও ভেবেছিল ঠিক একই উপায়ে জার্মানির ক্ষমতা দখল করতে পারবে। কিন্তু এই ঘটনার পর সে বুঝতে পারে, পরিপূর্ণ রাজনৈতিক দল গঠন ব্যতীত এ দেশের ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়।

এই ঘটনার পর পুরো জার্মানিতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। আদালত কক্ষে বিচারকের সামনে সে যে বক্তব্য দিয়েছিল, পত্রিকাগুলো তা গুরুত্বের সাথে প্রচার করে। তার বক্তব্য যেন সাধারণ মানুষকে আশার আলো দেখাচ্ছিল। এরপর হিটলারকে পাঁচ বছরের জায়গায় এক বছরও জেল খাটতে হয়নি। ২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে হিটলার জেল থেকে মুক্তি পায়। এর আগে জেলে বসে সে রচনা করে *Mein Kampf*-এর প্রথমাংশ, যা সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়; শুরু হয় তার রাজনৈতিক দল গঠন পর্ব।

১৯৩৩ সালে তার রাজনৈতিক দল নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই পুরোনো অর্থব্যবস্থাকে বাতিল ঘোষণা এবং নতুন মুদ্রা ছাপাতে শুরু করে। যে ব্যাংকারদের হাতে এতদিন দেশ জিম্মি ছিল, তাদের সে দেশছাড়া করে। রাতারাতি পুরো দেশের চিত্র পালটে যায়। পুরো বেকার সমাজকে সে একাই কাজে ফিরিয়ে আনে এবং সবার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে শুরু করে। মাত্র কয়েক বছরের মাথায় তারা হয়ে উঠে সুপারপাওয়ার জাতি। তাদের পরিবর্তন দেখে অস্ট্রিয়াও একই নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। কোনো বাধা ছাড়াই হিটলারকে তাদের দেশে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

ইহুদিরা জানত, তাদের শয়তানি চেহারা অবশ্যই একদিন জনসম্মুখে প্রকাশ পাবে। তখন রাশিয়ার মতো জার্মানি থেকেও তাদের বের করে দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত তারা যতগুলো দেশে গিয়েছে, সেখানেই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছে। তাই নিজেদের সুরক্ষা বলয় শক্তিশালি করতে প্রথম থেকেই জার্মানির বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে নিজেদের কবজায় নিতে থাকে। বিষয়টি হিটলারের ক্ষমতায় আসার অনেক বছর আগের কথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর Hugo Haase এবং Otto Landsberg-এর তত্ত্বাবধানে ছয় সদস্যের জার্মান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হন Mr. Haase, যার প্রধান সহকারী ছিলেন Karl Kautsky। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হন Eguen Schiffer, যার প্রধান সহকারী ছিলেন Eduard Bernstein। শিক্ষা বিভাগের প্রধান হন Mr. Arndt. ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান হন Mr. Meyer-Gerhard, শিল্পকলা বিভাগের প্রধান Mr. Kastenberg, আর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান হন Mr. Wurm। কোপেনহেগেনে অবস্থিত ডেনমার্ক পত্রিকা প্রতিষ্ঠান Frankfurter Zeitung-এর প্রধান হন Fritz Max Cohen; উল্লিখিত সবাই ছিলেন ইহুদি।

একই উপায়ে তারা প্রুশিয়ার প্রশাসনও দখল করে নেয়। সেখানকার মন্ত্রিসভা যে দুইজন ব্যক্তির নেতৃত্বে গঠিত হয়, তারা হলেন Paul Hirsch ও Kurt Samuel Rosenfeld। বিচার বিভাগের প্রধান হন Mr. Hirsch। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হন Mr. Rosenfeld। রাজস্ব বিভাগের প্রধান হন Mr. Simon এবং তার প্রধান সহকারী হন Mr. Furtran। যুদ্ধকালীন সময়ে খাদ্যবিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন Prof. Dr. Hirsch Ges Geheimrat Dr. Stadthagen। এ ছাড়াও, Cohen, Stern, Herz, Lowenberg, Frankel, Israelowicz, Laubenheim, Seligsohn, Katzenstein, Laufenberg, Heimann, Schlesinger, Merz এবং Weyl-এর মতো আরও অনেকে প্রশাসনিক বিভাগে নিযুক্ত হন।

বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুট, মিউনিখ ও এসেনে পুলিশ বিভাগের প্রধান হন যথাক্রমে Mr. Ernst, Mr. SinZheimer, Mr. Steiner এবং Mr. Levy। বাভারিয়ার প্রেসিডেন্ট Kurt Eisner-এর অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হন Mr. Jaffe। শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান হন Mr. Brentano। একই উপায়ে স্যাক্সনি ও ওয়ারটেমবার্গ রাজ্যের প্রধান হন Lipsinsky-Schwarz Ges Brentano। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আরও অনেকের পরিচয় পাওয়া যাবে, যাদের উপস্থিতি সেখানকার প্রশাসনিক পদগুলোতে ছিল। যেমন : Max Warburg, Dr. Von Strauss, Merton, Oskar Oppenheimer, Dr. Jaffe, Deutsch, Brentano, Brenstein, Struck, Rathenau, Wassermann এবং Mendelsohn-Bartholdi।

The Berliner Tageblatt ও *Muncher Neuester Nachrichten* ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে জার্মান সরকারের প্রধান দুটি পত্রিকা। মজার বিষয় হলো এই দুটি প্রতিষ্ঠানও তারা পরিচালনা করত। Frankfurter Zeitung প্রতিষ্ঠানটিকে তারা জার্মানবাসীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক, মানবিক চরিত্র গঠন ও পরিবর্তনের কাজে বিশেষভাবে ব্যবহার করত।

সেকালে জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন Bethmann-Hollweg। এবার তার উপদেষ্টাদের পরিচয় তুলে ধরা যাক। যেমন : Ballin ছিলেন প্রসিদ্ধ জাহাজ ব্যবসায়ী, Theodor Wolff ছিলেন *Berliner Tageblatt* এবং *Pan-Jewish* ছিলেন পত্রিকা দুটির প্রভাশালী সদস্য; Von Gwinner ছিলেন জার্মান ব্যাংকের মহাপরিচালক এবং Rathenau ছিলেন

শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা। এরা সবাই ছিলেন সরকারের সকল তথ্য ও পরামর্শের একমাত্র উৎস। তারা সাধারণ জনগণের মতো সেখানকার সরকারকেও প্রতারিত করত।

মূলত তিনটি কৌশলে তারা সাধারণ মানুষকে বোঁকা বানিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করত–

১. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে বলশেভিক চেতনা উসকে দেওয়া।
২. প্রকাশনী শিল্পে নিজেদের কর্তৃত্ব জোড়দার করা।
৩. খাদ্য উৎপাদন ও কল-কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহে নিজেদের একচেটিয়া অধিপত্য নিশ্চিত করা।

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে *The London Globe* পত্রিকার সাংবাদিক George Pitter-Wilson একটি কলামে উল্লেখ করেন–

> 'বলশেভিজম মূলত খ্রিষ্টান ধর্মচ্যুত একটি সমাজব্যবস্থা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ইহুদিদের রাজত্ব কায়েম।'

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পর তারা প্রচার করতে শুরু করে– জার্মানদের পরাজয় ব্যতীত প্রলেতারিয়েতদের[২৩] প্রকৃত বিজয় অর্জন অসম্ভব।

Mr. Strobel ঘোষণা করেন–

> 'জার্মানির সামগ্রিক বিজয় কখনোই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য সুফল বয়ে আনবে না। এটা প্রলেতারিয়েটদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেবে।'

তারা জাতি হিসেবে যে কতটা বিশ্বাসঘাতক, তা এই কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বোঝা সম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকদের নৈতিকতা ও আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করতে ইহুদিরা খাদ্য সরবরাহ লাইনে আঘাত হানে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক সৈন্যের ন্যায় তারাও জানত, যুদ্ধ মানে কঠোর আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘকালীন কষ্ট ভোগ।

সে বছর ফসলের উৎপাদন বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু বাজারে পণ্যদ্রব্যের উর্ধ্বমূল্য সবাইকে অবাক করে দেয়। মানুষ ভাবতে শুরু করে– এত ফসল তাহলে গেল কোথায়? যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ফসলের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে ডিলার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। বিনিয়োগের অভাব ছিল না বলে ইহুদি ব্যবসায়ীরা ছদ্মবেশে সেসব ডিলারশিপ কিনে নেয়। তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে তাদের আরেকটি দল কাজ করত,

---

[২৩]. প্রলেতারিয়েট– কার্ল মার্ক্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী মাত্র মজুরির বিনিময়ে যারা শিল্প-কারখানাগুলোতে তাদের পরিশ্রম বিক্রি করে এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী হওয়ায় সমাজের সবচেয়ে নিচু স্তরে অবস্থান করে, তাদের প্রলেতারিয়েট বলে।

যারা বিভিন্ন ডিলারের কাছ থেকে বাজারমূল্যে সব পণ্য কিনে নিত। ফলে অল্প দিনে পুরো বাজার ফাঁকা হয়ে যায়। পরে তারাই কৃত্রিম সংকটের অজুহাতে বাজারে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়।

এত পরিকল্পনার পরও কোনো অদৃশ্য শক্তির কাছে হার মানতে হবে, তা জার্মান সরকার কখনো ভাবতেও পারেনি। যুদ্ধের পর দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। আদালতে মামলা করা হয়। অবাক কাণ্ড! দেখা গেল যিনি মামলা করেছেন, আর যিনি বিচার করছেন তারা উভয়েই ইহুদি। ফলে মামলা করেও প্রকৃত দোষীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অথচ এর বিপরীতে সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হলে চারদিকে হইচই পড়ে যেত, তার ন্যায্য শাস্তি নিশ্চিত করতে সাংবাদিকরা উঠেপড়ে লাগত।

সামাজিক স্বীকৃতি ও পদমর্যাদার প্রতি তাদের সব সময়ই মোহ কাজ করত। সম্পদশালীরা প্রতিপত্তির বিনিময়ে সমাজের উঁচু পদগুলো (যা থেকে শাসন করা সম্ভব) নিজেদের করে নিত; অনেকটা অর্থ দিয়ে সম্মান কিনে নেওয়ার মতো। কিন্তু তাদের গরিব ভাইয়েরা কী করত? তাদের তো আর সেই পরিমাণ সম্পদ নেই, যা দিয়ে ক্ষমতা কিনতে পারে! এ ক্ষেত্রে তারা একটি সূক্ষ্ম খেলা খেলত। গরিব গোষ্ঠীটি ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেত। ফলে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব হতো না– কে জ্যান্টাইল আর কে ইহুদি। বিভিন্ন অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখিয়ে তারা মানুষের হৃদয়ে আন্দোলনের বীজ বুনে দিত। যেমন : শ্রমিক বিপ্লব। পেছন থেকে তাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিত। রাতারাতি জন্ম নিত কিছু শ্রমিকনেতা। আড়ালে কী ঘটছে, সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝত না। তারা শুধু এতটুকুই দেখত– তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মহান এক নেতা, যিনি তাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আর নেতাদের পক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো তো রয়েছেই।

এভাবে দল ভারী হওয়ার সাথে সাথে তারা মহা বিপ্লবের ডাক দেয়। তখন সরকার, প্রশাসন ও আইন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এক হয়েও এই আন্দোলন হটাতে পারে না। কারণ, ততক্ষণে জনগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। জন্ম নেওয়া নতুন শ্রমিকনেতা চলে আসে রাষ্ট্রের রাজকীয় ক্ষমতায়। সুবিধা ভোগের জন্য তিনি সেই সকল ব্যক্তিদের পথ করে দেন, যারা বিপ্লবের সময় তার পেছনে অর্থের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। জার্মান, ফরাসি ও বলশেভিক বিপ্লব এমন-ই কিছু উদাহরণের সমষ্টি।

প্রলেটারিয়েটদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তারা যখন রাশিয়াকে ভেঙে দিলো, তখন কে ক্ষমতায় আসে? ক্রান্সস্কি। তবে তার পরিকল্পনা যথেষ্ট ছিল না বলে ক্ষমতায় আসে ট্রটস্কি। এরপর আসে লেনিন। তারা সবাই ছিল বলশেভিক বিপ্লবের এক একজন মহানায়ক এবং একই গোষ্ঠীর সদস্য।

বেলফোর ডিক্লারেশনের মধ্য দিয়ে বহু আগেই ইজরাইল পুনঃপ্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়েছে। শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে তারা আজ পৃথিবীর যেকোনো পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের সমকক্ষ, কিন্তু একশো বছর আগেও তারা ছিল যাযাবর জাতি। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে। তাদের ছিল না নিজস্ব কোনো সৈন্য বাহিনী। তারপরও সামরিক শক্তির কোনো অভাব ছিল না। ব্রিটিশ নৌবাহিনী তো পরোক্ষভাবে তাদেরই সামরিক শক্তি ছিল।

সমুদ্রের যেখানে ইহুদিদের সুরক্ষার প্রয়োজন হতো, সেখানেই তারা এই বাহিনীকে ব্যবহার করত। ইংল্যান্ডকে ব্যবহার করে তারা বিশ্বজুড়ে যে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে, তার পেছনেও ছিল এ বাহিনীর বিশাল ভূমিকা।

১৯১৯ সালে আটোমানদের পরাজিত করে ব্রিটিশ জেনারেল অ্যাল্যানবি যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করে, এই সৈন্যবাহিনীর বিশাল একটি অংশ তখনও তার সাথে উপস্থিত ছিল। শুধু ব্রিটেন কেন, প্রয়োজন হলে তারা আরও অনেক দেশের সৈন্য বাহিনীকে মাঠে নামাতে সক্ষম। ইউরোপ-আমেরিকার এমন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান নেই, যিনি তাদের অদৃশ্য ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত নন।

কয়েকশত বছর পূর্বে স্পেন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও ইতালি পৃথিবীজুড়ে যে অসংখ্য ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল, তার সূর্যাস্ত বহু আগেই হয়েছে। আজ তারা নিজেরাই অন্তঃকোন্দলে ব্যস্ত। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে খুব গোপনে এক নতুন ঔপনিবেশিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেতে যাচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম উপায়ে এর কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ইজরাইলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই অনুমানকে আরও প্রখর করে তুলছে। কারণ, বহু প্রতিক্ষিত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার[২৪] হয়তো সেখান থেকেই প্রতিষ্ঠা পাবে।

'ইহুদিরা যে পৃথিবীর সবচেয়ে বিতর্কিত জাতি, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে আজ পর্যন্ত আমরা নতুন অনেক স্থানে গিয়ে হাজির হয়েছি, যেখানে আমাদের নিয়ে পূর্বে কোনো বিতর্ক ছিল না। কিন্তু আমরা এতটাই অভাগা, সাধারণ মানুষের আক্রোশ কখনোই আমাদের পিছু ছাড়েনি। ...ইংল্যান্ডে আজ যে অ্যান্টি-সেমিটিজম ছড়িয়ে পড়ছে, ইতোমধ্যে তা আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের উপস্থিতিই যেন সব বিতর্কের মূল কারণ।' Theodore Herzl, '*A Jewish State*' p. 4.

---

[২৪]. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (New World Order)– নতুন এক সমাজব্যবস্থা। এর বৈশিষ্ট্য হলো সকল ভৌগোলিক সীমারেখা উঠে গিয়ে পুরো পৃথিবী হবে একটি মাত্র দেশ এবং তাতে একটি মাত্র সরকার ও একক মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে। ল্যাটিন ভাষায় একে বলা হয় Novues Ordo Seclorun।

আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব

ধারণা করা হয়, ধর্মীয় কুসংস্কার, অর্থনৈতিক প্রতিহিংসা ও সামাজিক বিদ্বেষ– এই তিনটি কারণে ইহুদিরা ইতিহাসজুড়ে বহু নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে। তবে তারা স্বীকার করুক আর না-ই করুক, নিছক ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে জ্যান্টাইলরা কখনো তাদের বিরুদ্ধে মারমুখি হয়ে ওঠেনি। তবে অর্থনৈতিক প্রতিহিংসাকে একটি কারণ বলা যেতে পারে। কারণ, অর্থ-সম্পদ না চাইলেও অনেক সময় শত্রুর জন্ম দিয়ে ফেলে। তা ছাড়া এত ছোট্ট একটি জাতি এত ধন-সম্পদের মালিক কীভাবে হয়ে উঠল, তাও অনেকের চিন্তার কারণ হয়েছিল। তারা যদিও এ ব্যাপারে নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলে– সৃষ্টিকর্তা আপন হাতে তাদের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। মূলত এসব তাদের বানানো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইহুদিরা অর্থ-সম্পদকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে সমাজকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছে তা হলো– উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত।

এই বিভাজন তারা এত সূক্ষ্ম উপায়ে করেছে, তাতে সবাই ধরেই নিয়েছে– যাদের প্রচুর সম্পদ আছে, কেবল তারাই সমাজের উচ্চশ্রেণির। তারা যা-ই বলে, তা-ই সমাজের আইনকানুনে পরিণত হয়। বিষয়টা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে এখন আর কোনো তর্ক-বিতর্ক হয় না। এই অর্থ-সম্পদের উৎস কী, তা নিয়েও যেন কারও কোনো চিন্তা নেই।

বাইবেল অনুযায়ী– মোজেস যখন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কথা বলতে সিনাই পাহাড়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অবর্তমানে ইজরাইলবাসী স্বর্ণের বাছুর তৈরি করে পূজা শুরু করে, যা Golden Calf নামে পরিচিত। তারা বোঝাতে চেয়েছে– অর্থই ঈশ্বর। সকল উপাসনা কেবল তার নিমিত্তে। যারা এই অর্থ-সম্পদকে গুরুত্ব দেবে, কেবল তারাই হবে সমাজের উচ্চশ্রেণির জনগোষ্ঠী।

এ কারণে দেখা যায়– ইহুদিরা যখন কোনো নতুন দেশে প্রবেশ করত, তখন কেউ পাত্তাই দিত না। কারণ, তাদের অবস্থা ছিল ভিখারির মতো। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই যখন তারা অর্থ-সম্পদে এতটা ফুলে উঠত, রাজা-বাদশাহরাও তাদের নিকট ধরনা দিত।

ইহুদিরা নিজেদের সুবিধার্থে নতুন সব আইনকানুন তৈরি করে সর্বসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিত। তারা চাইলে অর্থবাজারে ধ্বস নামে। আবার তাদের মর্জিতেই বাজার চাঙা হয়ে ওঠে এবং লাখো মানুষের জীবিকা চলে। ওয়ালস্ট্রিটসহ পৃথিবীর সব বড়ো বড়ো শেয়ার বাজারের চাবি তো এখন তাদের হাতেই জিম্মি!

সামাজিক বিদ্বেষ নিয়ে বলতে গেলে– সব যুগেই জ্যান্টাইলদের সঙ্গে ইহুদিদের আপত্তিকর কিছু ঘটনা ঘটতে দেখা যেত, তবে তা আহামরি কিছু ছিল না। এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে একজন খ্রিষ্টান ও নাস্তিক পাশাপাশি বড়ো হয়েছে; সম্পর্কে তারা প্রতিবেশী। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রায়ই তাদের মাঝে তর্কাতর্কি হতো, কিন্তু তা কখনো রক্তারক্তিতে রূপ নেয়নি।

এ তিনটি বিষয় ছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে, যা তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আগের অধ্যায়গুলোতে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। যেমন : পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি, দেশপ্রেমহীনতা, সামাজিক অনুশাসন ভঙ্গ করা, তথ্য পাচার করা ইত্যাদি। এবার ষড়যন্ত্রময় বিশ্ব রাজনীতিতে ইহুদিরা কীভাবে দাবার গুটি চালছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উনবিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন ইহুদি হলেন Theodor Herzl। তাকে বর্তমান ইজরাইলের অন্যতম রূপকারও বলা হয়। তার একটি বিখ্যাত উক্তি– 'We are a people– One people।' তিনি পরিষ্কার করে বলেন, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতির কোনো বিকল্প নেই। ১৮৯৭ সালের প্রথম জায়োনিস্ট সম্মেলনে তিনি বলেন– 'যখন আমরা কোনো বিপদে পতিত হই, তখন অদম্য এক শক্তিকে সঙ্গে করে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েটরূপে জেগে উঠি। তখন আর আমাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। আমরা হয়ে উঠি অতুলনীয়-অদম্য শক্তির আধার।'

The Jewish State গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন–

> 'আমিও বিশ্বাস করি, অ্যান্টি-সেমিটিজম সত্যি একটি বড়ো আন্দোলন। এই কুরুচিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রতিহিংসা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। এটি এমন এক জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে, যার সমাধান করতে সভ্য দেশের সব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করা প্রয়োজন।'

১৯০২ সালে British Royal Commission-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মেজর Evans Gordon-এর প্রশ্নের জবাবে Dr. Herzl বলেন–

'আমি আপনাদের এমন এক রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, যার বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে দ্রুতই তা বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিতে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক কারণে এই রাষ্ট্রের বংশধরদের অসংখ্য শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। আপনারা চাইলে রাষ্ট্রটির পূর্বে বিশেষণ হিসেবে 'ইহুদি' যোগ করতে পারেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এই রাষ্ট্রটির পূর্ণরূপ কী হতে পারে!'

Lord Eustace Percy একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক ও রাজনীতিবিদ। সে সময় তিনি এই বিশেষ জাতিগোষ্ঠীটিকে নিয়ে একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করেন, যা পরবর্তী সময় Canadian Jewish Chronicle দ্বারা সমর্থিত হয়। লেখাটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ তুলে ধরা হলো–

'উদারপন্থি ও জাতীয়তাবাদ (Libaralism and Nationalism) এ দুটি নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউরোপিয়ান অধিবাসীগণ নিজ নিজ দেশে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের অধিকারও এ যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা প্রশাসনিক পদগুলোতে সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। বিষয়টিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ইহুদিরা প্রচণ্ড প্রতাপের সাথে বেরিয়ে আসে। কীভাবে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদগুলো নিজেদের করে নেওয়া যায়, তা নিয়ে উঠেপড়ে লাগে। এভাবে ক্ষমতা যখন হাতে চলে আসে, তখন তারাই আবার নীতি দুটির বিরোধিতা করে। একসময় নীতি দুটির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দলের জন্ম হয়, যা একত্রিত হতে যাওয়া ইউরোপকে পুনরায় দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।

যেকোনো স্বাধীন রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ চালাতে ইহুদিদের সচারাচর দুটি কাজ করতে দেখা যেত। উক্ত রাষ্ট্রের পুরো সাংবিধানিক কাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া এবং সেখানে নিজেদের মনোনীত সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

আজ ইউরোপের আকাশ জায়োনিজম ও বলশেভিজমের মেঘে আচ্ছন্ন। জায়োনিজম হলো ইহুদিদের রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, যা বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দুটি ব্যবহার করে ইহুদিরা যেভাবে কনস্টান্টিনোপল দখল করে এবং তুর্কি বিপ্লবের জন্ম দেয়, ঠিক সেভাবে ইউরোপ দখল করতে আজ তারা বলশেভিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে।'

নিজেদের দাপট কায়েম করতে ইহুদিরা বারবার জ্যান্টাইল রাষ্ট্রগুলোকে আক্রমণ করেছে এবং শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যেমন : তারা রাজতন্ত্র সরিয়ে প্রজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্রকে সরিয়ে সমাজতন্ত্র এবং অনেক জায়গায় প্রজাতন্ত্র সরিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরো পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে একদিন নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করবে

এবং সবাইকে গোলাম বানিয়ে ছাড়বে– এটাই ইহুদিদের বিশ্বাস। এর প্রথম ধাপ হিসেবে তারা গণতন্ত্রকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

অনৈতিক ও সন্ত্রাসী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দরুন একসময় তাদের একঘরে করে রাখা হতো। তাই তারা নিজেদের জন্য ঘেটোভিত্তিক[২৫] সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। ইহুদিদের সংস্পর্শে এসে সমাজ যেন কলুষিত না হয়, সে জন্য তাদের কার্যক্রম নির্দিষ্ট করা ছিল। অর্থাৎ তারা চাইলেই প্রশাসনিক বা ব্যবসায়িক কাজে অংশ নিতে পারত না। ইহুদিরা এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যা সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী শান্তি আলোচনা এমনই একটি উদাহরণ।

তারা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ম দিয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধ নতুন সব শান্তি-আলোচনার দ্বার খুলে দেয়, যার উঁচু পদগুলো সব সময়ই ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ থাকে। আর সেখান থেকেই হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে তৈরি করে নতুন আইন-কানুন। এ সম্পর্কে জানতে Sixth Zionist Conference-১৯০৩ নিয়ে যে কেউই গবেষণা করতে পারেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অটোমানদের হটিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের হাতে প্যালেস্টাইনের চাবি তুলে দেয়। তারপরও বহু প্রতিক্ষিত ইজরাইল প্রতিষ্ঠা করতে তাদের আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। এখনও ইহুদিদের অনেক সদস্যই প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেনি। নিরাপত্তা ও আবাসন সংকটের দরুন তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

২৫ জুন ১৯২০, *American Hebrew* ম্যাগাজিনের মুখপাত্র Herman Bernstein তার একটি আর্টিকেলে প্রকাশ করেন–

> 'কিছুদিন আগে আমেরিকান বিচার বিভাগের এক প্রতিনিধি 'The Jewish Peril' শিরোনামে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমার কাছে আসেন। পাণ্ডুলিপিটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হওয়া রাশিয়ান কোনো একটি বইয়ের অনূদিত অংশ-বিশেষ, যা অনেক আগেই বাজার থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিশ্বের পুরো জ্যান্টাইল জনগোষ্ঠীকে কীভাবে ইহুদিরা নিজেদের কবজায় নিয়ে আসবে, সে সম্পর্কে বহু নির্দেশনা পাণ্ডুলিপিটিতে দেওয়া হয়েছে।'

---

[২৫]. আমাদের শহরগুলোতে প্রায়ই বড়ো বড়ো বস্তি দেখা যায়, যেখান প্রচুর মানুষ একত্রে গাদাগাদি করে বসবাস করে। ফরাসি বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ইহুদিরা এ রকম একটি সমাজব্যবস্থায় বসবাস করত। তবে ঘেটো শব্দের আক্ষরিক অর্থ বস্তি নয়। ইহুদিরা নিজেদের প্রয়োজনে এরূপ সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব করেছিল, যেন নিজেদের মাঝে সম্পর্কের দৃঢ়তা অটুট রাখতে পারে। ধনি-গরিব সকল শ্রেণির ইহুদিরা একত্রে এখানে বসবাস করত।

১৮৯৬ সালে Dr. Herzl এই সব নির্দেশনার একটি প্রথমিক খসড়া তৈরি করেন, যা ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের শহর বাসেলে অনুষ্ঠিত হওয়া জায়োনিস্ট সম্মেলনে প্রথমবারের মতো উপস্থাপন করা হয়। পরে ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত অসংখ্য ছোটো ছোটো খণ্ডে এই সম্পূর্ণ খসড়াটি বাজারে আসতে থাকে, যা একসময় পূর্ণ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার বাজারে এ নিয়ে প্রচণ্ড হইচই শুরু হওয়ায় গ্রন্থটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তত দিনে এর অসংখ্য কপি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে যায়। এর দরুন এটিকে একেবারে গায়েব করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সম্পূর্ণ খসড়াটির একটা কপি এখনও ব্রিটিশ জাদুঘরে জমা আছে, যার ওপর লেখা আছে– '১০ আগস্ট, ১৯০৬'।

যে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এত হইচই, তার নাম হলো– *Protocols of the Learned Elder Zion*। এর ওপর ভিত্তি করে ১৯২০ সালে লন্ডনের *Kzre and Spottiswoode* ম্যাগাজিন একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করে, যা নিয়ে লন্ডনে থাকা ইহুদিরাও হইচই শুরু করে। নিজেদের কলঙ্ক ঢাকতে বিকল্প হিসেবে তারা *London Times* ম্যাগাজিনকে ব্যবহার করে। তারা Kzre and Spottiswoode-এর প্রকাশিত আর্টিক্যালটিকে 'দুঃখজনক' বলে আখ্যায়িত এবং এ জাতীয় কাজকে পাগলামির অংশ বলেও অভিহিত করে।

কিন্তু এটাই ছিল সেই নীলনকশা, যার ভিত্তিতে ইহুদিরা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ম দিয়েছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করেছে। অপসংস্কৃতিতে চারদিক ভরিয়ে তুলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় নাস্তিকতার জন্ম দিয়েছে। অর্থব্যবস্থাকে কুক্ষিগত এবং বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী শান্তি আলোচনাগুলোতে কেবল নিজেদের স্বার্থই হাসিল করেছে। ইহুদিদের সংগঠনগুলো আজ পর্যন্ত এই দলিলটির সঙ্গে কোনো রকম সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেনি; বরং এটিকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে কিছু চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগান্ডার অংশ বলে দাবি করে আসছে।

ইহুদিদের পক্ষ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি আসুক বা না আসুক, এই সম্পূর্ণ দলিলটি আজ পর্যন্ত তাদের অন্তিম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সঙ্গে যেভাবে মিলে যাচ্ছে, তা নিছক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। পরবর্তী বেশ কয়েকটি অধ্যায়জুড়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১৯ জুন, ১৯২০ 'Trotsky Leads Jew-Radicals to World Rule. Bolshevism Only a Tool for His Scheme' শিরোনামে *Chicago Tribune* একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করে। বলশেভিক বিপ্লব যে ইহুদি গুপ্তচরদের সুদীর্ঘ পরিকল্পনার একটি অংশ,

তা এই লেখায় সবিস্তারে তুলে ধরা হয়। তা ছাড়া খুব দ্রুতই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তজুড়ে আরও অনেক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন দানা বাঁধতে যাচ্ছে– এমন কড়া হুঁশিয়ারিও সেই লেখনীতে উপস্থাপন করা হয়। ইতঃপূর্বে বহু পত্রিকা প্রতিষ্ঠান ঠিক এ জাতীয় সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। এমনও হয়েছে, সংবাদ প্রকাশের কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা সেই কলামটি সরিয়ে নিয়েছে এবং ভুল তথ্য প্রকাশের বিবৃতি দিয়ে মাফও চেয়েছে।

১৯ তারিখে প্রকাশিত আর্টিক্যালটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী তুলে ধরা হলো–

> 'গত দুই বছরে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে– বলশেভিকের মতো আরও অনেক বিপ্লব খুব দ্রুতই পৃথিবীর বুকে আঘাত হানতে যাচ্ছে। যারা নিরন্তর এর পেছনে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিচয় দেরিতে হলেও আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংগঠনগুলো ইতোমধ্যেই তাদের এই ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেছে।'
>
> কমিউনিজম তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের অন্যতম বড়ো হাতিয়ার। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রাচ্যের দেশগুলোতে তারা যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, তার উদ্দেশ্য সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা নয়। ধীরে ধীরে তাদের এই আক্রমণ প্রতিচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও ধেয়ে আসবে। তাদের সমকক্ষ এমন একটি রাষ্ট্রকেও তারা বাঁচতে দেবে না। প্রয়োজনে ইংল্যান্ডের ওপর ইসলামি বিপ্লব, ভারতের ওপর জাপানি বিপ্লব এবং আমেরিকা ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিতেও তারা পিছপা হবে না। তাদের উসকে দেওয়া সকল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– পৃথিবীর বিদ্যমান সমস্ত শাসনব্যবস্থা উপড়ে ফেলা এবং তার স্থানে নিজেদের শাসনব্যবস্থা কায়েম; শান্তি প্রতিষ্ঠা করা নয়।'

২১ জুন, ১৯২০ World Mischief শিরোনামে *Chicago Tribune* আরও একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করে, যেখানে তাদের কুকর্মের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রথম দিকে তারা এই তথ্যগুলোকে মিথ্যা, গুজব ও বানোয়াট গল্প বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ যখন প্রমাণ উপস্থাপন করতে শুরু করে, তখন তারাই আবার কণ্ঠ পরিবর্তন করে বলে–

> 'ছোট্ট যে জাতিটি বহুকাল পৃথিবীর অসংখ্য নির্যাতন সহ্য করেছে, তারা যদি শত্রুদের ক্ষমতাচ্যুত করে বিশ্ব শাসন করার স্বপ্ন দেখে, তাতে এমন আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?'

Jewish Encyclopedia হতে জানা যায়, খ্রিষ্টযুগ শুরুর আগ পর্যন্ত তাঁদের কোনো রাজা ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলন সেনাপতি নেবুচাদ নেজার জেরুজালেম আক্রমণ করে সেখানকার অসংখ্য অধিবাসীকে হত্যা করে এবং ৬০-৭০ হাজার ইজরাইলিকে বন্দি করে নিয়ে যায়; অবশ্য পরে তাদের অনেককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি টাইটাসের নেতৃত্বে রোমানরা আবারও এই পবিত্র ভূমি আক্রমণ করে এবং সবাইকে নির্বাসিত করে। ঠিক তখন থেকে বেলফোর ঘোষণার আগ পর্যন্ত তারা আর কখনো সামষ্টিকভাবে জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারেনি। তারা ছিল যাযাবর জাতি। এই কথাগুলো পুনরায় বলার বিশেষ কিছু তাৎপর্য আছে।

ব্যাবিলনদের আক্রমণে প্রথমবারের মতো নির্বাসিত হওয়ার পর তারা এক অদৃশ্য শাসনব্যবস্থার জন্ম দেয়, যাতে নির্বাসিত অবস্থাতেও একতাবদ্ধ থাকা যায়। তবে এই ব্যবস্থাটি তখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। কারণ, কিছুদিন পর তারা আবারও জেরুজালেমে ফিরে আসে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন রোমানদের দ্বারা নির্বাসিত হয়, তখন ইহুদিরা শাসনব্যবস্থায় রাজার সংযোজন করে। ইহুদিরা পৃথিবীর যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ুক না কেন, রাজার নির্দেশ মেনে চলা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি ছিলেন তাদের অভিভাবক। এ পর্যন্ত তারা যতজন রাজা নির্বাচিত করেছে, তাদের সবাইকে বলা হয় 'Exilarch'। এই অদৃশ্য রাষ্ট্রের নামও ছিল ইজরাইল।

ইহুদিরা যতদিন না নিজ ভূমিতে ফিরে যেতে পারছে, ততদিন এই শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে তারা ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের পৃথক আদালত ও আইনব্যবস্থাও ছিল। পৃথিবীর যে রাষ্ট্রেই বসবাস করুক না কেন– হোক তা খ্রিষ্টান বা মুসলিমদের দেশ, তারা মনে-প্রাণে এই রাষ্ট্রের সব নিয়মকানুন মেনে চলত। কিন্তু এই রাষ্ট্রটি আজ কোথায়? এটি কি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে? না, হারিয়ে যায়নি; বরং তা নতুন খোলস ধারণ করেছে।

প্রাচীন সেই রাষ্ট্রটির একটি পার্লামেন্টও ছিল, যার নাম 'সেনহাড্রিন'। এ সম্পর্কে পূর্বের একটি অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

৭১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই পার্লামেন্ট ব্যবস্থার প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তবে কোত্থেকে এবং কী উপায়ে এই সদস্যগণ নির্বাচিত হতো, তা কখনো প্রকাশ করা হতো না। তবে তা গণতান্ত্রিক উপায়ে হতো না। একজন রাজা যোগ্যতার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের নির্বাচন করতেন। এখানে রাজা বলতে তাদের প্রধান ধর্মীয় গুরুকে বোঝানো হয়েছে, যার পরিচয় খুব গোপন রাখা হতো।

জনসাধারণের জান-মাল ও সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া এই সংসদীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সাম্রাজ্যবাদ আরও শক্তিশালী করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। *Jewish Encyclopedia*

হতে জানা যায়– এই সদস্যরা নির্বাচিত হতো সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ধর্মীয় জ্ঞানের মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে। তাদের সাম্রাজ্যবাদ শুধু প্যালেস্টাইনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এর বিস্তৃত ঘটেছিল পুরো বিশ্বজুড়ে। কারণ, যদি ইজরাইল প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে প্রতিটি দেশকে ধ্বংস করেই তা করতে হবে।

১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে অবস্থানরত ইহুদিদের বিভিন্ন কাজের দরুন ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি একটি সংসদীয় সভার আহ্বান এবং সেখানে এই জাতিগোষ্ঠীর কিছু সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। সেইসঙ্গে এই ঘোষণা দেন– যতদিন না তারা এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে, ততদিন তাদের একঘরে করে রাখা হবে।

৯ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৮০৭ জ্ঞাতি ভাইদের সমর্থনে সেনহাড্রিনের সদস্যরা প্যারিসে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। তারা ঠিক প্রাচীন কায়দায় নিজেদের কার্যক্রম শুরু করে। সেখান থেকে ঘোষণা করে– ইজরাইলের মঙ্গল ও উন্নয়নের স্বার্থে যেকোনো কিছু করার অধিকার তাদের আছে। তাই নেপোলিয়ন কী জানতে চাইল আর না চাইল, তা নিয়ে তাদের কিছুই আসে যায় না।

ইহুদিরা নিজেদের ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে সংসদীয় কাঠামোকে আজ অবধি একই রকম রেখেছে। তবে এটা ঠিক, সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবস্থায়ও সামান্য পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে সেনহাড্রিনের আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি। সময়ের সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবছর একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে এই সম্মেলনের আহ্বান করা হতো। যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, পৃথিবীর প্রতিটি দেশ থেকে তাদের সদস্যগণ এই সম্মেলনে বাধ্যতামূলক অংশ গ্রহণ করত। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, উৎসাহ প্রদানকারী বক্তা, ধনী ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় গুরু সবাই এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হতো, তবে সদস্যদের অধিকাংশই হতো 'রাবাই'।

রাবাই হওয়ার পাশাপাশি অনেকে ব্যাবসা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করত। আর এই সদস্যরাই মূলত সেনহাড্রিনের নিয়মিত সভায় আমন্ত্রণ পেত। ব্যাপারটি এমন নয়, শুধু গুপ্ত সদস্যরাই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেত। আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু মাপকাঠি অনুসরণ করা হতো। যারা এই মাপকাঠিতে অধিক নম্বর পেত, পরের বছর তাদের এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এই মাপকাঠিতে কী কী বিষয় থাকত তা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও কিছুটা অনুমান করা যায়।

হতে পারে অন্যান্য দেশের প্রশাসনিক গভীরতায় কে কতটুকু প্রবেশ করতে পেরেছে, জ্যান্টাইলদের ফাঁদে ফেলতে অর্থনীতির নতুন সূত্রটি কে আবিষ্কার করেছে, সমাজ বিভাজনকারী নতুন মতবাদটি কে আবিষ্কার করেছে, ইজরাইলের খুঁটি মজবুত করতে নতুন পরিকল্পনাটি কে তৈরি করেছে ইত্যাদি।

তবে তারা যে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত একটি জাতি, এ নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। এমন একটি শৃঙ্খল জাতি কিন্তু এক দিনে প্রতিষ্ঠা পায়নি। তাদের আছে চৌকশ অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিমান গুপ্তচর। তারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে গোপন আলোচনাসভার আয়োজন করে এবং কাজ শেষে গোপনেই সরে পড়ে।

প্রশ্ন হতে পারে, তাদের পররাষ্ট্রনীতি কেমন? উত্তর অনেকটা এ রকম– তারা জ্যান্টাইলদের সর্বাবস্থায় শত্রু গণ্য করে। তাদের বিশ্বাস, পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে জ্যান্টাইল সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করেই টিকতে হবে। ফলে তাদের পররাষ্ট্রনীতি যে মোটেও বন্ধু সুলভ নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তারা বর্তমানে দাঁড়িয়ে দূর-ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং সম্মিলিতভাবে এই পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করে।

সাধারণ সদস্যদের অনেকেই জানে না, কে তাদের রাজা। সত্যি বলতে, সেনহাড্রিনের সদস্যগণ ব্যতীত অন্য কারও কাছে রাজার পরিচয় প্রকাশ করা হয় না। খুব সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে সেনহাড্রিনের কিছু সদস্যের পরিচয় অনুমান করা সম্ভব হলেও প্রকৃত রাজার পরিচয় অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব।

তাদের এই অদৃশ্য রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়মকানুন এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে *Protocols of the Learned Elders of Zion* নামে প্রকাশিত বইটির ২৪ তম প্রটোকলে উল্লেখ আছে–

> 'এখন বলব কীভাবে পৃথিবীর সব শক্তিশালী রাজ্যের পর্দা ভেদ করে আমরা রাজা ডেভিডের (নবি দাউদ) সিংহাসন পুনরুদ্ধার করব। পৃথিবীর বুকে এই রাজবংশের ধারা আজও বিদ্যমান। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও শিক্ষিত প্রতিটি ব্যক্তিই এই রাজবংশের উত্তরাধিকারী, যাদের ওপর পুরো বিশ্বের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে।'

বিষয়টি একটি ইঙ্গিত দিচ্ছে– আমরা তাদের বিরুদ্ধে যত ধরনের প্রতিরোধই গড়ে তুলি না কেন, তারা নিজেদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করবেই। বিশ্বব্যাপী তাদের সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই প্রতিষ্ঠা পাবে– এমন প্রতিজ্ঞা হতে তারা কখনো সরে আসবে না। শুধু যে রাজনীতির মাঠে তারা এই প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়; বরং শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-দিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমরাস্ত্র কূটনীতির মতো প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনেও নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করেছে।

ইহুদিদের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রটোকলসমূহ

যার হাত ধরে *Protocols of the Learned Elders of Zion* পূর্ণ বই আকারে বাজারে প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিচয় কখনো উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। প্রথমে এটিকে রাশিয়ান ভাষায় ছাপানো এবং পরে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফরাসি বিপ্লব চলাকালে Duc d'Orleans-এর যে ধ্বংসাত্মক রূপ পুরো পৃথিবী দেখতে পায়, বইটিতে ইহুদি সাম্রাজ্যবাদীদের এমনই একটি রূপ উন্মোচিত হয়েছে।

বইটিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– কে তাদের প্রকৃত শত্রু এবং তারা কাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি করছে। এমন নয় যে, নির্দিষ্ট কোনো রাজা বা অভিজাত সম্প্রদায় তাদের এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু; বরং পৃথিবীর পুরো জ্যান্টাইল সম্প্রদায়-ই ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু। জ্যান্টাইল শব্দটি এ বইটিতে অসংখ্যবার এসেছে। এবার এর কিছু প্রটোকল নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম প্রটোকলে উল্লেখ আছে–

> 'কোনো সন্দেহ নেই, সততা ও সরলতা মানব চরিত্রের মহৎ দুটি গুণ, কিন্তু রাজনীতির মাঠে এর কোনো স্থান নেই। একজন শক্তিশালী শত্রুকে মোকাবিলা করার চেয়ে এই দুটি মানবীয় গুণ রক্ষা করা অধিক কঠিন ব্যাপার। কারণ, আমাদের শাসনব্যবস্থায় সততা ও সরলতার কোনো স্থান নেই। এগুলো শুধু জ্যান্টাইলদের শাসনব্যবস্থায় পাওয়া যাবে।
>
> বংশ পরম্পরায় আমরা জ্যান্টাইলদের শাসনব্যবস্থায় বারবার আঘাত হেনেছি এবং নিজেদের অনুশাসন চাপিয়ে দিয়েছি। আমাদের শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হলো অর্থ-সম্পদ, যার মালিক কেবল আমরাই। আর বিজ্ঞান? সেও তো আমাদেরই আবিষ্কার।
>
> আমরা শ্রমিকদের বিভিন্ন মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে জড়িয়ে দেবো। একই সঙ্গে বাজারে পণ্যমূল্যও বাড়িয়ে দেবো। আমরা বলব– কৃষি উৎপাদন কম হওয়ায় বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই বর্ধিত মজুরি তাদের কোনো উপকারেই আসবে না। আমরা সুকৌশলে কৃষকদের মাঝে অরাজকতা ছড়িয়ে দেবো এবং আত্মতৃপ্তির উপায় হিসেবে মদ্যপানে আসক্ত করে তুলব, যা ধীরে ধীরে তাদের জ্ঞানশূন্য জাতিতে পরিণত করবে।
>
> জ্যান্টাইলরা কখনোই আমাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়তে পারবে না। আমাদের একাংশ ছদ্মবেশে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে থাকবে এবং বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলন উসকে দেবে, যেন বাজার অস্থিতিশীল রাখা যায়। পরে এই অস্থিতিশীল বাজারে নতুন এক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পাবে, যার মূল প্রণেতা হব আমরাই।'

প্রটোকলগুলো ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখবেন, তারা পুরো মানবজাতিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে; আমরা ও জ্যান্টাইল। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে, যদি আঠারোতম প্রটোকলে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলো লক্ষ করেন। যেমন–

> 'জ্যান্টাইলদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে– আমরা হলাম সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সম্প্রদায় এবং মানবশ্রেণির মধ্যে উচ্চ। আর জ্যান্টাইলরা হচ্ছে দুই পায়ে চলমান মানব পশু! তাদের না আছে দূরদৃষ্টি, আর না আছে নতুন কিছু আবিষ্কার করার ক্ষমতা। অন্তর্যামী নিজ হাতে এই বিশ্বের শাসনভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।
>
> 'যতদিন না ইহুদি ভাইদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান ও দায়িত্বশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন যেন নিজেদের চারিত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখে। আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রটোকলগুলো বাস্তবায়নে তারা কতটা সফল, তা চারদিকে তাকালেই উপলব্ধি করা সম্ভব। খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে– সেখানে একজন শিক্ষক ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, কীভাবে জ্যান্টাইলদের বিরুদ্ধে পরিকল্পন তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হয়। তা ছাড়া ইহুদিদের পরিকল্পনা কত দূর বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এখনও কতটুকু বাকি, তাও এই অনুচ্ছেদগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো প্রকার তথ্য বা মতামত চাওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় পরিকল্পনার সবকিছু শুধু একজন গুরুর মাথা থেকে আসছে। আর বাকি সবাই এই অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য।

প্রটোকলটির পাণ্ডুলিপি বাজারে প্রকাশিত হওয়ার পর ইহুদিরা বলতে শুরু করে–

> 'সত্যি যদি এমন একটি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে আমাদের কোনো গোপন পরিকল্পনা থাকত, তবে কখনোই তা জ্যান্টাইলদের সামনে উন্মোচিত হতো না।'

আসলে এটি যে তাদের বা সেনহাড্রিনের কোনো সদস্য প্রকাশ করেছে, তা নয়। আগের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে– জায়োনিস্টরা খুব গোপনে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে মাঝেমধ্যেই আলোচনা সভার আয়োজন করে। হয়তো বিশেষ কোনো আগ্রহী ব্যক্তি বহু দিন এই দলটিকে অনুসরণ করত এবং নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রটোকলগুলো জানতে পেরেছিল, যা তিনি পরবর্তীকালে লেকচার নোট আকারে প্রকাশ করেন।

আপনি যদি মন দিয়ে পুরো পাণ্ডুলিপিটা অধ্যয়ন করেন– তবে বুঝতে পারবেন, এই প্রটোকলগুলো আজকে বা একশত বছর আগে তৈরি করা হয়নি। এগুলো তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার প্রমাণস্বরূপ। তবে সময়ের প্রেক্ষাপটে

এবং কৌশলগত অবস্থার কারণে প্রটোকলগুলোতে সামান্য পরিবর্তন এসেছে। প্রথম প্রটোকলের কোনো একটি অনুচ্ছেদে পাবেন–

> 'স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি মতবাদকে আমরা অতি প্রাচীনকাল থেকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু পৃথিবীর বোকা-গর্দভ বুদ্ধিজীবীরা এই মতবাদগুলো নিজেদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম বলে মনে করছে এবং এর জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করছে। তারা নিজেরাই আমাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করেছে। সম্ভবত অতি-বুদ্ধিমান ও সুকৌশলী ব্যক্তিরাও এসব মতবাদের মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা কখনো বুঝতে পারেনি– একতা, সাম্য বা স্বাধীনতা বলতে আদৌ কিছুই নেই।'

এই প্রটোকলগুলো পরিবর্তন আনার অধিকার কারা রাখে, সে সম্পর্কে তেরোতম প্রটোকলে আলোচনা করা হয়েছে–

> 'এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা কেবল তাদের-ই রয়েছে, যারা বহু শতাব্দী ধরে এই প্রটোকলগুলোকে অক্ষুণ্ন রেখেছে।'

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, এখানে বক্তার ব্যক্তিগত কোনো সম্মান বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য– ইজরাইলের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় ও মজবুত করা। তারা ইতোমধ্যেই বিভ্রান্তিকর নানা মতবাদ দিয়ে জ্যান্টাইল সমাজব্যবস্থায় ফাঁটল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এত কিছুর পরও যুগে যুগে জ্যান্টাইলদের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, যারা দীপ্ত কণ্ঠে বলেছে– আজ যা কিছুকে বিজ্ঞান বলে মনে করা হচ্ছে, তার অনেক কিছুই প্রকৃত বিজ্ঞান নয়। যেগুলো আমরা অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার বিধান বলে মনে করছি, তা আসলে কোনো বিধান নয়। এগুলো মানব সৃষ্ট কিছু ভ্রান্ত নিয়মকানুন, যা আমাদের মধ্যে ফাঁটল তৈরিতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে পরিচিত শত্রুদের বিরুদ্ধেও আমরা এক হতে পারছি না। আমরা যেন ইহুদিদের প্রটোকলগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে না পারি এবং তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ পর্যন্ত না করি, সে জন্য তারা আমাদের ওপর এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। যার দরুন তাদের প্রণীত অনুশাসনগুলো ভেড়ার মতো আত্মস্ত করে বড়ো হচ্ছি।

জ্যান্টাইলদের প্রতি ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি

নিজেদের যতই বুদ্ধিমান বা উঁচু শ্রেণির মানুষ মনে করি না কেন, ইহুদিদের কাছে আমরা বোকা, গর্দভ ও সাদামাটা মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রাণী ব্যতীত কিছুই নই। আমাদের সম্পর্কে

তাদের ধারণাগুলো যে তাচ্ছিল্যকর হলেও সত্য, তা প্রটোকলের বইটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করলেই বোঝা সম্ভব। এবার বাছাই করা কিছু প্রটোকল নিয়ে জ্যান্টাইলদের প্রতি ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা যাক।

প্রথম প্রটোকল দিয়েই শুরু করি–

> 'মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে ভালো মানুষের চেয়ে খারাপ মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের বাগে আনার একমাত্র কৌশল ভয়-ভীতি প্রদর্শন। প্রাতিষ্ঠানিক ও কেতাবি শিক্ষা দিয়ে তাদের কখনো বশ করা যাবে না। ক্ষমতার লোভ সবারই থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেকে শাসকরূপে দেখতে চায়। আর অন্যের ভালোর জন্য নিজের ভালো উৎসর্গ করবে– এমনটা খুব কমই দেখা যায়।
>
> জ্যান্টাইলদের হুজুগে প্রকৃতির বললেও ভুল হবে না। তারা সামান্য আবেগ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত অহংকারের দরুনও নিজেদের মধ্যে বিভাজন করতে রাজি। হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। আবার দুই-একটি মিথ্যা প্রচারণায় কান দিয়ে মহানায়ককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। বুদ্ধিমান প্রাণী হলে এমনটা কখনোই করত না। তাই তারা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না।
>
> গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নতুন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে জনসাধারণের অনুমতি আবশ্যক। কিন্তু তারা এটা বোঝে না, বেশিরভাগ মানুষই নিরেট মূর্খ ও বুদ্ধিহীন। তারা একবার ডান পক্ষের পিছে ছোটে, আরেকবার বাম পক্ষের। তাদের কাছ থেকে কখনো গঠনমূলক পরামর্শ পাওয়া সম্ভব নয়।
>
> আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথ ইতোমধ্যেই অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। জ্যান্টাইল মনস্তত্ত্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আমরা ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছি। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর লোভ-লালসা দেখিয়ে আমরা তাদের বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছি। চরিত্রিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্যের দেয়াল গড়ে তুলেছি।'

এবার পঞ্চম প্রটোকলের একটি অনুচ্ছেদের দিকে লক্ষ করুন–

> 'জ্যান্টালরা কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতিকে অধিক গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আদৌ তা পূরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাদের বশ করতে পারব; ক্ষমতায় যাওয়ার পর তা নিয়ে মাথাব্যথা না করলেও চলবে।'

এগারোতম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'আসলে জ্যান্টাইলরা হলো ভেড়ার পাল। আমরা যে বিষয়েই প্রতিশ্রুতি দিই না কেন, তা তারা অন্ধের মতো গ্রহণ করবে। আমরা স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেবো, কিন্তু তার আগে আমরাই তাদের মাঝে অশান্তি, অরাজকতা ও যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবো। এই স্বাধীনতার জন্য তাদের কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, তা কি বলতে হবে? আমরা চাইলে এই যুদ্ধ ও শান্তি আলোচনার মেয়াদ ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে নিতে পারব। প্রথমে তাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেবো এবং পরে সেই ভয় থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দেবো।'

এবার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থায় জ্যান্টাইলদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে–

'সাধারণত দুঃসাহসী, রোমাঞ্চপ্রিয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা সামাজের প্রশংসা কুড়াতে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থায় (Spy Agency) যোগদান করে। আমরা খুব সহজেই তাদের খুঁজে বের করব এবং পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করব।

কৌতূহলী জ্যান্টাইলরা পুরো বিশ্বকে সামনে রেখে এ পর্যন্ত অসংখ্য গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, এই গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমেই সমাজের সকল অপরাধ কর্মের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা তাদের সফলতা এনে দেবো, যা তাদের মাঝে বড়াই ও আহমিকতার জন্ম দেবে। এতে তারা কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়াই আমাদের পরবর্তী পরামর্শগুলো নির্দিধায় গ্রহণ করবে। তোমরা ভাবতেও পারবে না, এই বড়াই ও অহমিকা তাদের কতটা নির্বোধ করে তুলবে! এমতাবস্থায় সামান্য একটি ব্যর্থতাই তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে জ্যান্টাইলরা ব্যক্তিমোহ, জনপ্রিয়তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। কিন্তু ব্যক্তিমোহ আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং জাতীয় উদ্দেশ্যই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।'

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী জ্যান্টাইলরা মানসিক প্রণোদনা এবং নতুন মতবাদগুলো খাবারের মতো গ্রহণ করে। কিন্তু নতুন মতবাদগুলোর ভবিষ্যৎ ফলাফল কী হতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করতে রাজি নয়। চোখের দেখায় যা ভালো লাগে, তা-ই তারা গ্রহণ করে।

জায়োনিস্টরা আজ পর্যন্ত অসংখ্য মতবাদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। যখনই একটি মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে, তখনই আরেকটি বাজারে এনেছে। প্রতি ধাপে জ্যান্টাইলরা হয়েছে দুর্বল ও নেতৃত্বশূন্য। দেশের জনগণ যদি এক হয়, তবে সরকার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। তবে দেশের জনগণ যে বিষয়টির ভিত্তিতে এক হচ্ছে, সে সম্পর্কেই তো সাধারণ মানুষের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই। তারা তা-ই করেছে,

যা নেতারা করতে বলছে। বলশেভিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েটদের সূত্রপাত ঠিক এভাবেই হয়। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতাকে পুঁজি করে সমাজে সব সময় তৃতীয় একটি গোষ্ঠী লুটপাটের চেষ্টা করে। এটা জানার পরও দেশের রাজনৈতিক দলগুলো অহংকারের দাপটে এক হতে চায় না। ফলে লুণ্ঠনকারী তৃতীয় দলটি ইচ্ছেমতো নিজের স্বার্থ লুফে নেয়। আর এই তৃতীয় পক্ষটি হলো ইহুদি জাতিগোষ্ঠী।

মূলত প্রকৃত উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তা আমরা অনেকেই জানি না। আমাদের পূর্বপুরুষরা চাকা আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতায় নতুন যুগের সূচনা করে। সে চাকা দিয়ে তৈরি হয় টারবাইন। প্রবাহমান বাতাস ও পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবিত হয় টারবাইন ঘোরানোর কৌশল, যা দিয়ে আবিষ্কৃত হয় বিদ্যুৎশক্তি। আজ পেট্রোল-ডিজেল দিয়ে ছোটোখাটো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। এখন প্রশ্ন হলো– আসলেই কি চাঁকারূপি টারবাইন সেকেলে প্রযুক্তি? বায়ু ও পানিশক্তি ব্যবহার করে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে নতুন শক্তির জন্ম দিয়েছে, তা কি সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না? এই প্রযুক্তিগুলো কি বর্তমান সমাজের চাহিদা মেটাতে অক্ষম?

আসলে যে বিষয়গুলোকে আমরা 'অগ্রগতির উপায়' বলে স্বীকৃতি দিয়েছি, তা প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশ, সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করেছে। অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা সমাজে এমনই বিবর্তনের জন্ম দেয়, যা বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে পেট রক্ষার তাগিদে চোখে যা ভালো দেখায়– তাই আদর্শ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করে, কিন্তু এই আদর্শের পেছনে থাকে শয়তান। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, রক্ষণশীলতা, পুঁজিবাদ, মৌলবাদ ইত্যাদি সবই এর উদাহরণ, যা তাদের হাত ধরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। নিজেদের মতবাদগুলো যেভাবে তারা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তার কিছু নমুনা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

প্রথম প্রটোকলের একটি অনুচ্ছেদ থেকে–

> 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিছকই একটি ধ্বংসাত্মক ধারণা। অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে ক্ষমতায় থাকা দল ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। মানুষও চায় না সেখানে কোনো দল গড়ে উঠুক। এমতাবস্থায় ক্ষমতাসীন দলটির পতন ঘটাতে চাইলে সে সমাজের মগজে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টি ঢুকিয়ে দিতে হবে। বোঝাতে হবে, সবার রাজনীতি করার অধিকার আছে। জনগণ চাইলে তাদের মধ্য হতে যে কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতায় বাসাতে পারে। ধীরে ধীরে সে সমাজে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়টি সহজতর হতে শুরু করবে, যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা একাধিক দলের জন্ম দেবো। প্রত্যেক দলের জন্য অসংখ্য সমর্থক গড়ে তুলব। এটাই জ্যান্টাইলদের ঐক্যে ফাঁটল তৈরি করবে, যার শেষ পরিণতি হবে ক্ষমতাশীল দলের পতন এবং নতুন শক্তির ক্ষমতায়ন।'

পঞ্চম প্রটোকলে লক্ষ করুন—

> 'জনমত নিয়ন্ত্রণে শুরুতেই আমরা বিভিন্ন মতবাদ জ্যান্টাইলদের মগজে ঢুকিয়ে দেবো, যা তাদের মধ্যে হাজারো গোলকধাঁধার জন্ম দেবে। একসময় বিরক্ত হয়ে বলবে— রাজনৈতিক বিতর্কে নিজেদের না জড়ানোই ভালো। এ কৌশলটি রাজনীতির মাঠ থেকে অন্য দলের সমর্থকদের সরিয়ে দিতে সাহায্য করবে।'
>
> দ্বিতীয়ত, আমরা মানুষের অভ্যাসগত চাহিদাগুলো সহজে মিটিয়ে দেবো। অভাব মানুষের হৃদয়ে মানবিকতার জন্ম দেয়, পক্ষান্তরে ভোগ-বিলাস মানুষকে মনুষত্বহীন করে তোলে। যখন মানুষ তাদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো সহজে মেটাতে পারবে, তখন তারা আর অন্যের চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসবে না। তাদের নিকট ব্যক্তিগত আনন্দ প্রাধান্য পেতে শুরু করবে। ফলে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলোতে তারা কখনো এক হতে পারবে না। কারণ, ততদিনে তাদের চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

তেরোতম প্রটোকলে উল্লেখ আছে—

> 'তোমরা লক্ষ রাখবে, আমরা শুধু প্রতিশ্রুতির গ্রহণযোগ্যতা চাই। আদৌ তা বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা বলি, মানুষের কল্যাণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর এটা এ কারণেই বলি, সাধারণ মানুষ যেন আমাদের কথাগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং সমাজে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।'
>
> অশান্ত জনগণের মাথা থেকে রাজনৈতিক চিন্তা সরিয়ে দিতে আমরা অসংখ্য নতুন সমস্যার জন্ম দেবো। এটা তাদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের পথে অনেক বাধা সৃষ্টি করবে। যেমন : মজুরি সমস্যা, চাকরির নিরাপত্তা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কেউ রাজনৈতিক বিতর্কে মাথা ঘামাতে চাইবে না।
>
> 'আমরা তাদের বিনোদন, খেলাধুলা ও আয়েশি জীবনে ডুবিয়ে রাখব। তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং অন্য বিষয়ে চিন্তা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এভাবে একটা সময় তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পাবে।'
>
> উদারপন্থি, গণতান্ত্রিক ও মুক্তমনা নীতিগুলো ব্যবহার করে জ্যান্টাইলদের বিভিন্ন ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে দোল খাওয়াতে শুরু করব। তারা উদারপন্থি নীতিকে প্রগতির অংশ বলে মনে করবে, কিন্তু নির্বোধ এই জাতি প্রগতির সংজ্ঞাই তো জানে না!'

শুধু রাজনীতিবিদরাই নয়; লেখক, কবি, শিক্ষক, সমাজবাদী ও রাবাইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইহুদিরা পুরো মানবজাতিকে অসংখ্যবার নানা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে, যার সূচনা হয়েছে হাজার বছর আগেই। শুধু আজকে নয়, অতীতেও তারা এমনটা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

নবম প্রটোকলের দিকে লক্ষ করুন–

> 'রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, কমিউনিজম (সাম্যবাদ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করব। সেইসঙ্গে তাদের আমাদের সেবায় নিয়োজিত করব। এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিদ্যমান প্রতিটি শাসনব্যবস্থাকে আমরা একসময় উপরে ফেলতে সক্ষম হব। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জাতিকে শান্তিতে থাকতে দেবো না, যতদিন না তারা আমাদের অনুশাসনগুলো মেনে নিচ্ছে।'

এরপর, দশম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

> 'যখনই আমরা উদারপন্থি ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঢুকিয়ে দিলাম, তখনই তা রাজনৈতিক দলগুলোর রূপরেখা রাতারাতি পালটে দিলো।'

জ্যান্টাইলদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, সে সম্পর্কে নবম প্রটোকলে উল্লেখ আছে–

> 'জ্যান্টাইল যুব সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতাবোধ ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ধ্বংস করতে এক মিথ্যা ও বানোয়াট শিক্ষাব্যবস্থা ইতোমধ্যে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; আমরা যদিও নিজেরা এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করব না।'

শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যবহার করে কীভাবে পারিবারিক বন্ধনে ফাঁটল ধরানো সম্ভব, তা দশম প্রটোকলে উল্লেখ করা হয়েছে–

> 'আমাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠিতে পরিণত করব। কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে এই শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা যোগ্যতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ব। একসময় এই শিক্ষাব্যবস্থা তাদের মাঝে অহমিকা ও অহংকারের জন্ম দেবে, যা পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উসকে দেবে।
>
> যতদিন না কাঙ্ক্ষিত সময়টি হাতের মুঠোয় আসছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে ডুবিয়ে রাখব। যেসব মতবাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তা তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার নিরন্তন চেষ্টা চালিয়ে যাব।

ডারউইনবাদ, মার্কসবাদ, নাৎসিবাদ ইত্যাদিকে প্রগতিশীলতার উপায় হিসেবে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। এসব তত্ত্বের ওপর ভর করে আমরা তাদের নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করেছি এবং সামনের দিনগুলোতেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না।'

উল্লেখ্য, প্রটোকলগুলোর কোথাও বলা হয়নি– তারা জ্যান্টাইলদের চিরতরে ধ্বংস করে ফেলতে চায়; বরং তারা চায়– জ্যান্টাইলরা যেন তাদের প্রভুত্ব মেনে নেয় এবং চিরকাল দাস হয়ে থাকে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ পুরো পৃথিবী এক অদৃশ্য স্বৈরশাসনের অধীনে চলছে।

'আমরা জানি জ্যান্টাইলদের একতার ভিত্তি খুবই দুর্বল। সামান্য কিছু সময়ের জন্য এক হলেও আমরা আবারও তাদের দুর্বল করে ফেলতে পারব। গত দুই হাজার বছরে এ কাজ আমরা অসংখ্যবার করেছি।'

ইহুদি রাষ্ট্রের প্রটোকল ব্যবস্থার আংশিক বাস্তবায়ন

নিছক কৌতূহল নিয়েও যদি 'Protocols of the Learned Elders of Zion' পাঠ করেন, তবে কারও কারও নিকট এ বই নিছক সাহিত্যকর্ম বলে মনে হবে। লেখক সাহেব যেভাবে তার ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার কথা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে গেছেন, তা সত্যিই অবাক করার মতো। তিনি বলছেন–

'আমরা পরিকল্পনা মাফিক অনেক দূর এগিয়ে গেছি। এখন আমাদের পক্ষে আর পেছনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

নবম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'এখন আমাদের সামনে আর কোনো বাধা নেই। বিশ্ব কর্মসূচি (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) পরিকল্পনায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আদালত, প্রশাসন, আইনশাস্ত্র সবকিছু আজ আমাদের দখলে। একসময় আমরা যাদের প্রজা ছিলাম, আজ তাদেরকেই প্রজারূপে কিনে নিয়েছি। নিঃসন্দেহে আমরা তাদের চেয়েও কঠোর শাসক।'

এবার অষ্টম প্রটোকলের দিকে লক্ষ করুন–

'এই পরিকল্পনায় আমরা বিশ্বজুড়ে বহু অর্থনীতিবিদের জন্ম দেবো। কারণ, অর্থশাস্ত্রের চেয়ে বড়ো কোনো হাতিয়ার পৃথিবীতে নেই। আমরা চারদিকে ব্যাংকার, শিল্পপতি ও ধনকুবেরের মতো অসংখ্য ব্যক্তিত্বের জন্ম দেবো, যারা নিজেদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তুলবে। অবুঝ জ্যান্টাইলরা তাদের নিজেদের জীবনাদর্শ বলে মনে করবে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার।'

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের যা পড়ানো হচ্ছে, তা তো তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া সিলেবাস! বলশেভিক বিপ্লবকালীন সময়ে পৃথিবী এমন এক যুগ পার করেছে, যখন অর্থনীতির ওপর লেখা প্রতি দশটি বইয়ে মধ্যে ৭/৮টি বই-ই ইহুদিরা লিখেছে।

আসলে তাদের লেখা বইগুলো পাঠ করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জ্যান্টাইল সমাজকে পঙ্গু করতে তারা যখন ইচ্ছাপূর্বক ভুলে ভরা শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়, তখন তার বিরুদ্ধে কথা বলতেই হয়। তারাই প্রথম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাইবেল পাঠ বন্ধ করে দিয়েছে।

নবম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

> 'খ্রিষ্টান পাদরিদের সঙ্গে আমরা সব সময় ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছি। একসময় আমরা তাদের অনেক তোষামোদ করেছি, যেন তাদের গভীরে প্রবেশ করে সব ধরনের নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করে দিতে পারি। এখন আর তোষামোদের প্রয়োজন নেই। কারণ, তাদের মাঝে ধর্ম পালনের গুরুত্ব এমনিতেই কমে গেছে। ফলে পোপ ও পাদরিদের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করেছে।'

এরপর প্রথম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

> 'অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা দিনে দিনে আমাদের আরও দুর্ভেদ্য করে তুলবে। পরিচয় গোপন করে অদৃশ্য ছায়ার ন্যায় আমরা প্রতিটি রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতার ইন্ধন জোগাব। ফলে জ্যান্টাইলরা হাজার চেষ্টা করেও আমাদের সাথে পেরে উঠবে না।'

দ্বিতীয় প্রটোকলে বলা হয়েছে–

> 'প্রতিটি যুদ্ধে উভয়পক্ষই যেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আর্থিক দুর্যোগ যেন উভয়ের কপালেই নেমে আসে, তা আমরা নিশ্চিত করব। প্রেক্ষাপট এমনভাবে তৈরি করব, যেন যুদ্ধপরবর্তী সকল ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসে।'

অন্যদের হেয় ও অপমান করতে তারা কতটা অভ্যস্ত, তা নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে–

> 'জ্যান্টাইল সরকারদের ব্যর্থতার ওপর আমাদের প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত আর্টিক্যাল প্রকাশ করবে। এসব সংবাদ পাঠ করে সাধারণ জনগণ একসময় সরকারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠবে। আসলে একটি রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে ছোটোখাটো ভুল সবাই করে। আমরা সরকারের ভুলগুলো এমনভাবে প্রচার করব, যেন তাদের ভালো কাজগুলো কারও নজরে না আসে।'

এবার পঞ্চম প্রটোকল হতে–

'ইতোমধ্যেই আমরা জ্যান্টাইলদের রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করতে সক্ষম হয়েছি। আদালতের রায় তা-ই হবে, যা আমরা বলব।'

চোদ্দোতম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'মিথ্যে, বানোয়াট ও অশ্লীল গল্প-সাহিত্যের বীজ আমরা প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি। সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছি, এগুলোই আধুনিকতার অংশ। অতীত ইতিহাস পালটে তার স্থলে নতুন গল্প ঢুকিয়েছি এবং সাধারণ মানুষকে তা বিশ্বাস করিয়েছি।'

বারোতম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে খবর সংগ্রহের বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীভূত করেছি। একটি চেইন-শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি দেশের গণমাধ্যমের ওপর আমরা অদৃশ্য আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছি।'

সপ্তম প্রটোকলেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে–

'প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় আমরা জ্যান্টাইল সরকারদের হাত-পা বেঁধে ফেলব। তারা চাইলেও আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। কারণ, আমরা চাইলে যেকোনো মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জোয়ার বইয়ে দিতে পারব, যা তাদের ক্ষমতা থেকে উপড়ে ফেলবে।'

এবার বারোতম প্রেটোকলের দিকে লক্ষ করুন–

'আমাদের সব কূট-পরিকল্পনা দেখেও যখন তারা চুপচাপ বসে আছে এবং ক্ষমতার জন্য উলটো আমাদের কাছেই পরামর্শ প্রার্থনা করছে, তখন তাদের নির্বোধ ও গাধা বলব না কেন?'

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বিজয় অর্জন প্রসঙ্গে নবম প্রটোকলে বেশ কিছু কৌশলের কথা বলা হয়েছে–

'প্রথমদিকে জ্যান্টাইলদের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করা বেশ কঠিন ছিল। তাদের মজবুত প্রাচীর আমাদের নিকট দুর্ভেদ্য ছিল। তবে গণতন্ত্রের বিষয়টি তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সবকিছু যেন মুহূর্তেই পালটে গেল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বাধীনতা, সম-ভোটাধিকার, সম-আইন সবই হলো গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি। এ বিষয়গুলো সমাজে স্থান পেলে আমাদের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে ওঠে।'

আমেরিকাতে ইহুদি সন্তানদের জন্য বিশেষ সুরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। তারা যেন একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা পর্যন্ত জ্যান্টাইলদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকে, সে জন্য তৈরি করা হয়েছে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা। যে স্কুলগুলোতে ইহুদিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, সেগুলোর ঠিকানা এতটাই গোপন রাখা হয়, শহরের বড়ো বড়ো রুই-কাতলারা পর্যন্ত তা জানতে পারে না। এমনকী গুরুতর চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও তাদের জ্যান্টাইল ডাক্তারদের কাছে যেতে দেওয়া হয় না; তাদের রয়েছে পৃথক চিকিৎসাব্যবস্থা।

জ্যান্টাইল যুব সমাজের নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করতে ইতোমধ্যেই ইহুদিরা অশ্লীলতার অসংখ্য বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে। যেমন : জ্যাজ সংগীতের আবিষ্কারক কারা? কারা থিয়েটার ও চলচ্চিত্র শিল্পে নগ্নতার সংযোজন করেছে? কারা পর্নগ্রাফিকে বাণিজ্যিক শিল্পে রূপ দিয়েছে? কারা আমাদের যুবসমাজকে সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে? কারা তাদের রোমাঞ্চকর জীবনের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজেদের মুনাফার পকেট ভারী করছে? কারা আমাদের তরুণ-তরুণীদের পোশাক-আশাকে পরিবর্তন এনেছে এবং নগ্নতাকে সভ্য সংস্কৃতির অংশ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে?

এ প্রসঙ্গে ইহুদিদের প্রটোকলে বলা হয়েছে–

> 'জ্যান্টাইল যুব সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতাবোধ ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ধ্বংস করতে আমরা ইতোমধ্যে তাদের ওপর এক অবাস্তব ও অযৌক্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে।'

যখন-তখন মুভি দেখা আজ মধ্যবিত্ত পরিবারের যেকোনো যুবকের নিকট আদর্শ বিনোদন হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে ধনী পরিবারের যুবকদের নিকট অবাধ যৌনাচার আদর্শ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও স্বীকৃত।

এই নোংরা সংস্কৃতি কীভাবে আমাদের সমাজে স্থান পেল, সে সম্পর্কে থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীতশিল্প সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে এই অংশে খুব অল্প করে বলতে চাই– উদারপন্থি ও মুক্তচিন্তা নীতিকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা বহু অশ্লীল সংস্কৃতি আমাদের সমাজে আমদানি করেছে। এর পেছনে বিনিয়োগ করেছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। ব্যয়বহুল চিত্তবিনোদন, নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ, জুয়ার আসর, জ্যাজ সংগীত, লোক দেখানো ফ্যাশন, গহনা-অলঙ্কার ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়-ই আজ জ্যান্টাইলদের অভ্যস্ত করে তুলেছে। তাদের বাজিকরদের দৌরাত্ম্যের দরুন ধ্বংস হতে বসেছে বহু জনপ্রিয় ক্রিড়াশিল্প। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের এমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই, যার ভেতর ইহুদিরা বিষ ঢুকিয়ে দেয়নি।

জ্যান্টাইলরা সাধারণত ষড়যন্ত্রসুলভ মানসিকতা নিয়ে জন্মায় না। সাধারণ মানুষ পরিকল্পনা করে কীভাবে একটি উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়, কিন্তু ইহুদিরা পরিকল্পনা করে

কীভাবে চার-পাঁচটি উদ্দেশ্য একত্রে হাসিল করা যায়! কেবল একটি রজ্জু ধরে আমরা কখনো তাদের ষড়যন্ত্রের গুহায় প্রবেশ করতে পারব না। এতে ফিরে আসার পথটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলব। এ জন্য প্রয়োজন পারিপার্শিক বিষয়গুলোর ওপর সুচতুর পর্যবেক্ষণ এবং ইতিহাসের প্রখর জ্ঞানার্জন। তবে এর জন্য প্রথমে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে 'মানসিক অলসতা' নামক বিষয়টি দূর করে ফেলতে হবে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে ইহুদিদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

বহু পরিকল্পিত বিশ্ব কর্মসূচি (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) সফল করতে তারা যে বিষয়গুলো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে তা হলো :

ক. প্রতিটি দেশকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা।

খ. পুঁজিবাজার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে শিল্পায়নের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

গ. জ্যান্টাইলদের ওপর এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া, যা তাদের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিমত্তাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

ঘ. বিভিন্ন সৌখিন ও বিনোদনধর্মী বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে তোলা (যেমন : Jazz সংগীত, নেশা দ্রব্য), যা তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ঙ. বিভাজনের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে অসংখ্য রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম দেওয়া।

কীভাবে রাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধিগণ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী) নির্বাচিত হবে, কীভাবে রাজতন্ত্র ভেঙে গণতন্ত্রের উত্থান হবে, কীভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হবে এবং কীভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, তার একটিও প্রটোকলগুলোতে উপেক্ষিত হয়নি। তাদের প্রটোকলগুলো নিয়মিত পরিবর্তনে বিশ্বাসী। যেমন : কিছুদিন পরপর সাধারণ নির্বাচন, নতুন নতুন প্রতিনিধির ক্ষমতায়ন, নিয়মিত আইন ও সংবিধান পরিবর্তন করা ইত্যাদি। তারা অগোচরে জনসাধারণকে উসকে দেয়, যেন পরের মেয়াদে নতুন কোনো জনপ্রতিনিধিকে ক্ষমতায় আনা হয়।

প্রথম প্রটোকলটির দিকে লক্ষ করুন–

> 'একটা সাধারণ ধারণা আমরা স্বাধীন দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। তা হলো– জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে তাদের মধ্য হতে একজন জনপ্রতিনিধি (সরকার) নির্বাচন করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চাইলে যখন-তখন এসব প্রতিনিধিদের পালটাতে পারি, ঠিক যেমন হাতমোজা পুরোনো হলে পরিবর্তন করে ফেলি। আমরাই এসব জনপ্রতিনিধিদের জন্ম দিই এবং আমরাই আবার তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিই।'

চাইলে একজন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব। কারণ, তার প্রতি সাধারণ মানুষের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। আজ যে শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে অনুসৃত হচ্ছে তা হলো গণতন্ত্র। একই সঙ্গে আরেকটি ব্যবস্থা মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তা হলো– সমাজতন্ত্র। এর আগে যে ব্যবস্থাটি বিশ্বজুড়ে ছিল, তা হলো রাজতন্ত্র।

গণতন্ত্র বলে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার পুরো দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে। তাই বলা হয় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তবে এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিটি দেশকে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হয়, যার মধ্যে থাকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধর্মঘট, অগ্নিকাণ্ড, সামরিক বিপ্লবসহ আরও অনেক কিছু। কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্ম হবে, তা নিয়ে চতুর্থ প্রটোকলে আলোচনা করা হয়েছে–

> 'বহু ধাপ পেরিয়ে একটি দেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ পায়। প্রথম ধাপে পুরো দেশে বর্বর যুগের ন্যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। আর মানুষ নির্বোধের মতো ডানপক্ষ কিংবা বামপক্ষ সমর্থন করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করে। দ্বিতীয় ধাপে, অবৈধ স্বৈরশাসকের জন্ম হয়। যদিও স্বৈরশাসক বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না, কিন্তু তার প্রভাব চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায়। এ সময় জনপ্রিয় কিছু নেতা-কর্মীর জন্ম হবে। পরে তাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে ক্ষমতায় আনা হবে, যারা শুধু আমাদের পক্ষেই কাজ করবে। প্রয়োজনে আমরা তাকে সরিয়েও দিতে পারব। জ্যান্টাইলদের কেউ এই গোপন খেলাটি বুঝতে পারবে না। তারা শুধু জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।'

সরকার ব্যবস্থায় 'নিয়মিত পরিবর্তন' বিষয়টি ইউরোপ-আমেরিকার জন্য নতুন কোনো বিষয় নয়। এমন কোনো সিনেটর নেই, যে এর সঙ্গে পরিচিত নয়। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কেবল তখনই পরিবর্তন আসে, যখন তারা ইহুদি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাদের ওপর দ্রুত অর্থনৈতিক অবরোধ আসা শুরু করে। সকল বড়ো বড়ো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শুরু করে, যা দেশকে সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। দেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করছে, তার কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি দেশপ্রেম থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যান! অথচ গণমাধ্যম ইতোমধ্যেই অন্য একটি দলের পক্ষে চলে গেছে। তারা চাইলে ইচ্ছেমতো সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনো জনমত তৈরি করতে পারে। ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা কখনো বন্ধ হয় না। চোদ্দোতম প্রটোকলে বলা আছে–

> 'প্রশাসনে এত বেশি পরিবর্তন দেখে জ্যান্টাইলরা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু সরকারবিরোধী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে আমরা পুনরায় তাদের উৎসাহিত করব। সব শেষে রাষ্ট্রব্যবস্থার শান্তি ফিরিয়ে আনতে তারা আমাদের যেকোনো শর্ত মেনে নিতে রাজি হবে।'

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় তারা কতটা সফল, তা নবম প্রটোকলের একটি অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা সম্ভব–

'আজকের দিনে যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তবে তা কেবল ক্ষমতার স্বার্থেই। অথচ তাদের এই ক্ষমতা আমাদের হাতে বন্দি। তারা যা নিয়ে আন্দোলন করবে, তাও আমাদের ইশারায় পরিচালিত হয়। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কাদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়বে? তার আশেপাশে যে পার্লামেন্ট সদস্যরা আছে, তারা সবাই তো লোভি প্রকৃতির। তাদের কিনে নেওয়া আমাদের জন্য কোনো ঘটনাই না!'

তারপর আরও বলা হয়েছে–

'বস্তুত, পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রপ্রধানকে আমরা ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তবে এখনও আরও অনেককে সরিয়ে দেওয়ার বাকি আছে।'

এসব আন্দোলনের পেছনে অর্থনৈতিক সহায়তা কোথা থেকে আসবে, সে প্রসঙ্গে নবম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক শত্রুতার দরুন রাষ্ট্রের পুরো ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসে। ফলে আমরাই তাদের বিবাদের সমাধান করি। এই শত্রুতার মধ্যে আমরা সারাক্ষণ ঘি ঢেলে যাব। এর জন্য যে অর্থ দরকার, তা আমরাই সরবরাহ করব।'

নির্বাচনী প্রচারণার সময় এত অর্থ কোথা হতে আসে তা নিয়ে অনেক তদন্ত হয়েছে, তবে এর উৎস কখনো খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ প্রশাসন আজ ইহুদি প্রশাসনে রূপ নিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'জনগণের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিকে আমরা শাসক হিসেবে নির্বাচিত করব, তাকে কখনোই সাধারণ জনগণের প্রতি সেবাসীন হতে দেবো না। আমাদের একদল প্রতিনিধি তার উপদেষ্টা হিসেবে মন্ত্রণালয়ে কাজ করবে, যারা ছোটোকাল থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো হয়েছে। এই প্রতিনিধিরা খুব ভালো করেই জানে, কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় এবং কী করে আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হয়।'

দশম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

কীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান হবে এবং স্বৈরশাসন থেকে নির্বাচনভিত্তিক শাসনব্যবস্থার জন্ম হবে।'

১৯১৮ সালে বলশেভিক বিপ্লবে সোভিয়েত বাহিনী সফল হওয়ার পর রাশিয়ার ইহুদি ছাত্র ও সৈনিকরা রাস্তায় নেমে গাইতে শুরু করে–

> 'We have given you a God;
> Now we will give you a king.'

গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে ১০ম প্রটোকলের একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে–

> 'গণতন্ত্রের যুগ শুরু হলে জনগণ তাদের মধ্য হতে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের ধারায় চলে যাবে। ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন, আমরা ক্ষমতাশীন ও বিরোধী দলের পেছনে সমান অর্থ খরচ করব। ঠিক যেভাবে মাটির নিচে মাইন পোঁতা হয়, গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করে জ্যান্টাইলরা সমাজে অনুরূপ মাইন পুঁতে রাখবে।'

ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন, তার বিপরীতে কিছু রাজনৈতিক দল অবশ্যই থাকবে। তারা বিক্ষোভ, মিছিল ও আন্দোলন নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকবে। শাসকপক্ষ যদি তাদের কঠোর হস্তে দমন করতে না পারে, তবে নিশ্চিত সরকারের পতন ঘটবে। আবার তা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বর্বর হতে হবে। সুতরাং দিন যত যাবে, বিস্ফোরক মাইনটি আরও শক্তিশালি হবে।

'আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেব। প্রার্থী হিসেবে তাদেরই অগ্রাধিকার দেবো, যাদের অতীত ইতিহাস কালো অধ্যায়ে পরিপূর্ণ; অনেকটা পানামা কলঙ্কের মতো। কেউ তাদের অতীত ইতিহাস ফাঁস করে দিতে পারে– ক্ষমতায় আসার পর এমন একটি ভয়ে তারা সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকবে। যার দরুন তারা না চাইলেও আমাদের বিশ্বস্ত কর্মীতে পরিণত হবে। এবার তাদের কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন সুবিধা হাতিয়ে নেওয়া কি আমাদের জন্য কঠিন কোনো কাজ হবে?'

এখানে 'পানামা' শব্দটি উল্লেখের কারণ হচ্ছে– পানামা খাল খনন করা নিয়ে ফ্রান্সের রাজনৈতিক গণ্ডিতে প্রচুর দুর্নীতিবাজের জন্ম হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে আজ পর্যন্ত যারা নির্বাচিত হয়েছে, তাদের সকলের ইতিহাসেই কলঙ্কের দাগ রয়েছে। এমন নয় যে, ক্ষমতার গদিতে যারা বসে আছে তাদের কলঙ্কের কথা কেউ জানে না। নির্বাচনের পূর্বে গণমাধ্যমের সহায়তায় কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীর কলঙ্কময় ইতিহাস ঢেকে রাখা হয়। তবে হ্যাঁ, যে পক্ষটিকে তারা ক্ষমতায় দেখতে চায় না, ইহুদিরা চাইলেই তার কলঙ্ক ফাঁস করে দিতে পারে। ফলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ইহুদিদের সেই গোপন সংগঠনটির কাছে চিরকালের মতো আটকা পড়ে। যদি জনপ্রতিনিধিরা কখনো অবাধ্য হয়, তবে তাদের অতীত ফাঁস করে জনমনে আগুন ছড়িয়ে দেওয়া কঠিন কোনো ব্যাপার নয়।

আজকাল রাজনৈতিক পাড়ায় 'ভয়' বিষয়টি যেন সবাইকে পেয়ে বসেছে। শুধু আমেরিকা নয়; জার্মানি, আর্মেনিয়া, রাশিয়া বা হিন্দুস্তান এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যারা ইহুদি বা ইজরাইলের বিরুদ্ধে সামান্যতম কথা বলার সাহস করতে পারে। হয়তো লিগ অব নেশনস-এর প্রস্তাবিত কোনো ইস্যুতে তারা ইজরাইলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার সাহস কেউ করতে পারে না; তার ওপর অ্যান্টি-সেমিটিজমের ভূত তো আছেই! ইহুদিদের মধ্যে যারা গরিব, তারা আমাদের ধনীদের চেয়েও অধিক সম্পদশালী। সংখ্যালঘু হওয়ার পরও তারা আজ অধিক ক্ষমতাধর।

বিশ্ব শাসনে নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে হলে এই ভয়টি জিইয়ে রাখা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তারা যেভাবে এই ভয়ের জন্ম দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছে, তার জন্য সাধুবাদ দেওয়া উচিত। কারণ, এটাও এক ধরনের শিল্প। তাদের সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকে। আর যখনই এই ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়ে, তখনই তাদের নগ্ন রূপ বেরিয়ে আসে।

সত্য বলতে, ইহুদিরা কোনো অতিমানবীয় প্রাণী নয়। তারাও আমাদের মতো রক্ত-মাংসে গড়া জীব। হতে পারে তারা বুদ্ধিমান ও চৌকস, কিন্তু তাতে এমন কিছু ঘটে যায়নি যে তাদের কুর্নিশ করতে হবে। পৃথিবীতে আমাদের সবার সমানভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। ইহুদিরা যতই চালাক হোক না কেন, এমন কোনো পর্দা নেই যা তাদের কুৎসিত ইতিহাস ঢেকে রাখতে পারে। আর এখানেই তাদের দুর্বলতা। বিশ্ববাসী যদি ইহুদিদের এই দুর্বলতার সন্ধান জানত, তবে ভয় নামক যে পর্দা দিয়ে তারা আমাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতো।

ভূ-সম্পদ আক্রমণে ইহুদিদের পরিকল্পনা

আবাসন শিল্পে ইহুদি জমিদারদের ফটকা বাণিজ্যের দরুন বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বের অনেক শহরের চেহারা রাতারাতি বদলে যায়। প্রতিবার জমি বিক্রির সময় পূর্ব মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা আজ যেন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯১৮-১৯ সাল কমনওয়েলথ কমিটি ভূমি সংকট নিরসনে কিছু আইন প্রণয়ন করে; যদিও তা বহু আগেই করা উচিত ছিল। কমিটির সভাপতি ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে বিশেষ কিছু পরিবারের পরিচয় খুঁজে পায়, যাদের একমাত্র পেশা ছিল ভূমি ব্যাবসা। তারা একই জমি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মাঝে বারবার ক্রয়-বিক্রয় করত, যেন বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সবশেষে ভূমির বিক্রয়মূল্য কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছালে ইহুদিরা তা জ্যান্টাইলদের নিকট বিক্রি করত।

একসময় ইউরোপ-আমেরিকার এমন অনেক জায়গা ছিল, যার নাম-গন্ধ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ শোনেনি। তারা সেসব জমি খুব পরিকল্পিতভাবে প্রকৃত মালিকদের থেকে কিনে নিত।

তারা যে মূল্যে জমিগুলো ক্রয়ের প্রস্তাব দিত, তা শুনে জমির মালিকরা ভাবত– এমন জমি তো আর এখানে এসে কেউ ক্রয় করবে না! এ অবস্থায় যে এতটা মূল্য পাচ্ছি তা-ই বা কম কীসে! এই ভেবে অনেকে তাদের জমিগুলো বিক্রি করত। এরপর তারা সেসব জমি উন্নয়নে কিছু কাজ করত। যেমন : স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি।

এরপর বড়ো বড়ো শহরগুলোতে শুরু হতো প্রচার ও বিজ্ঞাপনের কাজ। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের কিছু সদস্য ছদ্মবেশে এই জমিগুলো ক্রয়ে আগ্রহ দেখাত। এ নিয়ে তাদের প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত কলাম প্রকাশ করত, যেন পুরো শহরকে এই জমিগুলোর আলোচনায় সরগরম রাখা যায়। চায়ের দোকান, মদের দোকান এবং বাজারের আলোচনা মঞ্চ প্রতিটি স্থানেই দক্ষ অভিনেতার ন্যায় তারা এই আলোচনা চালিয়ে যেত। তারা নিজ থেকে এই আলোচনায় জ্যান্টাইলদের ডাকত না, কিন্তু উচ্চস্বরে যেভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত, তা সাধারণ মানুষের কৌতূহল অনেকগুণ বাড়িয়ে দিত। না চাইলেও তারা অবচেতন মনে এই গুঞ্জন ঢুকে যেত। মানুষ ভাবত, শহরের বাইরে এখনও এত ভালো জমি পাওয়া যায়! তাহলে সব জমি শেষ হওয়ার আগে নিজেদের জন্য কিছু কিনে রাখছি না কেন?

একসময় তাদের এই কূটকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে দেশি-বিদেশি অনেক বিনিয়োগকারী এই জমিগুলোর প্রতি আগ্রহ দেখাত এবং ক্রয় করত; তবে তা অতি উচ্চমূল্যে, যেমনটা ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক এবং ফ্লোরিডার জমিগুলোর বেলায় হয়। মাঝ থেকে ইহুদিরা হাতিয়ে নিত বিশাল অঙ্কের মুনাফা, যার একটি কমিশন চলে যেত তাদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কেননা, তারা বিভিন্ন সময়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত।

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সাধ্যের মধ্যে একটি সুন্দর বাসা খুঁজে পেতে যে কতটা হিমশিম খায়, তা কারও অজানা নয়। আপসোসের ব্যাপার হচ্ছে– জমি বাণিজ্যের এই শয়তানি সংস্কৃতি আজ জ্যান্টাইলদের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। যদি কমিটির সভাপতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই অনুসন্ধান না চালাতেন, তাহলে এই তথ্য কখনোই জনসম্মুখে উন্মোচিত হতো না। কারণ, বিভিন্ন দেশের পরিসংখান ব্যুরোকে ইহুদি জাতিগোষ্ঠি একাই নিয়ন্ত্রণ করছে। গোয়েন্দা বাহিনীর ভেতরে তারা গড়ে তুলেছে ছোটো ছোটো আরও অনেক দল, যারা বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থার হাত-পা-মাথা হয়ে কাজ করছে। ফলে পরিসংখ্যান ব্যুরো যে তথ্যই প্রকাশ করুক না কেন, তা গোয়েন্দাদের সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়।

উচ্চমূল্যে ভূমি বিক্রি করা ছাড়াও ইহুদিদের এসব জমি ক্রয়ের আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল। যেমন : জ্যান্টাইল কৃষকদের নিজেদের জমি ব্যবহার করতে দেওয়া। বিষয়টি অনেকটা বর্গা চাষের মতো। এর ফলে উৎপাদিত ফসলের একটি বড়ো অংশ তাদের ভান্ডারে চলে যেত। তা ছাড়া অধিকাংশ জমি যদি তাদের দখলে থাকে, তবে জ্যান্টাইলদের পক্ষে কখনো প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম

তারা কৃষক হয়ে মাঠে কাজ করবে। তা ছাড়া যেসব জমিতে সোনা, রুপা, তামা, নিকেল ইত্যাদি মজুত আছে, সেসব জমির প্রতি ইহুদিদের রয়েছে ভিন্ন মাত্রার মোহ। যেমন : আলাস্কা, ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের জমিগুলো।

যখন ইহুদিরা কোনো দেশ দখলের পরিকল্পনা করে, তখন প্রথমে সে দেশের উৎপাদনশীল জমিগুলো দখলের চেষ্টা চালায়। এর মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য এবং শিল্পকাজে ব্যবহৃত কাচাঁমালের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফলে ধীরে ধীরে শিল্পবাজার তাদের দখলে আসে। একই পথে পুঁজিবাজারও হাঁটতে শুরু করে। এরপর তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় শুরু হয় পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের মধ্যে দ্বন্দ, যার অবসান কখনোই হয় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকা প্রচুর পশমি পণ্য জার্মানি থেকে আমদানি করত। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন আগে তারা সকল অর্ডার তুলে নেয়। এতে জার্মান ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়ে। রাতারাতি সেখানে পশমি পণ্যের দাম কমা শুরু করে। ওত পেতে থাকা জার্মান ইহুদিরা অতি স্বল্পমূল্যে সেগুলো কিনে নেয়। যুদ্ধ শেষ হলে তারা আবার সেই পণ্য আমেরিকান বাজারে উচ্চমূল্যে রপ্তানি করে।

আমেরিকান বাজারে যদি কোনো বিপর্যয় নেমে আসে, তবে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ইহুদিদের প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলো সামনে চলে আসে। বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে ইতালিয়ান, পোলিশ, ব্রিটিশ বা জার্মান নাগরিকদের অভিযুক্ত করে, কিন্তু কখনোই নিজেদের নাম উল্লেখ করে না। ইদানীং তারা ভূমি ব্যাবসার এজেন্ট হিসেবে জ্যান্টাইলদের ব্যবহার করছে। ব্যাংকিং জগতেও একই দশা। ফলে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করা জ্যান্টাইলদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

পূর্বের একটি প্রটোকলে বলা হয়েছে– বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে ইহুদিরা কৃত্রিম চাহিদার জন্ম দেয়। প্রথমত, বর্গা চাষের ফলে উৎপাদিত পণ্যের বিশাল মালিকানা তাদের দখলে আসে। দ্বিতীয়ত, অবশিষ্ট পণ্য কৃষকদের থেকে কৌশলে কিনে নেয়। এরপর ইহুদিরা হয়ে যায় সকল পণ্যের মধ্যস্বত্বভোগী। তারা যে মূল্য নির্ধারণ করে, তা-ই হয়ে যায় বাজারের বিক্রয় মূল্য; যা পরিশোধে ভোক্তাসমাজ বাধ্য হয়। মূলত ব্যাপারটা এমন– ভোক্তাসমাজ পণ্য ক্রয় করে না; বরং সেগুলোকে জিম্মি থেকে মুক্ত করে মাত্র।

ফটকাবাজির আরও একটি উদাহরণ– আমেরিকার তুলার বাজারকে ইহুদিদের নিজের আয়ত্তে নেওয়া। ব্যাংক ঋণ ছিল তাদের এই কাজের মোক্ষম হাতিয়ার। প্রথমে যতটা সম্ভব তুলা জমির উপযোগিতা কমানো হতো। কৃষকরা ঋণের জন্য ব্যাংকে এলে তাদের চাষের জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। নির্ধারিত একরের বেশি জমিতে চাষ করলে ব্যাংক তাদের ঋণ দিত না। ফলে চাহিদা থাকার পরও তুলার উৎপাদন কমে যেত।

এতে না শিল্প-মালিকরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ তুলা পেত, আর না কৃষকরা ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে পারত। অবশেষে ব্যাংক এসে জমিগুলো দখল করে কৃষকদের ভিখারি বানিয়ে দিত। ফলে জমি ও বাজার দুটোই তাদের হতো। তুলা শিল্পে শয়তানি শক্তির আগ্রাসন নিয়ে একটি গুঞ্জন উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আমেরিকার আকাশে-বাতাসে উড়ছিল। কিন্তু জ্যান্টাইলরা এর প্রকৃত রূপ তখনই বুঝতে পারে, যখন আর করার কিছু ছিল না।

ভূমি নিয়ে তাদের প্রটোকলগুলোতে তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। যা আলোচনা হয়েছে তা কেবল ষষ্ঠ প্রটোকলে। যেমন :

'বাজারের সব সম্পদ নিজেদের দখলে নিয়ে আমরা একচেটিয়া আধিপত্যের জন্ম দেবো। জ্যান্টাইল রাষ্ট্রগুলো যতই সম্পদশালী হোক না কেন, একসময় তাদেরকে আমাদের সম্পদের ওপরই নির্ভর করতেই হবে। এই নির্ভশীলতা তাদের ঋণের বেড়াজালে আটকে ফেলবে, যা তাদের ওপর জাতীয় দায়রূপে চেপে বসবে। তাদের এই দুর্বলতাকে ব্যবহার করে আমরা আন্তর্জাতিক স্বৈরশাসনের জন্ম দেবো। তখন কেবল আমরাই এই বিশ্ব মানবতাকে মহা-বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। আমরা কেবল তাদেরই অনুগ্রহ দেখাব, যারা আমাদের সকল অনুশাসন মাথা পেতে নেবে।

দাম্ভিকতা জ্যান্টাইল রাজনীতিবিদদের চরিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যেহেতু তারা বিশাল ভূ-সম্পদের মালিক এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারছে, সেহেতু কোনো একদিন তারা আমাদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই যেকোনো মূল্যেই হোক তাদের সব জমি দখল করতে হবে।

এ কাজে সবচেয়ে কার্যকর উপায়– কৃষকদের বন্ধকি ঋণে আটকে ফেলা। আমরা তাদের ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করব। ধীরে ধীরে ঋণের সুদ কৃষকদের ওপর চেপে বসবে। একসময় জমির মালিক হওয়ার পরও তারা আমাদের অধীনস্থ হবে। এই আনুগত্য তাদের সকল অহংকার ও দাম্ভিকতাকে ধ্বংস করে দেবে।

শিল্প-অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে জ্যান্টাইলদের উৎসাহিত করব, যেন তারা আমাদের নিজেদের অংশ বলে মনে করে। কিন্তু এই উৎসাহ যেন তাদের কোনো উপকারে না আসে সে ব্যবস্থাও করে রাখব। যদি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই আমরা জ্যান্টাইলদের ঋণ দেওয়া শুরু করি, তবে তাদের সম্পদের প্রাচুর্যতা অনেক বেড়ে যাবে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় তারা ঋণের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সব জমি মুক্ত করবে। এমনটা আমরা কখনো হতে দেবো না। ফটকা পরিকল্পনার মাধ্যমে জ্যান্টাইলদের মূলধনশূন্য করব। একসময় তারা সর্বহারা মানুষের মতো অস্তিত্ব সংকটে পড়বে এবং বাঁচার জন্য আমাদের পায়ে এসে মাথা ঠুকবে।

আমরা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে জড়িয়ে দেবো এবং একই সময় বাজারে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেবো। আমরা বলব– কৃষি উৎপাদন কম হওয়ার দরুন এ বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সু-কৌশলে তাদের মাঝে অরাজকতা ছড়িয়ে দেবো এবং আত্মতৃপ্তির উপায় হিসেবে মদ্যপানে আসক্ত করে তুলব। এভাবে ধীরে ধীরে তারা জ্ঞানশূন্য জাতিতে পরিণত হবে।

মানুষ আমাদের সূক্ষ্ম পরিকল্পনাগুলো কখনোই বুঝতে পারবে না। আমরা লোক দেখানো সমাজসেবার মুখোশ পড়ে বলব– জনসাধারণের মঙ্গল করাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য দিয়ে আমরা কেবল নিজেদেরই উপকার করব, তাদের নয়।'

এবার আরও দুটি প্রটোকল থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ :

> 'যতদিন না জ্যান্টাইলরা আমাদের অর্থ ও ক্ষমতার মাঝে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে না নেবে, ততদিন পর্যন্ত ক্ষুধা, দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, মতবিরোধ, পারস্পরিক শত্রুতা ইত্যাদিতে আবদ্ধ করে রাখব।' (দশম প্রটোকল)

'একসময় তারা বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক সকল ক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে দেবে, আর তখনই আমরা নিজেদের বিশ্ব অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করব।

> 'আমরা তাদের ওপর এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেবো, যা তাদের নৈতিক চেতনাকে পঙ্গু করে দেবে। সেইসঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও ধ্বংস করে দেবে।' (পঞ্চম প্রটোকল)

প্রটোকলগুলো যারা তৈরি করেছে, তারা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও সম্পদশালী ইহুদি। তারা কী করতে যাচ্ছে এবং কীভাবে করবে, সে বিষয়ে খুব ভালো করে জানে। তারা জানে– যতদিন আকাশে সূর্য উঠবে এবং মৌসুমি বায়ু ও পানির ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কৃষকসমাজ অপরাজেয় শক্তি। কারণ, খাদ্যের অভাবই পৃথিবীর প্রকৃত অভাব। যার খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা আছে, সে অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে অতি আয়েসে নিজের পুরোটা জীবন পার করে দিতে পারে। তাই এমন কিছু করা উচিত, যা দ্বারা এই শান্তিপ্রিয় মানুষদের অশান্ত করে তোলা যায়।

তারা নিজেদের পরিকল্পনায় কতটা সফল, তা চারদিকে চোখ বোলালেই উপলব্ধি করা সম্ভব। আগেই বলা হয়েছে– কৃষি কাজে ইহুদিরা একদমই পারদর্শী ছিল না, কিন্তু ভিন্নধর্মী পণ্য তৈরিতে তারা ছিল ওস্তাদ। রঙিন-কারুকাজ সংবলিত ফুলের টব, পানির পাত্র, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি প্রথম তারাই বাজারে নিয়ে আসে, যা উচ্চমূল্যে বিক্রি করত।

একটা সময় ছিল, যখন এসব পণ্য ক্রয়ে মানুষ কোনো আগ্রহ দেখাত না। তারা বিশ্বাস করত, অর্থ অপচয় দরিদ্রতা ডেকে আনে। ফলে ইহুদিরা বহু বছর এসব পণ্য নিয়ে অপেক্ষা করে।

একজন-দুইজন করতে করতে বাজারে একসময় ক্রেতা সংখ্যা বাড়তে থাকে। নতুন নতুন নকশা সংবলিত পণ্য-সামগ্রীকে তারা 'স্টাইল' ও 'ফ্যাশন' নামে পরিচিত করে তোলে। মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়– স্টাইল ও ফ্যাশন হলো আভিজাত্যের অংশ।

একসময় জ্যান্টাইল কৃষকরা দেখল, সৌখিন পণ্যের এই বাণিজ্য আসলেই অনেক লাভজনক। ফসল উৎপাদন করতে অনেক সময় লাগে। সাথে পরিশ্রমও বেশি। তা ছাড়া ফসল একবার নষ্ট হলে সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যায়। ফলে তারাও এ জাতীয় পণ্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আর এভাবেই আমরা জাতি হিসেবে উৎপাদনবিমুখ হয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্য থেকে অনেকেই সৌখিন শিল্পে দক্ষ হয়ে ওঠে এবং সমাজের বাহবা পেতে থাকে। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারলাম না, যা করছি তা এককথায়– সময় ও পরিশ্রমের অপচয়।

এ প্রসঙ্গে ষষ্ঠ প্রটোকল উল্লেখ আছে–

> 'জ্যান্টাইলদের শিল্পগুলো ধ্বংস করতে তাদের সৌখিন পণ্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলব, যা তাদের চাহিদা ও রুচিবোধের ধারণা একেবারে পালটে দেবে। এসব চকচকে পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ে আমরা তাদের উৎসাহিত করব।'

অনেক পিতা-মাতা, সুশীল সমাজ ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম, তরুণ সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অনেক জ্ঞানী মানুষ তাদের পরামর্শ দিয়েছে– 'বিলাসিতা পরিত্যাগ করে সম্পদকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করো।' অনেক অর্থনীতিবিদ বলেছে– 'অপ্রয়োজনীয় শিল্পের পিছে না ছুটে এমন সব শিল্পের পেছনে ছোটো, যা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করবে।' অনেক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান পরামর্শ দিয়েছে– 'সৌখিন পণ্য তৈরি না করে মাঠে গিয়ে ফসল উৎপাদন করো, যেন ক্ষুধার্ত থাকতে না হয়।' এসব সতর্কবাণীর উদ্দেশ্য হলো– আমাদের যুবসমাজ যেন সময় ও শ্রম ভুল পথে নষ্ট না করে।

আমরা সাধারণ মানুষরাই-বা কম কীসে! অপ্রয়োজনীয় সৌখিন পণ্যের চাহিদা তো আমরাই বাড়িয়ে দিয়েছি। একই ধরনের পণ্য ক্রয় করতে করতে ক্রেতারা যখন ক্লান্ত হয়ে উঠে, তখন তারা ভিন্নধর্মী পণ্যের অনুসন্ধান করে। কখনো কি ভেবে দেখেছেন, এসব সৌখিন পণ্য ব্যবহারের দরুন ইহুদিরা কি আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

লক্ষ করে দেখবেন, তারা খুব দামি চকচকে কাপড় পরে আপনার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই জামাগুলো সত্যই খুব দামি এবং কাপড়গুলোও উন্নতমানের। দেখবেন, ইহুদি রমণীরা বড়ো বড়ো হিরার গহনা পরে হেঁটে যাচ্ছে, যার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। মূলত তারা কখনো নিজেদের অসাধু আবিষ্কারের শিকার হবে না। কারণ, তাদের হারানোর ভয় নেই। তারা এসেছে শুধু আমাদের ধ্বংস করতে। তাই ক্ষতি হলে শুধু আমাদেরই হবে, তাদের নয়।

আজ আমাদের মনোবৃত্তি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে, পালা বদলের সাথে সাথে নিজেদের মাঝে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগাতেই হবে, রুচিবোধে পরিবর্তন আনতে হবে এবং বিভিন্ন স্টাইল ও ফ্যাশনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। একসময় আমরা দরিদ্রতার ভয়ে সামান্য অর্থ অপচয় করতেও ভয় পেতাম। আর এখন উপার্জনের একটি অংশ আলাদা করে রাখি, যেন পরবর্তী বছর নতুন কিছু সৌখিন পণ্য ক্রয় করতে পারি। একটি গোষ্ঠী আছে, যারা বহু আগ থেকেই নির্ধারণ করে রাখে আগামী বছর এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে বাজারে নতুন কী কী পণ্য নিয়ে আসা হবে। আমাদের বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও দূরদর্শী মনোভাবকে ধ্বংস করে দিয়ে ইহুদিরা গড়ে তুলেছে মুনাফার পাহাড়। মূলত আমরা নিজেরাই তাদের জালে ধরা দিয়েছি।

এবার, প্রথম প্রটোকলের দিকে লক্ষ করুন–

> 'আমরা জ্যান্টাইলদের কখনো সৌখিন পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করব না, কিন্তু তারা এতটাই বোকা যে নিজ থেকেই এই জালে জড়িয়ে পরবে।'

আমাদের মানসিক বিকলাঙ্গতার দরুন 'কৃষক' পেশাটি আজ অনেকের নিকট ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এমন রূপ নিয়েছে, কৃষকরাই আজ নিজেদের ঘৃণা করা শুরু করেছে। তারা চায় না তাদের সন্তানরা এই পেশায় আসুক। সন্তানরা যেন অন্য কিছুর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে– এটাই তাদের একমাত্র কামনা। অথচ কৃষি কাজ পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশাগুলোর মধ্যে একটি, যা আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান জুগিয়েছে।

এমন একটি পেশাকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং কৃষকদের সঙ্গে অচ্ছুতের ন্যায় আচরণ করার দরুন সমাজে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, তা সামান্য হলেও উপলব্ধি করতে পারছি। খাদ্য ঘাটতি ও বেকারত্ব যে পৃথিবীর প্রকটতম দুটি সমস্যা, তা আর দলিলসহকারে উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই দুটি সমস্যার উপযুক্ত সমাধান যা হতে পারত, তা আমরা ঘৃণার চোখে এড়িয়ে চলছি। মানুষ আজ সে পথেই হাঁটছে, যে পথে দ্রুত সম্পদ উপার্জন করা যায়; তা মদ-সিগারেট বা সৌখিন পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে হলেও। আসলে মহাদুর্ভিক্ষে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মানবসমাজ উপলব্ধি করতে পারবে না– তারা জ্ঞান ও মানসিকতাকে কতটা ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

প্রকাশনা শিল্পে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

তথ্য বাণিজ্য করে যে প্রচুর মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব, তা ইহুদিদের পূর্বে অন্য কোনো জাতি বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারেনি। তারাই প্রথম জাতি, যারা তথ্য বাণিজ্যকে সাংবাদিকতায় রূপদান করেছে। খ্রিষ্টবছর গণনা শুরুর পর থেকে ইউরোপের দেশগুলোতে কখন কী ঘটতে যাচ্ছে, সেই তথ্য তারা বহু আগেই পেয়ে যেত। তারপর এসব তথ্য নিউজলেটারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করত। কীভাবে ইহুদিরা ভবিষ্যতের সংবাদ আগেই পেয়ে যেত, তা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আজ পর্যন্ত কখনো কি এমন কারও নাম শুনেছেন, যিনি একই সঙ্গে একাধিক দেশের সংসদ সদস্য ছিলেন? আদৌ কি কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে ইতালি ও জার্মানির সংসদ সদস্য হতে পারবে? ইতিহাসে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

আশা করি আপনাদের সেনহাড্রিনের কথা মনে আছে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রতিনিধিগণ এই সভায় একত্রিত হতো। মজার বিষয়- তাদের বেশিরভাগ সদস্যই ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যেমন : সংসদ সদস্য, সামরিক উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টা ইত্যাদি। ফলে তাদের নিকট নিজ নিজ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য মজুদ থাকত। সেনহাড্রিনের অধিবেশন বসলে তারা সবাই নিজ নিজ এলাকার খবরাখবর সেখানে উপস্থাপন করত! যেমন : ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা ফ্রান্সের খবর এবং ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিরা ইংল্যান্ডের খবর ফাঁস করত। ইউরোপিয়ান রাজারা যত নতুন পরিকল্পনাই গ্রহণ করুক না কেন, সেনহাড্রিনের মাধ্যমে সেই সংবাদ অন্য সদস্যদের কানে চলে যেত। এবার তাদের রাজা উত্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন সব পরিকল্পনা তৈরি করতেন। ইউরোপিয়ান রাজারা হয়তো সেনহাড্রিনের বিষয়টি জানতেন না, তবে তথ্য পাচারের বিষয়টি অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই প্রায় সময় ইহুদিদের বিদেশ ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতো। পুরো বিষয়টি আপনাদের কাছে গল্প বলে মনে হতে পারে।

অনেকেই হয়তো রথসচাইল্ড পরিবারের নাম শুনে থাকবেন। পরিবারটির প্রতিষ্ঠাতা Mayer Amschel Rothschild তার পাঁচ ছেলেকে ইউরোপের পাঁচটি দেশে পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবসায় সূচনা করেন।

ইহুদিদের কাছে তথ্যের কেন এত কদর ছিল, তা Nathan Rothschild-এর ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে জানতে পারবেন। নেপোলিয়নকে যখন নির্বাসিত করে এলবা দ্বীপে পাঠানো হয়, তখন ইংল্যান্ড ভেবেছিল হয়তো ইউরোপ থেকে এবার তার বিদায় হলো। তবে নেপোলিয়ান যে আবারও ইউরোপে ফিরে আসবেন, তা অনেকেই ভাবতে পারেনি; এমনকী Nathan নিজেও নয়। এরপর শুরু হয় সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ, যা 'Battle of Waterloo' নামে পরিচিত। সেখানে ইংল্যান্ডের কাছে ফ্রান্সের নেপোলিয়ন বাহিনী পরাজিত হয়।

আগেই বলে রাখি, Nathan ছিল অতি ভীরু ও কাপুরুষ প্রকৃতির মানুষ। সে নিজে কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত না। রক্ত দেখলেই চুপসে যেত, তবে প্রতিটি যুদ্ধেই সে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করত। এই যুদ্ধে সে ইংল্যান্ড সেনাবাহিনীর পেছনে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র মাঠের কোথাও সে লুকিয়ে পড়ে এবং দেখতে থাকে, যুদ্ধের ফলাফল কোন দিকে যায়। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও নেপোলিয়ন যখন তার সৈন্য বাহিনীকে শেষ আক্রমণের আদেশ দেয়, Nathan বুঝে যায়– যুদ্ধের ফলাফল কী হতে যাচ্ছে।

তখন সে দ্রুত ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে অনেকের সাথে দেখা হয়, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সে কাউকে জানায় না। ব্রাসেলস থেকে অতি উচ্চমূল্যে একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দ্রুত ওস্টেন্ডে পৌছায়। সেখান থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে ইংল্যান্ড। ঝড় শুরু হওয়ার দরুন কোনো জাহাজ যেতে রাজি হচ্ছিল না। আগেই বলেছি, Nathan ছিল ভীরু ও কাপুরুষ প্রকৃতির। কিন্তু তার চোখে যে ভাসছে লন্ডন শেয়ার বাজার; যা বর্তমানে অনায়াসে দখল করা সম্ভব! অনেক কষ্টে সে ২,০০০ ফ্রাঙ্ক (Francs) ভাড়া দিয়ে একটি জাহাজ পেল। অবশেষে ভাগ্যের কল্যাণে অর্ধমৃত অবস্থায় ইংল্যান্ডের উপকূলে পৌছাল।

সে সময় কোনো টেলিগ্রাম ছিল না। তাই যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে, তা কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। ২০ জুন ১৮১৫, Nathan নিজ অফিসে হাজির হয়। তার মনমরা চেহারা দেখে সবাই ঘাবড়ে যায়। চারদিকে জনরব ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড যুদ্ধে হেরেছে। জনরব আরও ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যখন সে যুদ্ধে পরাজিত হওয়া নিয়ে একটি কলাম লিখে। কেউ বুঝতে পারেনি, Nathan কিছু একটা লুকিয়ে রাখছে। ফ্রান্সের সৈন্যরা ইংল্যান্ড আক্রমণ করতে পারে, এই ভেবে অনেকে তাদের শেয়ার বিক্রি করা শুরু করে। এই সুযোগে Nathan সাহেব পানির দামে সবগুলো শেয়ার কিনে নেয়।

পরপর দুই দিন (২০-২১ তারিখ) এই শেয়ার কেনা-বেচা চলল। দ্বিতীয় দিন শেয়ার বাজার বন্ধ হওয়ার আগে সে ১ কোটি ডলার সমমূল্যের শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয় করে। এর কিছুক্ষণ পর ইংল্যান্ডের বিজয়ী সেনাবাহিনি যুদ্ধ জয়ের খবর নিয়ে ওয়ালিংটনে হাজির হয়, কিন্তু ততক্ষণে জনসম্পত্তির এক বিশাল অংশ Nathan সাহেবের সিন্ধুকে চলে যায়। এর পুরোটা সম্ভব হয়েছিল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করে মিথ্যা খবর প্রচারের মাধ্যমে।

যেখানে নিরপেক্ষ গণমাধ্যমের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে সংখ্যালঘুরা খুব সহজেই ক্ষমতা দখল করতে পারে। ছোট্ট এই উদাহরণটি এর যথার্থতা প্রমাণ করে। একই ঘটনা ঘটেছে বলশেভিক ও ফরাসি বিপ্লবের সময়ও।

সে সময় রাশিয়া ও ফ্রান্সের সকল বড়ো বড়ো পত্রিকা ছিল ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সংবাদ প্রকাশ করত। মূলত সমাজে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব কতটুকু, তা তখনকার মানুষ বুঝতে পারেনি। প্যারিসের মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত জানতই না, তাদের দুর্গ (Bastille) ভেঙে পড়েছে এবং কয়েদিরা পালিয়ে গেছে। আর এখান থেকেই ফরাসি বিপ্লবের সূচনা।

সত্যি বলতে, সাধারণ মানুষ আজ গণমাধ্যমের ওপর আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে একতাবদ্ধ হতে পারছি না, যা আমাদের জাতীয় চেতনাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। যে যার মতো নিজের সাফাই গেয়ে যাচ্ছে এবং অন্যের জয়কে নিজের জয় বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রটোকলের দিকে লক্ষ করুন–

> 'আধুনিক সরকার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হচ্ছে গণমাধ্যম, যা দ্বারা ইচ্ছামতো জনমত তৈরি করা সম্ভব। গণমাধ্যমের লক্ষ্য হওয়া উচিত জনসাধারণের দৈনন্দিন খবরাখবর উপস্থাপন, সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা এবং এর সম্ভাব্য সমাধান জাতির সামনে তুলে ধরা। কিন্তু আমরা কোনো রাষ্ট্রকেই নিজেদের ইচ্ছামতো গণমাধ্যম ব্যবহার করার সুযোগ দেবো না। কারণ, ইতোমধ্যেই গণমাধ্যমের লাগাম আমাদের হাতে চলে এসেছে। তবে এ জন্য আমাদের অনেক অশ্রু ও রক্ত ঝরাতে হয়েছে।'

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি যে আন্দোলনের কথাই বলি না কেন, সব আন্দোলন ইহুদিরাই শুরু করেছে। আর এ আন্দোলনের বীজ মানুষের মগজে গেঁথে দিতে দিতে তারা গণমাধ্যমকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এসব আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতারই পরিবর্তন এনেছে, জনজীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সম-অধিকারের ধারাগুলো মূলত কোনো অধিকারের মধ্যেই পড়ে না। এসব তথাকথিত জন-অধিকার শুধু মানুষের কল্পনাতেই থাকে, কখনো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। খাবার টেবিলে যে সামান্য কিছু রুটির টুকরো উচ্ছিষ্ট থেকে যায়, তা-ই প্রলেতারিয়েটদের অর্জন। কিন্তু কেবল উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই তাদের সব ভোট কিনে নেব। প্রজা নির্যাতন ও সামরিক অবরোধ দিয়ে তারা আর কতদিন জনমানুষকে আটকে রাখবে? আমরা চাইলে তাদের মাঝে আন্দোলনের জোয়ার বইয়ে দিতে পারি।'

ষষ্ঠ প্রটোকলের একটি অনুচ্ছেদ আবারও উপস্থাপন করছি–

'আমরা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে জড়িয়ে দেবো। একই সঙ্গে বাজারে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দেবো। আমরা বলব– কৃষি উৎপাদন কম হওয়ায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকদের মাঝে সুকৌশলে অরাজকতা ছড়িয়ে দেবো এবং আত্মতৃপ্তির উপায় হিসেবে মদপানে আসক্ত করে রাখব। এভাবে তারা ধীরে ধীরে জ্ঞানশূন্য জাতিতে পরিণত হবে।'

এরপর উল্লেখ আছে–

'এমতাবস্থায় রক্ষাকর্তা হিসেবে আমরা তাদের সামনে হাজির হব। সামাজিক অচলাবস্থা পরিবর্তনের লোভ দেখিয়ে তাদের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ (কমিউনিজম) ইত্যাদি আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানাব। আর এই আহ্বান তাদের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে দেবে।

আমরা এমন আরও অনেক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছি, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুশাসন হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে।'

একটি দেশের প্রশাসনকে কীভাবে ভেঙে দেওয়া যায়, তা নিয়ে তৃতীয় প্রটোকলে আলোচনা করা হয়েছে–

'আমাদের সাহসী সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিকে নিয়ে প্রতিনিয়ত আক্রমণাত্মক কলাম লিখবে, যা জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। একসময় তাদের এই সামষ্টিক প্রতিক্রিয়া গণ-আন্দোলনে রূপ নেবে, যা সরকারের পতন ঘটিয়ে ছাড়বে।'

বিশ্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নে গণমাধ্যম কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তা নিয়ে সপ্তম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'আমরা জ্যান্টাইল সরকারদের উসকে দেবো, যেন তারা প্রতিবাদী জনগণের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ আমাদের কিছু প্রতিষ্ঠান সরকারের পক্ষে কাজ করবে। এর ফলে সরকার ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক দা-কুমড়ায় রূপ নেবে; এটা আমাদের জন্য খুব দরকারি।'

ইহুদিরা এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে- যেখানে তাদের নিযুক্ত কর্মীরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার অভিনয় করে থাকে। সাধারণ মানুষ ভাবে- হয়তো তারাই প্রকৃত সাংবাদিক এবং তাদের পক্ষেই কাজ করছে, কিন্তু এটা হলো গোপন ফাঁদ। যদি কখনো সাধারণ মানুষ তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে যায়, তবে আর রক্ষা নেই। কারণ, তথ্য-জ্ঞানসম্পূর্ণ এই লোকেদের পরিচয় সাথে সাথেই আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার হাতে চলে যাবে। ফলে গুম বা হত্যাকাণ্ডের মতো যেকোনো একটি করুণ পরিণতি তার কপালে লেখা হয়ে যাবে। তাই বলে তারা যে সাধারণ মানুষের কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করে না তা নয়। তবে কী প্রকাশ করবে তা ইহুদিদের সাংগঠনিক স্বার্থের ওপর নির্ভর করে। গণমাধ্যম নিয়ে তাদের কিছু কৌশল নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ক. সাধারণত বড়ো আকারের প্রবন্ধগুলো মানুষ এড়িয়ে যায়। মানুষ ছোটো আকারের প্রবন্ধগুলো পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই পৃষ্ঠা বাড়িয়ে কেউ যেন তা সাহিত্য-কর্ম বানিয়ে না ফেলে, এটাই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চাওয়া। আবার বড়ো আকারের আর্টিক্যালগুলোতে উৎপাদন খরচ বেশি হয় বলে অধিকাংশ পাঠক তা কিনতে চায় না। স্বাভাবিকভাবে এই লেখাগুলো কম পঠিত হয়। তাই প্রকাশনী শিল্পে তারা নতুন আইন জারি করে- '৩০ পৃষ্ঠার কম প্রতিটি আর্টিক্যালের জন্য দ্বিগুণ খরচ প্রদান করতে হবে।'

   কিন্তু নিজেদের বেলায় কম মূল্যে আর্টিক্যাল প্রকাশ করব, যেন তা সর্বত্র অধিক পঠিত হয়। প্রয়োজনে আমরা ভুর্তুকি দিতেও রাজি। ফলে পেশাদারি সুবিধার লক্ষ্যে অনেক জ্যান্টাইল লেখক আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করতে আসবে। তাদের মধ্যে অনেকে থাকবে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লিখতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের অর্থের কাছে তাদের এই দম্ভ হারিয়ে যাবে।

খ. সাংবাদিকতা শিল্পে ইহুদিদের তিনটি স্তর রয়েছে। পুরো পৃথিবী আজ এই কৌশলে ছেয়ে গেছে, কিন্তু কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হওয়ার দরুন আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না।

প্রথম স্তরে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান থাকবে, যারা সতর্কতার সাথে কেবল আমাদের (জায়োনিস্ট) পক্ষেই কথা বলবে। জাতীয় স্বার্থে আঘাত পায় তারা এমন কোনো সংবাদ প্রকাশ করবে না; বরং বাজারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো পালটা জবাব দিয়ে তাদের থামিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় স্তরেরগুলো হবে আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো। তারা আমাদের এবং সাধারণ জনগণ উভয়ের পক্ষেরই কাজ করবে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হবে নিরপেক্ষ শ্রেণির পাঠকদের আকৃষ্ট করা।

তৃতীয় স্তরে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো স্পষ্টত আমাদের বিরোধিতা করবে। সমাজের যেসব মানুষ আমাদের বিপক্ষে কথা বলতে চায় এবং শত্রু বলে মনে করে, তারা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজদের দলভুক্ত বলে মনে করবে। কিন্তু এগুলোও যে আমাদেরই প্রতিষ্ঠান, তা তারা বুঝতেও পারবে না।

যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সেগুলো আমাদের অর্থ দিয়েই পরিচালিত হবে। তবে তারা শুধু সেসব বিষয়ে কথা বলবে, যা আমাদের সংশোধন করা প্রয়োজন।

আমাদের পত্রিকাগুলো বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে কথা বলবে। যেমন : শাসনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদ। বোকা জ্যান্টাইলরা এসব মতবাদকে আদর্শ ভেবে বুলি আওড়াবে। আসলে তারা সেভাবেই চিন্তা করবে, যেভাবে আমরা চাইব।

তৃতীয় স্তরে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের নানা বিষয় নিয়ে বিতর্কের জন্ম দেবে, তবে তারা কখনো আলোচনা গভীর পর্যন্ত নিয়ে যাবে না। ফলে সাধারণ জনগণ কখনোই বিতর্কের মূল শিকড় খুঁজে পাবে না। পরে আমাদের প্রথম স্তরে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ণ বিবরণসহ সামনে হাজির হবে এবং উক্ত বিতর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করবে। অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথম স্তরে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর রাস্তা সহজ করে দেবে।

এসব তথাকথিত বিতর্ক জনসাধারণকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী করে তুলবে। আর আমরাও তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেবো, কিন্তু আমাদের নির্দেশনা ভঙ্গ করে তারা কখনো কিছু প্রকাশ করতে পারবে না।

আবার কখনো যদি প্রয়োজন হয়, তবে তৃতীয় স্তরের গণমাধ্যম আমাদের বিরুদ্ধে যে বিতর্কের জন্ম দেবে, তা খণ্ডাতে দ্বিতীয় স্তরের গণমাধ্যম সামনে এগিয়ে আসবে।

> 'আমাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার দরুন জ্যান্টাইলরা আর নিজেদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রয়োজন বোধ করবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ করার মতো কোনো অস্ত্রই তাদের থাকবে না। ফলে কোনো রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আমরা তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করব।'

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আজ গণমাধ্যমের কোনো সংবাদ বিশ্বাস করতে চাইলে প্রথমে দেখতে হবে উক্ত সংবাদটি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর দেখতে হবে প্রতিষ্ঠানটির মালিক কে, তার আইনজীবী কে, কাদের সঙ্গে তার আঁতাত রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সম্পাদক কে, সমাজের সঙ্গে তার কেমন যোগাযোগ, কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো এ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের নিয়মিত উঠাবসা রয়েছে।

Jewish Encyclopedia পড়লে আপনি এমন অনেক পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের নাম জানতে পারবেন, যেগুলো ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরপরই বন্ধ হয়ে গেছে। মূলত তাদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে সত্যের মতো আর কোনো বিষ নেই, যা এই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীটি এত ভয় পায়। তাদের গোপন পরিকল্পনার সামান্য কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়ার অর্থই হলো– তাদের জন্য মারাত্মক হুমকি।

Baron Moses Montefiore ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ইহুদি ব্যাংকার। পোলান্ডের বিখ্যাত শহর ক্রাকউতে থাকাকালে তিনি নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের উল্লেখ করে বলেন–

> 'তোমরা কী সব ফালতু বিষয় নিয়ে কথা বলছ? যতদিন না গণমাধ্যমের পুরো নিয়ন্ত্রণ আমাদের দখলে আসবে, ততদিন পর্যন্ত যাই করি না কেন, সব ব্যর্থতায় রূপ নেবে। তাই আমাদের উচিত বিশ্ব গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যেন সাধারণ মানুষকে অন্ধ ও বোকা বানানো সম্ভব হয়।'

যে যুগে সাংবাদিকতাশিল্পে স্বাধীনতা ছিল

২৫ জুন, ১৯২১, নিউইয়র্কের *Independent* পত্রিকা প্রতিষ্ঠান হতে 'New York and the Real Jew' শিরোনামে একটি কলাম প্রকাশ করা হয়। উক্ত কলামের লেখক ছিলেন Rollin Lynde Hartt। কলামটির ছোট্ট একটি অংশ এখানে তুলে ধরা হলো–

> 'ইহুদিরা হলো আমেরিকার প্রথম শ্রেণির প্রাণীবিশেষ। তাদের নিয়ে কেউ কিছু লিখতে যেয়ো না। তুমি হয়তো সত্য উপস্থাপন করতে চাইছ, কিন্তু সেই লেখা যদি অনিচ্ছাবশত তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়, তবে তোমাকে নিয়ে চারদিকে সমালোচনার এমন ঝড় শুরু হবে, যা কখনো বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই তাদের প্রসঙ্গে সবার নীরব থাকাই উচিত।'

ধরুন, কোনো টুপি কোম্পানি তাদের নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা করল। এবার সেই প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে তারা চারদিকে প্রচার শুরু করবে যে, বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীদের চামড়া দিয়ে টুপি তৈরি করার কারণে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী হয়তো তার অনেক সন্তানকে হারাতে বসেছে। নিছক সৌখিনতার বশে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত বন্য প্রাণী হত্যা করছে, তাদের অবশ্যই সামাজিকভাবে বর্জন করা উচিত। তাদের জন্য প্রকৃতি ভারসাম্য হারাতে বসেছে।

এরপর টুপি কোম্পানিটির ইতিহাস এবং কীভাবে বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া দিয়ে টুপি তৈরি করছে, সেই গল্প খুব করুণ উপায়ে উপস্থাপন করবে, যেন সাধারণ মানুষ অবচেতন মনে তাদের বর্জন করতে বাধ্য হয়। তাদের এ জাতীয় আক্রমণের স্বীকার হয়েছে– এমন কয়েকটির প্রতিষ্ঠানের নাম হলো : Herald Newspaper, A. T. Stewart Company, Grand Union Hotel at Saratoga, G.P. Putnam's Sons ইত্যাদি।

New York Herald দীর্ঘ নব্বই বছর সংবাদিকতা শিল্পে রাজত্ব করেছে। বহু চেষ্টা করেও প্রতিষ্ঠানটির মালিক James Gordon Bennett-কে তারা কাবু করতে পারেনি। এমন সাম্রাজ্যবাদী সমাজেও যে একটি প্রতিষ্ঠান এত দীর্ঘ সময় ধরে স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশ করেছে, এটা চাট্টিখানি কথা নয়।

যেকোনো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট তারা ছিল বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্তে ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে তারা শাখা অফিস গড়ে তুলেছিল। ১৮৮০ সালের আগ পর্যন্ত ইহুদিরা মিডিয়া জগতে আজকের মতো দাপুটে অবস্থানে ছিল না। যখন তাদের কোনো স্ক্যান্ডাল নিয়ে চারদিকে গুঞ্জন শুরু হতো, তখন তারা দলবেঁধে বিভিন্ন পত্রিকা প্রতিষ্ঠানে হাজির হতো, যেন তাদের এই বিষয়গুলো প্রকাশ করা না হয়। অর্থের জোরে হোক আর অন্য উপায়ে হোক, পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা নিজেদের করে নিত। তারা একসময় বুঝল– এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পিছে দৌড়ে লাভ হবে না, যতদিন না নিজেরা এই শিল্পে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে পারছে।

তাদের কিছু ব্যাংকার Bennett সাহেবকে অনুরোধ করল, যেন প্রতিষ্ঠানটির অর্থ বিভাগের দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে সময় তাদের ব্যাংকারগণ মেক্সিকো সরকারকে বড়ো অঙ্কের বেশ কয়েকটি ঋণ দিয়েছিল, যার দ্বারা সেখানে প্রচুর শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো খুব গোপনে তাদেরই সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো, যা তখন পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। একসময় এ সবগুলো প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, যেন পুরো মেক্সিকো দেশটাই দেউলিয়া হয়ে গেছে। তারা চায়নি এই গোপন ষড়যন্ত্রের খবর প্রচারিত হোক, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তারা Herald-এর একজন কর্মীকেও কাবু করতে পারেনি। যথা সময়ে এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু বিষয় আছে, যা পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো কখনো প্রকাশ করে না। কারণ, এতে তারা নিজেরাই বিপদে পড়বে। সংবাদপত্র ক্রয় করতে আমরা যে টাকা দিই, তাতে কেবল কাগজের মূল্যই ওঠে। কলম, কালি, ছাপাখানা, বিদ্যুৎ খরচ এবং কর্মীদের মজুরি কোথা থেকে জোগাড় করে? তা ছাড়া এত এত জায়গা ঘুরে তাদের সাংবাদিকরা যে খবর জোগাড় করে, সেই খরচই-বা আসে কোত্থেকে? এখানেই তাদের দুর্বলতা। এতসব খরচ কাটিয়ে মুনাফা আসে বিজ্ঞাপনের হাত ধরে। আজ ইউরোপ-আমেরিকার সব বড়ো বড়ো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান তাদের দখলে। তাহলে বুঝতেই পারছেন, পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপনের উৎস তারাই? যত যাই হোক, পত্রিকাগুলোও তো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান। যে সংবাদ প্রকাশে আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তা তারা কখনোই প্রচার করবে না।

১৮৮০-এর দশকে ইহুদিরা নিজেদের মধ্য থেকে নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। সকল পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের কাছে গোপন চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়, তারা যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তাদের প্রার্থীদের প্রচারণার কাজে অংশ নেয়। এত বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব পেয়ে সবাই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। Bennett সাহেব তখন দেশের বাহিরে ছিলেন। *Herald*-এর একজন কর্মী টেলিগ্রামযোগে তাকে চিঠিটি পাঠায়। তিনি বলেন– 'পুরো চিঠি আগামীকালের পত্রিকায় ছাপিয়ে দাও।'

তিনি এও পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে বলেন– 'আমাদের উদ্দেশ্য সমাজের সেবা করা, কোনো রাজনীতিবিদের তোষামোদ করা নয়।' তার একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি ধর্ম পরিচয় উল্লেখ করে কোনো সংবাদ প্রকাশ করতেন না। কেবল কূটকর্মে জড়িত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতেন।

সকালের প্রথম ঘণ্টায় পত্রিকা হাতে পেয়ে শুধু ইহুদিরাই নয়; জ্যান্টাইলরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষ এমন দুঃসাহসিক কাজের অভিবাদন জানাতে ভুল করে না। অন্যদিকে, ইহুদিরা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে শুরু করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এই পত্রিকায় আর কখনো কোনো বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে না। এতে তাদের বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ৬ লাখ ডলার। এমতাবস্থায় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আদৌ বেঁচে থাকতে পারত কি না সন্দেহ। সবাই ভেবেছিল, তিনি হয়তো এখানেই থেমে যাবেন। কিন্তু তিনি যে আরও বড়ো যুদ্ধে নামবেন, তা কেউ-ই অনুমান করতে পারেনি। সেকালে এটি ছিল নিউইয়র্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা প্রতিষ্ঠান। শহরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই পত্রিকা পড়ত। পুরো ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশগুলোকে হিসাব করলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে।

তার পত্রিকায় জ্যান্টাইলদের বিজ্ঞাপনও কম প্রকাশিত হতো না, তবে ইহুদিদের বিজ্ঞাপনগুলো পত্রিকার আকর্ষণীয় পৃষ্ঠাগুলোতে বড়ো আকারে ছাপানো হতো। কারণ, তারা খরচ বেশি দিত। অন্যদিকে জ্যান্টাইলদের বিজ্ঞাপনগুলো ছোটো করে পৃষ্ঠার বিভিন্ন কোনায় ছাপানো হতো। তিনি নতুন এক ফন্দি করলেন। যারা এতদিন আর্থিক সীমাবদ্ধতার দরুন পত্রিকায় বড়ো করে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারত না, তাদের সবাইকে ডিসকাউন্ট মূল্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সে সময় সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট এমন একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। এমন অফার পেয়ে সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অবস্থা এমন দাঁড়াল– কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠান আগের মতো লাভ না করলেও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেল; বরং তার জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

জ্যান্টাইল সমাজে এই পত্রিকার চাহিদা আরও বাড়তে শুরু করল। অপর দিকে বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন ইহুদিদের পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণও কমে যেতে শুরু করল। এমন নয় যে, শহরে আর কোনো পত্রিকা প্রতিষ্ঠান ছিল না, কিন্তু *Herald*-এর মান ছিল অন্য পর্যায়ের।

একসময় তারা পুনরায় এই প্রতিষ্ঠানটির নিকট ফিরে আসতে বাধ্য হলো। Bennett সাহেব কোনো প্রতিশোধ নিলেন না। তবে বললেন– 'পত্রিকার বিভিন্ন কলাম-স্থান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যদের নিকট বিক্রি হয়ে গেছে। চুক্তির সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিজ্ঞাপন সরিয়ে দেওয়া যাবে না।' এরপর পরিস্থিতি আরও নাটকীয় হয়ে উঠল। তিনি যে সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নন তা আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে

এই অভিযোগ ছুড়ে মারল। তারা পত্র মারফত জিজ্ঞেস করল– 'কী পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি বিজ্ঞাপন প্রচারস্বত্ব জ্যান্টাইলদের নিকট বিক্রি করেছেন।' তিনি এবারও পুরো চিঠি পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। সেদিন যতজন পত্রিকাটি পড়েছে, তাদের কেউ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। যুদ্ধে আবারও জিতলেও Bennett সাহেবকে এবার চরম মূল্য দিতে হলো। হতাশা ও অপমানে ইহুদিরা পুনরায় তাদের বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিল; যেমনটা করেছিল ১৮৮৭ সালে প্রথমবারের মতো। পত্রিকা জগতে এবার তারা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করে। তারা বুঝতে পারে, তথ্যজগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে হাজার পরিকল্পনা করেও কোনো লাভ হবে না।

ক্ষমতার দাপট দিয়ে হোক আর অর্থের লোভ দেখিয়ে হোক, ধীরে ধীরে তারা সকল পত্রিকা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের করে নিতে শুরু করে। Bennett সাহেবও বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার মৃত্যুর পর ইহুদিরা এই প্রতিষ্ঠান কিনে নিতে চাইবে। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইল করে যান– একক কোনো উত্তরসূরির নিকট এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কখনো অর্পিত হবে না। যারা এতদিন পর্যন্ত *Herald*-এর জন্য কাজ করেছে, তাদের সকলের মাঝে এর সম্পদ ও মুনাফা সমানভাবে বণ্টিত হবে। ১৯১৮ সালের মে মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

দিনটির জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল। ইতঃপূর্বে তারা কেবল বিজ্ঞাপনই বন্ধ করেনি; বরং প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় কমিয়ে দিতে এমন কিছু নেই যা করেনি। একসময় যে প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে একজন দক্ষ লোকের হাতে পরিচালিত হতো, মৃত্যুর পর তা একাধিক ব্যক্তির হাতে চলে যায়। ফলে ব্যবস্থাপনা নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। এমন নয় যে তাদের কেউ এই শিল্পে দক্ষ ছিল না, কিন্তু পেছন থেকে একটি গোষ্ঠী বারবার তাদের ব্যবসায়িক পথ আটকে দাঁড়াচ্ছিল। এই বাধা তারা সহজভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি। তা ছাড়া অহংকার আর বড়াই নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলও ছিল।

ইহুদিরা ভেবেছিল, যখন প্রতিষ্ঠানটি একেবারে মুনাফাশূন্য হয়ে পড়বে এবং পরিচালনা পর্ষদ অভ্যন্তরীণ সমস্যায় হ-য-ব-র-ল হয়ে পড়বে, তখন হয়তো ট্রাস্টি বোর্ড এটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবে; হলোও তাই, কিন্তু ইহুদিদের চেয়ে অধিক মূল্যের প্রস্তাব দিয়ে Frank A. Munsey পত্রিকাটি কিনে নেয়। পুরোনো নাম মুছে নতুন নাম দেওয়া হয় *New York Sun*। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডারগণ সম্পদ ভাগাভাগি করে বিভিন্ন দেশে চলে যায়। আর এভাবেই আমেরিকায় স্বাধীন সাংবাদিকতা শিল্পের ইতি ঘটে।

বলশেভিক বিপ্লব এবং ইহুদি ষড়যন্ত্র

বলশেভিক বিপ্লবের ভয়াবহ ইতিহাস অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। গুম, হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ ও দুর্ভিক্ষে পুরো রাশিয়া ছেয়ে গিয়েছিল। এই বিপ্লব নিয়ে ইহুদিরা যখন কাপুরুষের মতো দুমুখো নীতি অনুসরণ করে, তখন অবাক না হয়ে পারা যায় না। এই বিপ্লব যে তারাই ঘটিয়েছে, তা তাদের গণমাধ্যম বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। অথচ নিজেদের মাঝে-ই আবার গর্ব করে বলে–

'আমরা বলশেভিক করেছি এবং আমরাই সোভিয়েতের জন্ম দিয়েছি।'

এই বিপ্লব যে ইহুদিদের দ্বারা সংগঠিত হয়নি, তা প্রমাণ করতে তাদের গণমাধ্যম হাস্যকরভাবে দুটো খড়কুটোকে সামনে আনে। তারা বলে– 'যে মহান দুই নেতার হাত ধরে (লেনিন ও ক্রান্সস্কি) এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে, তাদের কেউ-ই তো ইহুদি নয়।' এটাও হাস্যকর যে তারা বাছাই করে মাত্র দুজন ব্যক্তির নাম প্রচার করে।' কিন্তু পুরো আন্দোলনে যে ইহুদিদের অসংখ্য সদস্য জড়িত ছিল, তাদের নাম কখনো প্রকাশ করা হয় না।

বিপ্লবের সূত্রপাত মূলত ক্রান্সস্কির হাত ধরে। তার বাবার নাম Adler। ধর্ম পরিচয়ে তার বাবা-মা উভয়-ই ছিলেন ইহুদি। বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা রাশিয়ান এক নাগরিককে বিয়ে করেন, যার নাম ছিল Kerensky। আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলেও খুব দ্রুতই তিনি রাজনীতির মাঠে জড়িয়ে পড়েন।

তবে এই বিপ্লব পরিকল্পনার মূল কারিগর ছিলেন লেনিন, যাকে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে জ্যান্টাইল বলে প্রচার করা হয়। আর ট্রটস্কিকে নিয়ে তো কোনো আলোচনাই করা হয় না। তার আসল নাম Braunstein। শুরুর দিকে তিনি মেইনশেভিকের গোড়া সমর্থক হলেও শেষের দিকে বোলশেভিকে যোগদান করেন। গণমাধ্যমে বলা হয়, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব একটা ধার্মিক ছিলেন না, তাই তার নামের সাথে ইহুদি শব্দটি জড়ানো উচিত নয়।

তাই যদি হয়, তাহলে বিপ্লবের নামে রাশিয়ার গির্জাগুলোকে কেন কসাইখানা করা হলো? অনেকগুলোকে তো ঘোড়ার আস্তাবলে রূপান্তর করা হয়েছিল! কেন সেখানে প্রার্থনার পরিবর্তে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়েছে? কেন খ্রিষ্টান পাদরিদের দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার ও মেরামতের কাজ করানো হয়েছে? কেন তাদের রাবাইগণ খ্রিষ্টান ছাত্রদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার নামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে?

তিনি কতটা ধার্মিক, তা এখানে মুখ্য বিষয় নয়। কারণ, ছেলেবেলায় তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা-ই তার কাজে প্রকাশ পেয়েছে। খুব ধার্মিক হলেই যে একজন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক হবে, তা নয়। আবার ন্যূনতম ধর্ম জ্ঞান না রেখেও একজন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক হতে পারে।

১৯১৭ সালের শুরু থেকে জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের আন্দোলন ঘনীভূত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়, আহত ও নিহত সৈন্যদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি, চলমান খাদ্য সংকট, স্বল্প মজুরি, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য ইত্যাদি নানা কারণে এই আন্দোলনটির সূত্রপাত হয়।

রাজা নিকোলাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এই জনগোষ্ঠীটি আমাদের নিকট প্রলেতারিয়েট নামে পরিচিত। তারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে শুরু করলে নিকোলাস সামরিক বাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। কিছু অফিসার গুলি চালালেও অধিকাংশ অফিসার তা থেকে বিরত থাকে। ফলে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর প্রাণনাশের মধ্য দিয়ে পুরো আন্দোলন সফল হয়। এরপর রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে সামরিক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এর সমাপ্তি ঘটে রাজা নিকোলাস এবং তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

এরপর ক্ষমতায় আসে পেট্রোগার্ড সোভিয়েত ও দ্যা প্রোভিশনাল গভর্নমেন্ট। কিন্তু দ্রুতই দ্যা প্রোভিশনাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আবারও আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। কারণ, তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে সেই যুদ্ধে রাশিয়ার লাখো সৈন্য মারা যায়; যাদের অধিকাংশ ছিল গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ। তা ছাড়া যুদ্ধে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণও তাদের ছিল না। এমনই এক মুহূর্তে ভ্লাদিমির লেনিন এবং তার অনুসারীগণ কম্যুনিস্ট পার্টি অব রাশিয়া প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তী সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়নে নামান্তরিত হয়। খাদ্য, শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তাকে পুঁজি করে দলটি আন্দোলন জোরদার করতে শুরু করে। অক্টোবর মাস থেকে পুনরায় রাশিয়াজুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, যার শেষ হয় প্রোভিশনাল গভর্নমেন্টের পতনের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতায় এসে লেনিন জার্মানির সাথে শান্তিচুক্তি করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার বিদায় নিশ্চিত করে, কিন্তু ১৯১৮ সালে লেনিন পরিচালিত সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া শুরু করে। এর মোকাবিলায় লেনিন-ট্রটস্কিরা প্রতিষ্ঠা করে রেড আর্মি।

নিকোলাসের সৈন্যবাহিনী কেন প্রলেতারিয়েটদের ওপর গুলি চালায়নি? কেন তারা এত সহজে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে দিলো? সত্যি বলতে, রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ততদিনে ইহুদিদের দখলে চলে গিয়েছিল। তারা চেয়েছিল এই আন্দোলনে প্রলেতারিয়েটরা সফল হোক। কারণ, এদের তো তারাই জন্ম দিয়েছে। শুধু সেনাবাহিনী নয়, রাশিয়ার সব উচ্চপদস্থ মন্ত্রণালয় তখন তাদের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো। নিচে একটি ছোট্টো পরিসংখ্যান দেওয়া হলো :

মন্ত্রণালয়ের নাম	আসন সংখ্যা	ইহুদি সদস্য সংখ্যা	ইহুদিদের শতকরা হার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২২	১৭	৭৭.২০%
সামরিক মন্ত্রণালয়	৪৩	৩৩	৭৬.৭%
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৬	১৩	৮১.২%
অর্থ মন্ত্রণালয়	৩০	২৪	৮০.০%
বিচার মন্ত্রণালয়	২১	২০	৯৫.২%
জন-যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৫৩	৪২	৭৯.২%
সমাজ-যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৬	৬	১০০.০%
শ্রম মন্ত্রণালয়	৮	৭	৮৭.৫%
বার্লিন, ভিয়েনা, কোপেনহেগেন ও বোচারেস্টে বলশেভিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন	৮	৮	১০০.০%
রাজ্য ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	২৩	২১	৯১.৩%
সাংবাদিকতা মন্ত্রণালয়	৪১	৪১	১০০.০%

মনে আছে, সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে Baron Montefiore কি বলেছিলেন?

'সব কাজই ব্যর্থ হবে, যদি না গণমাধ্যম আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।'

এবার ওপরে দেখুন। সাংবাদিকতা মন্ত্রণালয় পুরোটা তাদের নিয়ন্ত্রণে। শুধু তাই নয়, ছকটিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে– এমন কোনো মন্ত্রণালয় নেই, যেখানে ইহুদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আসনে নেই। 'প্রলেতারিয়েটদের ক্ষমতা অর্জন' বিষয়টি শুধু মুখেই রয়ে গেল। তারা শোষণ-বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসার যে স্বপ্ন নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল, তা অন্ধকারে চলে গেল। অবস্থা পূর্বের মতোই রয়ে গেল।

যে কিছু পদ জ্যান্টাইলদের হাতে ছিল, তাদের ইহুদি বলে ডাকতে কোনো সমস্যা নেই! কারণ, তারা লেনিনের গোলাম হয়েই পদগুলোতে বসেছিল। তারা সবাই ইডিশ ভাষা জানে।

তাদের সন্তানেরাও হিব্রু বিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখা করত। ইডিশ মূলত জর্মান থেকে জন্ম নেওয়া নতুন এক ভাষা। তবে তাদের হাজার বছরের পুরোনো পরিকল্পনাগুলো হিব্রু ভাষায় রচিত। ইহুদিদের সব গোপন তথ্যের আদান-প্রদান এই ভাষাতেই হয়। তাই এই ভাষা জানা ইহুদিদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়– রাশিয়ার জ্যান্টাইল সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে? জবাবে তারা বলে–

> 'আমরা তাদের যৌন শিক্ষা দেবো। যৌনতা সম্পর্কে সকল সংকোচ দূর করে এর প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলব।'

তাদের যৌন শিক্ষার ধরন কতটা নোংরা, তা এখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সোভিয়েত সরকার হাঙ্গেরি দখলের পর সেখানে তুমুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হাজারো ইহুদিকে হত্যা করা হয়। রক্তাক্ত এ ঘটনাটি ইহুদিদের কাছে 'White Terror' নামে পরিচিত।

মূলত এই ঘটনা ছিল ইহুদি নেতা Bela Kun-এর বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির সাধারণ জনগণের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। কারণ, সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যৌনতার নোংরা বিষয়গুলো প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকে যৌনতা সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা জ্যান্টাইল সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা অভিভাবকগণ মেনে নিতে পারেনি।

রাশিয়া-হাঙ্গেরির মতো বিশ্ব শিক্ষাব্যবস্থাতেও অপ্রয়োজনীয় ও অনৈতিক অনেক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যদিও তা নিয়ে আজ আর কোনো প্রতিবাদ করা হয় না। ১৯০২ সালে John D. Rockefeller এবং Frederick Taylor Gates-এর যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে 'General Education Board', যা বিশ্বব্যাপী বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সূতিকাগার। পরে বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় তা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে, খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ কখনো ইহুদির হাতে রক্ষা পেতে পারে না। আজকের তরুণ সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয়ের বড়ো কারণ ইহুদিদের ষড়যন্ত্রমূলক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। তাদের গণমাধ্যমে বলা হয়–

> 'আমরা আজ পর্যন্ত যতসব নিপীড়ন সহ্য করেছি, তার প্রতিশোধ হিসেবে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করেছি।'

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাদের প্রটোকলে উল্লেখিত কয়েকটি ধারা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

> 'খোদা-ভীতি ও সৃষ্টিকর্তাকেন্দ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস মুছে দিতে আমরা জ্যান্টাইলদের হৃদয়ে গণিত ও যুক্তিবিদ্যার ধারণা ঢুকিয়ে দেবো। তাদের আকৃষ্ট করে তুলব বস্তুবাদী পৃথিবীর প্রতি।

নাস্তিক জাতিতে পরিণত হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট কোনো শাসনব্যবস্থায় তাদের আর বিশ্বাস থাকবে না। রাষ্ট্রীয় শাসন হয়ে যাবে জনগণের সম্পত্তি, যা থেকে আমরা ফায়দা লুটে নেব।'-৫ম প্রটোকল

'বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার অধিপতি হওয়ার পর আমরা নিজেদের ধর্ম প্রচার শুরু করব। তার মূল বিষয় হবে– ঈশ্বর এক, আমরাই তাঁর একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায় এবং পুরো বিশ্বের ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের সাথে জড়িত। ফলে ইহুদি ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর সব ধর্ম ধ্বংস হবে এবং সবাই আমাদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর মধ্যে যদি কোনো গোঁড়া নাস্তিকের জন্ম হয়, তবে সে আমাদের জন্য হুমকির কারণ হবে না।' -১৪তম প্রটোকল

বলশেভিক নেতা ট্রটস্কি তো নিজেকে নাস্তিক বলেই দাবি করেছিল! রাশিয়ার জনগণ যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করছিল, তখন হিংস্র সৈনিকরা তাদের চেচিয়ে বলত– 'খোদা বলতে কিছু নেই, আমরা তার মৃত্যু ঘটিয়েছি।' ফিলাডেলফিয়ার একজন মুখপাত্র Miss Katherine Dokoochief এই বিপ্লব প্রসঙ্গে তার পত্রিকায় লিখেন–

'বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদিরা রাশিয়ার গির্জাগুলো যেভাবে ধ্বংস করেছে, সে তুলনায় ইহুদিদের সিনাগাগগুলোর ন্যূনতম ক্ষতিও করেনি।'

জন্ম থেকেই মানুষ কারও না কারও ওপর নির্ভরশীল। তার শেষ আশ্রয় হলো ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তা, যা অবচেতন মনে মানুষের চিন্তা-চেতনায় জায়গা করে নেয়। মানুষের ধর্মীয় চেতনা যখন লোপ পায়, তখন তার আশ্রয় বলতে আর কিছুই থাকে না। সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। আর এ কারণেই বর্তমান পৃথিবী এমন এক বলয়ে রূপ নিয়েছে, যেখানে পারস্পরিক শান্তি ও ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই। সব যেন ভোগ আর ধ্বংসের রাজত্ব। কারণ, তারা বিশ্বাস করে– অপরাধ বলতে পৃথিবিতে কোনো কিছু নেই। কে তার বিচার করবে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী শান্তি আলোচনা লক্ষ করলে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা যে যার মতো করে শান্তিচুক্তির ধারা বানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের চেহারা, মন ও কথা বলার ভঙ্গিমায় আত্মবিশ্বাসের কোনো ছাপ নেই। তারা যা বলছে, তার প্রতি অন্য কেউ ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করছে না। তারা জানে না– আদৌ তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত হবে কি না। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো–

'যতদিন না জ্যান্টাইলরা আমাদের অর্থ ও ক্ষমতার মাঝে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নেবে, ততদিন পর্যন্ত ক্ষুধা, দরিদ্রতা, পারস্পরিক শত্রুতা, মতবিরোধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে তাদের আবদ্ধ করে রাখব।' –১০ম প্রটোকল

'একসময় তারা বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার মূল চাবি আমাদের হাতে তুলে দেবে। আর এ সুযোগে আমরা নিজেদের বিশ্ব অধিপতি করে তুলব।

আমরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেবো, যা তাদের এতটা দুর্বল করবে যে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে।' –৫ম প্রটোকল

এই বলশেভিক বিপ্লব ইজরাইল প্রতিষ্ঠার পথ অনেক সহজ করে দেয়। এই বিপ্লবের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হলেন Dr. George A. Simons, বিপ্লব চলাকালে যিনি পেট্রোগার্ড গির্জার পাদরি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া ট্রটস্কিকে যখন বিচারের সম্মুখীন করা হয়, সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন–

'Trotsky-Bronstein-এর বিচার অনুষ্ঠানে অনেক বিক্ষোভকারীর সমাগম হয়। তাদের অধিকাংশই ছিল পূর্ব নিউইয়র্কের অধিবাসী। একটি বিষয় আমাকে অবাক করে তা হলো– উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশই ছিল ইডিশভাষী, যাদের বলশেভিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। বিচার অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ অংশ ইডিশ ভাষায় সম্পন্ন হয়।'

Senator Nelson জিজ্ঞেস করলেন– 'সেখানে কি হিব্রুভাষী কেউ ছিল?'

Dr. Simons বললেন– 'সেখানে হিব্রুভাষী এবং ধর্মত্যাগী অনেক ইহুদি ছিল। তাদের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে ইডিশভাষীদের সংখ্যাই বেশি ছিল।'

বলশেভিকরা যখন ক্ষমতায় আসে, তখন পেট্রোগার্ডসহ রাশিয়ার চারদিকে ইডিশ ভাষার প্রভাব বাড়তে শুরু করে; এমনকী রাশিয়ার গির্জাগুলোও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। ইডিশ ভাষার প্রভাব এতটাই বেড়ে যায়, বর্তমানে এটিকে রাশিয়ার জাতীয় ভাষা বললেও ভুল হবে না।

William Chapin Huntington আমেরিকার বাণিজ্যদূত হিসেবে রাশিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। তার প্রশাসনিক দূতাবাস ছিল পেট্রোগার্ডে। তিনি বলেন–

'যেসব নেতা-কর্মীর হাত ধরে বলশেভিক বিপ্লব সফলতা পায়, তাদের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল ইহুদি। তারা রাশিয়ার কোনো জাতীয় উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বজুড়ে নিজেদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ইহুদিদের মুখ্য উদ্দেশ্য।'

William W. Welch বিপ্লব চলাকালে National City Bank-এর কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি নিজের মতামত উল্লেখ করেন–

'এই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী তিন-চতুর্থাংশ নেতা-কর্মী হলেন ইহুদি। তাদের মধ্যে কিছু ছিল যারা প্রকৃত রাশিয়ান। তাদের জন্ম ও বেড়ে উঠা সবই হয়েছে রাশিয়াতে।'

এই বিপ্লব যখন সফলতার মুখ দেখতে শুরু করে, তখন আমেরিকান ইহুদিরা নিউইয়র্কের রাস্তায় আনন্দ মিছিল করতে করতে বেরিয়ে আসে। যেকোনো জনসমাবেশ, সাক্ষাৎকার, সংবাদ ও কলামে এই বিপ্লবের ব্যাপক প্রশংসা শুরু হয়, কিন্তু কিছুদিন পর তারাই আবার এই বিপ্লবকে নিন্দার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। ইহুদিদের প্রতিষ্ঠানগুলো জোরেশোরে প্রচারণা চালায়, এই বিপ্লবের জন্যই নাকি রাশিয়ান ইহুদিদের কপালে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে।

অথচ, পরবর্তী সময় ইহুদিদের সেসব সৈন্যদের আমেরিকার শহরগুলোতে স্বর্ণের সিগারেট বাক্স হাতে ঘুরতে দেখা যেত, যা একসময় সাধারণ রাশিয়ানদের সম্পদ ছিল। তাদের মহিলারা স্বর্ণের অলংকার পরে ঘুরে বেড়াত, যা হয়তো রাশিয়ান কোনো বাবা-মা তার মেয়ের বিয়ের জন্য রেখেছিল।

৩০ জুন, ১৯২০ আমেরিকার ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠান *Jewish World*-এর নবম পৃষ্ঠায় Mrs. Samuel Rush-এর স্বাক্ষরিত একটি কলাম প্রকাশ করা হয়, যার শিরোনাম, 'Are We Really Ashamed of Trotsky?' কলামটির উল্লেখ্যযোগ্য কিছু অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

> 'ইদানীং আমি বেশ কিছু ইহুদি প্রতিষ্ঠানকে এই বলে বিলাপ করতে শুনছি যে, তাদের নাকি মৌলবাদী-সন্ত্রাস বলে বিভিন্ন জায়গায় নিন্দা করা হচ্ছে। এটা সত্য, জন্মসূত্রে আমরা অনেকেই মৌলবাদী প্রকৃতির। এবার নিজ জাতির ওপর মানুষের নিন্দায় কান না দিয়ে বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখুন। ট্রটস্কিকে কেন আমরা এভাবে ভাবছি না যে, তিনি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ! আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র এবং একজন দূরদর্শী নেতা হওয়ার কারলে তিনি অবশ্যই আমাদের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। এখন কি আমাদের তার জন্য লজ্জিত হতে হবে?'

আসলে বলশেভিক বিপ্লব হলো ইজরাইল প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপে ছিল ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ। তবে জেরুজালেমকে পূর্ণ উপায়ে দখল করা এবং সেটিকে নিজেদের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা যে অত সহজ হবে না, তা চোখ বন্ধ করেই বলা যায়। এর মানে হলো– তারা একের পর এক অসংখ্য রক্তক্ষয়ি বিপ্লবের জন্ম দিয়ে যাবে। জ্যান্টাইলরা যদি এ ব্যাপারে সতর্ক হতে না পারে, তবে তাদের সন্তানদের রক্তের বন্যায় সাঁতরে বেড়াতে হবে।

খবরের কাগজে বলশেভিক বিপ্লব

বলশেভিক বিপ্লবের নামে রাশিয়াতে যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বহুকাল কোনো ধারণা ছিল না। আশেপাশের দেশগুলোতে তখন এ নিয়ে সঠিক কোনো সংবাদ প্রচার করা হতো না। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সবাই একটি বিষয় অনুমান করতে পেরেছিল,

সেখানে বড়ো ধরনের কোনো গণ-অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে। কায়েমি-স্বার্থপর-বুর্জোয়া[২৬] সম্রাট নিকোলাস জারের অধীনে সেখানকার ইহুদিরা কীরূপ মানবেতর জীবনযাপন করছে, সে গল্প ইউরোপ-আমেরিকার পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত প্রকাশ করা হতো। তা ছাড়া স্বৈরতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের নিষ্পেষিত জীবন চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হতো। এসব নিয়মিত প্রোপাগান্ডার ফলে একসময় বিশ্ববাসীর মনে জার সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মাতে শুরু করে। তারা সবাই মনে মনে এই বিপ্লবকে সমর্থন জানায়। জনসাধারণের মনে বিশ্বাস চেপে বসে– এই বিপ্লবের মাধ্যমে জার সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে এবং নিপীড়িত মানুষ অধিকার ফিরে পাবে।

একবার এক আমেরিকান অধ্যাপক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রাশিয়া গমন করেন। বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর তিনি ছিলেন একজন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক। অন্যান্যদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, সেখানকার ইহুদি ও শ্রমজীবী মানুষেরা নিপীড়িত জীবনযাপন করছে।

তিন বছর পর অল্প কিছুদিনের বিরতিতে তিনি দেশে আসেন এবং পুনরায় সেখানে গমন করেন। তবে দ্বিতীয়বার দেশে এসে বুঝতে পারেন, রাশিয়ার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে এ দেশের পত্রিকাগুলোতে যা ছাপানো হচ্ছে– তা সবই মিথ্যা। তাই সাধারণ মানুষকে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত। তিনি এ বিষয়ের ওপর একটি আর্টিক্যাল রচনা করেন এবং তা প্রথম শ্রেণির একটি ম্যাগাজিন প্রেরণ করেন। তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে ম্যাগাজিনটির এক উচ্চপদস্থ সম্পাদক তাকে ডেকে পাঠান। তিনি তথ্যের সত্যতা দেখে প্রচণ্ড অবাক হন, কিন্তু তারপরও তিনি এই আর্টিক্যাল ম্যাগাজিনে ছাপানো থেকে বিরত থাকেন।

এরপর আরও কিছু পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠানে এই আর্টিক্যালটি পাঠানো হলেও তা কেউ-ই ছাপাতে রাজি হয়নি। সম্ভবত এ কারণে লেখকের প্রকৃত নাম আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে আমেরিকার তৎকালীন গণমাধ্যম জগতে বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন রটেছিল বলে ঘটনাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

Mr. William Hard-এর হাত ধরে নিউইয়র্কের *Metropolitan* ম্যাগাজিন সর্বপ্রথম বিষয়টির ওপর আর্টিক্যাল প্রকাশ করে, যার শিরোনাম 'The Great Jewish Conspiracy'। এর কিছু চুম্বক অংশ হলো–

> 'ইহুদি বিতর্ক আজ শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ নয়; ওয়াশিংটন-নিউইয়র্কসহ পৃথিবীর আরও অনেক অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়েছে।'

---

[২৬]. বুর্জোয়া– আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়া হলো অর্থশালী শ্রেণিবিশেষ, যারা প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মানুষদের শুষে খাচ্ছে।

'সমাজের সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কেবল তাদের নিয়ে আলোচনার করার সামর্থ্য রাখে।'

'ষড়যন্ত্র যতই গোপনীয় হোক না কেন, তার গোপনীয়তা চিরকাল রক্ষা করা সম্ভব নয়।'

কিছু মানুষ থাকবেই, যারা নিজেদের মস্তিষ্ক খাটিয়ে সব রহস্যের সমাধান করে ছাড়বে। এ জন্য Abraham Lincoln বলেছিলেন–

'তুমি হয়তো কিছু মানুষকে সাময়িক সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে, কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না।'

Mr. Hard আরও উল্লেখ করেন–

'যে দুজন ব্যক্তির হাতে পুরো রাশিয়া জিম্মি হয়ে পড়েছে, তাদের নাম লেনিন ও ট্রটস্কি। তারা বলশেভিক দলের প্রধান দুই হর্তাকর্তা। ১৯১৭ সালে পেট্রোগার্ড সোভিয়েতের[২৭] সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত হয়ে তারা দেশের ক্ষমতায় আসে। বছর না যেতেই তারা আবার নতুন বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম দেয়।'

'বলশেভিকের মতো মেইনশেভিক দলটিও একই গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো, যেমন : Leiber, Dan ও Martov। এই দুটি রাজনৈতিক দলের মাঝে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল 'দ্যা কেডেটস'। তারা ছিল রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বুর্জুয়া দল। পরবর্তী সময়ে এর সদরদপ্তর প্যারিসে স্থানান্তরিত করা হয় এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন Maksim Vinaver। এভাবে রাশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়, যার প্রতিটি-ই ছিল ইহুদিদের তৈরি করা সংগঠন।'

আর্টিক্যালটিতে তিনি এমন অনেক প্রভাশালী ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করেন, যারা সে সময় বিশ্ব রাজনীতির কলকাঠি নাড়ছিল। যেমন : Otto Hermann Kahn। আন্তর্জাতিক জোট ও মৈত্রী সম্পর্ক উন্নয়নের কাজে তাকে প্রায় সময়ই লন্ডন ও প্যারিসে ভ্রমণ করতে দেখা যেত। তিনি ছিলেন জার্মান ধনকুবের এবং ব্রিটিশ-আমেরিকা মৈত্রী সম্পর্কের অন্যতম প্রবক্তা। রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক আলোচনাগুলোতেও তার নিয়মিত উপস্থিতি ছিল। জন্মসূত্রে জার্মান হলেও আমেরিকায় ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এরপর আসে Bela Kun। হাঙ্গেরিতে কীভাবে সোভিয়েত মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে দায়িত্ব পুরোটাই তার কাঁধে ছিল।

---

[২৭]. পেট্রোগার্ড সোভিয়েত– বলশেভিক বিপ্লব শুরু হওয়ার পর নিকোলাস জারের পতন ঘটলে এই দলটি অল্প কিছুদিনের জন্য ক্ষমতায় আসে।

এরপর তিনি উল্লেখ করেন Rose, Pastor, Stokes, এবং Morris Hillquit-এর নাম, সে সময় আন্তর্জাতিক মহলে যারা একটি রক্ষণশীল নেটওয়ার্কের জন্ম দিয়েছিল। তিনি Eugene V. Debs এবং Bill Haywood নামে দুজন জ্যান্টাইল ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করেন, যারা বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে ইহুদিদের এজেন্ট হিসেবে বিশ্বজুড়ে কাজ করত।

১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানি, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা Armistice Day নামে পরিচিত। এর কিছুদিন পরেই The Liberal Middle নামে আরও এক নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যার মূলে ছিল Mr. Justice Brandeis, Judge Mack ও Felix Frankfurter-সহ আরও অনেকে। সে সময় Baron Gunzberg ছিল আমেরিকায় নিযুক্ত রশিয়ান রাষ্ট্রদূত Boris Bakhmetev-এর বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি Mr. Bakhmetev-এর প্রতিনিধি হয়ে রাশিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করতেন। এ ক্ষেত্রে A. J. Sack সম্পাদকীয় নানা কাজে তাকে সহযোগিতা করতেন।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যে নরঘাতক বলশেভিক নেতা-কর্মীদের হাতে কোটি কোটি নিরাপরাধ রাশিয়ান নাগরিক নিহত হয়েছে, আজ তাদেরই মহান নেতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বছরান্তে তাদের নামে উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তাদের ছবি বুকে ও মাথায় করে মহাবিপ্লবের ডাকে ফেঁটে পরি। তারা যেন তরুণ সমাজের জীবনাদর্শ।

মানুষ যদি জানত, বলশেভিক বিপ্লবের নামে তারা রাশিয়াতে কী নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে, তবে তারা হয়তো ঘৃণায় ও অপমানে মাটিতে মিশে যেত। সবাই আশা করেছিল, সোভিয়েত সরকার ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দ ফিরে আসবে। শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পাবে। অন্তত আর কাউকে অনাহারে মরতে হবে না।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল– লেনিন নিকোলাসের চেয়েও জালিম সরকার। পিঁপড়ার ওপর হাতির পা পড়লে যেমনটা হয়, তাদের অবস্থা তখন তেমনই হলো। চারদিকে আবারও বিদ্রোহ শুরু হলো। সাধারণ মানুষ লাঠিয়াল বাহিনীতে রূপ নিল। তাদের দমনে গঠন করা হলো রেড আর্মি। সাধারণ মানুষ যেকোনো সময় ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, তা তারা ভালোভাবেই আঁচ করতে পেরেছিল। তাই তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যত্র সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যতদিন না রেড আর্মি পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে, ততদিন তারা বাহিরের নিরাপদ রাষ্ট্রগুলোতে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে সময় কিশনেভ থেকে আমেরিকার নর্থ ডাকোটাতে পাঠানো একটি চিঠি নিয়ে গণমাধ্যমে হইচই পড়ে গিয়েছিল, তবে তা অঙ্কুরেই থামিয়ে দেওয়া হয়। চিঠিটির খানিকটা অংশ তুলে ধরা হলো–

'বন্ধু Gutsche,

বর্তমানে অনেক ইহুদি আশ্রয়ের লক্ষ্যে ইউক্রেন হয়ে ব্যাসারাবিয়াতে (Bessarabia) গমন করছে। তারা মূলত রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসছে। ছদ্মবেশে পালিয়ে এলেও তাদের পরনে রয়েছে দামি কাপড় ও মূল্যবান মনিমুক্তা। বিপ্লব চলাকালে তারা ছিল বলশেভিক গুপ্তচর, যারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে নিজেদের পকেট ভর্তি করেছে। এমন নয় যে, পকেট ভর্তি করে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন কাগজের নোট নিয়ে এসেছে। তারা নিয়ে এসেছে সে সকল মূল্যবান সম্পদ, যা একসময় সেখানকার মহিলারা অলংকার হিসেবে ব্যবহার করত।

প্রতিশোধের আগুনে রাশিয়ানরাও উত্তপ্ত হয়ে আছে। রাশিয়ানদের সাথে যে অন্যায় করা হয়েছে, তার জবাব দিতে তারাও উদ্‌গ্রীব। তাই ইহুদিরা বুঝতে পেরেছে, এই ভূমি তাদের জন্য আর নিরাপদ নয়। প্রতিশোধের আগুন থেকে নিজেদের চামড়া বাঁচাতে তারা অন্যত্র পলায়ন করছে।

তারা এতটাই লোভি, যাওয়ার সময় সোনা-দানা ও মণিমুক্তা যতটা সম্ভব সাথে নিয়ে যাচ্ছে। তারা পোলান্ড, রোমানিয়া ও লিথুনিয়া হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার ফন্দি করছে। আর আমেরিকা তো তাদের জন্য দরজা খুলে বসেই আছে। একদিন হয়তো ইহুদিদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তোমরা নিজেরাই লজ্জা পাবে। আয়নায় তখন নিজেদের চেহারা দেখতে পারবে না। তাদের ভিড়ে তোমরা নিজেদের পরিচয় পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে।

একবার কল্পনা করো তো– ইউরোপে যদি ইহুদিদের কোনো অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে কি এত এত যুদ্ধ কখনো হতো? তারা প্রতিটি দেশের ওপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। কমিউনিজমের নামে হাজারও বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে, যার কোনো শেষ নেই। তারা বলে– "খাবি খাওয়া পুকুরে মাছ ধরা অনেক সহজ।"

তিন-চারদিন পরপর তল্লাশির নামে একদল রেড আর্মি মানুষের সম্পদ লুট করতে হাজির হয়। ক্ষুধা, নির্যাতন ও দরিদ্রতার ভয়ে মানুষ তাদের ঘড়বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের না আছে খাবার, না আছে কাজ, আর না আছে ঘুম। কিছুদিন পরপর রেড আর্মির প্লাটুনগুলোকে রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে টহল দিতে দেখা যায়।

তারা তল্লাশির নাম করে ২০০ থেকে ৩০০ জনের দলকে রাস্তায় তুলে আনে। এদের মধ্যে থাকে সাধারণ জনগণ, সাবেক জার সৈন্য, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, জমিদারসহ আরও অনেকে। পুরো দলটিকে Tschreswytschaika (চ্রেভিতচাইকা) ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ যেন পালাতে না পারে, সে জন্য চারদিক ঘিরে রাখা হয়। এটা এমন এক দৃশ্য,

যা দেখলে যে কারোর-ই আত্মা শুকিয়ে যায়। রাস্তায় সামনে পরে যাওয়া প্রতিটি ব্যক্তি পাগলের মতো এদিক-সেদিক ছুটতে শুরু করে। গৃহবন্দিরা দেয়ালের ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য দেখে হৃদপিণ্ডে হাত রেখে বলে, এ আমি কী দেখছি! একবার যাদের সেই ক্যাম্পে নেওয়া হয়, তারা আর কখনো ফিরে আসে না। ভাই, পিতা, সন্তান এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ, যারা একসময় এই শহরগুলোতে আনন্দে ঘুরে বেড়াত, আজ তাদের মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে– এমন দৃশ্য নিজ চোখে না দেখলে কী কল্পনা করা যায়!

Tschreswytschaika ক্যাম্পে যে কী করা হয়, তা আর বলার প্রয়োজন নেই। যুবক-যুবতিদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন শরীর ধর্ষণ করে ফেলে রাখা হয়। হাস্যকর এক আদালতে তাদের হাজির করা হয়, যেখানে বন্দিদের বিচারের নামে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়। সত্যি বলতে, এই ইহুদি বলশেভিকদের মনে মানবতা বলতে কিছুই নেই। তারা প্রয়োজনে খ্রিষ্টান বলশেভিকদের পর্যন্ত হত্যা করতে পারে।

শীত ও ক্ষুধায় সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কতটা করুণ হয়ে উঠেছে, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কোনো প্রকার সৎকার, ভালো কাপড় বা কফিন ছাড়াই রাস্তায় পরে থাকা মৃত মানুষদের গণকবর দেওয়া হচ্ছে। পানি ও খাদ্য ছাড়া আত্মগোপন করা মানুষগুলো যে কীভাবে দিন পার করছে, সেই গল্প নাহয় অন্য দিন বলা যাবে।' ...F. Horch ২৪ অগাস্ট, ১৯২০।

পলায়নরত ইহুদিদের ব্যাপারে American Paper একটি কলাম প্রকাশ করে, যার খানিকটা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

> 'প্রতি মাসে হাজারো রাশিয়ান ইহুদি এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া ও পোল্যান্ডের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করছে। তারা যেন নিরাপদে পালাতে পারে, সে জন্য বলশেভিক সেনাবাহিনী নিজ দায়িত্বে সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। সেনাবাহিনীর পদ থেকে Baron Wrangel-কে সরিয়ে দেওয়ার পর রাশিয়ায় বলশেভিকবিরোধী আর কোনো বিপ্লব হয়নি। তবুও অনিশ্চিত দাঙ্গা-সংঘাতের ভয়ে আপাতত অন্যত্র সরে পড়াকে তারা শ্রেয় বলে মনে করছে। যতদিন না রেড আর্মি সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে, ততদিন তারা বাহিরের দেশগুলোতে অবস্থান করবে।
>
> তারা যে দাঙ্গার আশঙ্কা করেছিল, তা ঘটেনি। রেড আর্মি চারদিকে খুব দ্রুত অভাবনীয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মূলত সাধারণ মানুষ যেখানে নিরস্ত্র ছিল, সেখানে তারা ছিল অস্ত্রসজ্জে সজ্জিত। তা ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করায় তাদের প্রতি কেউ মুখ তুলে তাকায়নি। আসলে সেখানে কী ঘটেছে, বাহিরের দেশগুলোতে তার ছিটেফোঁটাও দীর্ঘকাল প্রচার করা হয়নি। কী আর বলব, লেনিন ও ট্রটস্কির মতো বর্বর চরিত্রগুলো আজও পৃথিবীর এক শ্রেণির আন্দোলনকারীদের কাছে জীবনাদর্শ!'

Lord Eustace Percy-এর একটি বিখ্যাত উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো–

> 'পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বোলশেভিজম ও জায়োনিজমকে একই সাথে গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে; ঠিক যেভাবে সমাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক দলগুলো গড়ে উঠছে। তা ছাড়া গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মতো আরও যেসব মতবাদ তারা প্রতিষ্ঠা করেছে, তার উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা নয়। জ্যান্টাইলদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাদের রয়েছে তীব্র অনীহা। তাই ইহুদিরা কোনো সমাজ ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে রাজি নয়। পরিবর্তন ও নিয়মিত পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য।'

রাশিয়ায় তাদের অজুহাত ছিল জার সাম্রাজ্য, জার্মানিতে কাইজার সাম্রাজ্য। ইংল্যান্ডে ছিল আইরিশ বিতর্ক, উত্তর আমেরিকায় পুঁজিবাদ সমাজব্যবস্থা; কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় কোনো অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার ধরন যাই হোক না কেন, এর একটিও ইহুদিদের পছন্দ নয়। ইহুদিরা বিশ্বাস করে, পৃথিবীর যেকোনো সমাজব্যবস্থায় নিজেদের নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করা তাদের জন্মগত অধিকার।

Judge Harry Fisher শিকাগো উচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে ৪৬ বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯০২ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত শিকাগো জায়োনিস্ট সংগঠনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একবার তিনি ত্রাণকার্যে অংশ নিতে রাশিয়া যান। পরে সেখানকার বেশ কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নেন। নির্দেশ ছিল তিনি যেন রাজনীতিকে এর সাথে না জড়ান, তবে আমেরিকায় আসার পর রাশিয়া বা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু প্রকাশ করতে তার আর বাধা ছিল না। Chicago Tribune-এ তার একটি কলাম ছাপানো হয়, যার অংশ বিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো–

> 'কিছুদিন আগে একটি খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়, রাশিয়ান মহিলারা নাকি সেখানকার রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে! মূলত সেখানকার বিবাহ ও তালাক পদ্ধতিতে সহজতর কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তারা এখন চাইলে একদিনের জন্যও বিয়ে করতে পারে। অনেকে আছে– যারা চরম অভাবের দরুন প্রতিদিনের খাবারটুকুও জোগাড় করতে পারে না। তাদের জন্য এ পদ্ধতিতে বিয়ে করা খুবই কার্যকর। কিছু পূর্ব শর্তের বিনিময়ে তারা একদিনের জন্য বিয়ে করতে পারবে। চাহিদা মিটে গেলে পরদিন তালাকও নিতে পারবে। এতে অনেকের ক্ষুধা মিটবে, আবার অনেকের অন্য উপায়ও হবে।'

মনে আছে, তাদের প্রটোকলের বিশেষ একটি ধারা– 'আমরা জ্যান্টাইলদের পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস করে দেবো।' পরিবার যেহেতু সমাজ ব্যবস্থার মূল একক, তাই তারা এখানেই আঘাত হেনেছে। তারা বিয়েকে চুক্তিভিত্তিক বিনোদন মাধ্যমে পরিণত করেছে, যেন পরবর্তী প্রজন্মকে নষ্ট করে দেওয়া যায়।

তারা জার্মানিতেও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। ফরাসি বিপ্লবের সময়ও তারা একই কাজ করেছিল, কিন্তু সেখানকার অরাজকতা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তাদের এই পরিকল্পনা সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে রাশিয়াতে।

'সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করব।'-৭ম প্রটোকল

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে মস্কোর কোনো এক পত্রিকায় রাবাই Cohan-এর একটি কলাম ছাপানো হয়, যার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো–

> 'কোনোরূপ অতিরঞ্জন না করে বলছি– মূলত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইহুদিদের পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়েছে। গরিব, নির্যাতিত, নিপীড়িত প্রলেতারিয়েটরা কি আদৌ বুর্জুয়াদের ক্ষমতা ধ্বংস করতে পেরেছে? বরং এই বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিশ্বে তাদের নতুন এক অরুণদয়ই এনে দিয়েছে। ট্রটস্কি যতদিন রেড আর্মির প্রধান কমরেড হয়ে থাকবেন, ততদিন আমাদের উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা সত্য– রেড আর্মির সৈনিক পদগুলোতে আমাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সোভিয়েতের লাল পতাকায় যে তারকা চিহ্নটি দেখা যায়, তা মূলত জায়োনিস্টদেরই সংগীতে করা প্রতীক। কিন্তু বোকা রাশিয়ানরা এটাকে প্রলেতারিয়েট চেতনার প্রতীক বলে গ্রহণ করেছে। সত্যি বলতে– এটা আমাদের বিজয় প্রতীক, যার উত্থান হয়েছে বুর্জুয়ানামক পরজীবীদের ধ্বংস করে। তাদের রক্ত দিয়ে আমরা প্রতি ফোঁটা কান্নার প্রতিশোধ নিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও নিতে থাকব।'

এখানে যে তারকা চিহ্নের কথা বলা হয়েছে, তা সোভিয়েত আর্মির পতাকায় দেখা যায়। তবে ইহুদিদের জাতীয় প্রতীক হলো একটি ষড় কোণবিশিষ্ট তারা, যাকে বলা হয় 'স্টার অব ডেভিড'। এর গঠন অনেকটা মেসনদের[২৮] প্রতীকের মতো। আর সোভিয়েত পতাকার তারাটি পাঁচ কোণবিশিষ্ট।

প্যালেস্টাইনের ওপর আজ যে ইজরাইল জন্ম নিয়েছে, তার জাতীয় প্রতীক হিসেবে 'স্টার অব ডেভিড' স্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রতিকের আরও একটি নাম আছে 'মাগান স্টার'। অটোমানদের হারিয়ে প্যালেস্টাইন দখল করতে যে ইংরেজ সৈনিকেরা শহিদ হয়েছে, ইহুদিরা তাদের কবর থেকে ক্রুশ চিহ্ন সরিয়ে সেখানে 'মাগান স্টার' বসিয়ে দিয়েছে; যেমনটা রাশিয়াতেও করেছে। এখন সোভিয়েত তারকা চিহ্নের পাঁচটি কোণের অর্থ যদি হয় অর্থ-সম্পদ, গণমাধ্যম, আভিজাত্য, প্যালেস্টাইন ও প্রলেতারিয়ানিজম;

---

[২৮]. মেসনিক– পৃথিবীর অন্যতম একটি গোপন সংগঠন।

তাহলে মাগান স্টারে অতিরিক্ত যে কোণটি রয়েছে, তার অর্থ হবে ইজরাইলের বাদশাহি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এ জন্য প্রথমে ইহুদিদের রাজা ডেভিডের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে হবে।

(ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, খ্রিষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীতে রাজা ডেভিড জেরুজালেমকে শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তার সন্তান, পয়গম্বর সলোমন সেখানে একটি মহাপবিত্র মন্দির নির্মাণ করেন, যা প্রথম টেম্পল নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যবিলন সেনাপতি নেবুচাদ নেজার জেরুজালেম আক্রমণ করে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয় এবং বহু ইহুদিকে বন্দি করে নিয়ে যায়। পরে বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পেয়ে জেরুজালেমে ফিরে এসে তারা পুনরায় সেই মন্দিরটি নির্মাণ করে, যা দ্বিতীয় টেম্পল নামে পরিচিত। কিন্তু ৭০তম খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা জেরুজালেম দখল করে পুনরায় মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়, যা আজ অবধি নির্মাণ করা হয়নি।

তবে ইজরাইল যেহেতু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই তাদের তৃতীয় টেম্পল নির্মাণের বিষয়টিও আলোচনার টেবিলে চলে এসেছে। এরপর মন্দিরের খুব কাছে একটি প্রসাদ নির্মাণ করতে হবে, যাতে থাকবে রাজা ডেভিডের রূপক সিংহাসন। তাদের বহু প্রতীক্ষিত মসিহ এসে সে সিংহাসনে আরোহণ করবেন। শুরু হবে বিশ্বজুড়ে ইজরাইলিদের বাদশাহি শাসন। তবে বাইবেল অবিশ্বাসীদের নিকট প্রথম ও দ্বিতীয় টেম্পলের বিষয়টি নিছকই কল্পিত গল্পের মাঝে সীমাবদ্ধ। কারণ, বাইবেল ব্যতীত অন্যান্য উৎসগুলোতে মন্দিরটির প্রমাণ খুবই অপ্রতুল।

মসিহ সম্পর্কে বলতে গেলে তালমুদ ও প্রাচীন মরমিবাদী পুস্তক *Zohar*-এ বলা হয়েছে– সৃষ্টি জগতের ৬০০০ হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মসিহের আগমন ঘটবে। কট্টরপন্থি ইহুদিরা বিশ্বাস করে– সৃষ্টিকর্তার বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কাল থেকেই ইহুদিদের বর্ষপঞ্জির গণনা শুরু। সেই বর্ষপঞ্জির হিসেবে ২০১৯ হলো ৫৭৭৯তম বছর। ধার্মিক ইহুদিগণ দিনে অন্তত তিনবেলা সমবেত প্রার্থনায় অংশ নেয়।

ভোরের প্রার্থনা Maariv, দুপুরের প্রার্থনা Shacharit ও রাতের প্রার্থনা Mincha। প্রতিটি প্রার্থনায় ১৯টি আশীর্বাদের মধ্যে সকল ইহুদিকে জেরুজালেমে একত্রিতকরণ, মহাপবিত্র মন্দিরের পুনর্নির্মাণ এবং মসিহের দ্রুত আবির্ভাব ঘটানোর জন্য প্রার্থনা করা হয়। তবে যত যাই হোক, ইহুদিদের বিশ্ব কর্মসূচি বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সকল কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। এ জন্য কতটা সময় প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।)

আমেরিকা; বলশেভিক বিপ্লবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিউইয়র্ক একদিকে ইহুদিদের জন্য স্বর্গপুরী, অন্যদিকে যেকোনো বিপ্লবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। যেকোনো বিপ্লব বা যুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে প্রথমে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন, না হলে লাশ হয়ে ভাগাড়ে পঁচতে হবে এটাই রীতি।

যে বলশেভিক বিপ্লব পূর্ব ইউরোপ তথা বিশ্বের একটি বড়ো অংশের মানচিত্র পালটে দিয়েছে, তা নিছক দুই-একদিনের পরিকল্পনায় সম্ভব হয়নি। আগেই বলেছি, প্রথম ধাপে তাদের কিছু সদস্য খ্রিষ্টানের ছদ্মবেশে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষদের সাথে মিশেছিল। এটা ঠিক, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনো ভালো থাকে না। তারা দিন আনে দিন খায়। তাদের সঞ্চয় বলতে কিছু থাকে না। অভাব নিত্যদিনের সঙ্গী। তাই এই জনগোষ্ঠীকে সামান্য অর্থের লোভ দেখিয়ে ধ্বংসাত্মক যেকোনো কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল, ধর্মঘট, মিটিং, মিছিল ও সমাবেশে এই কাজটিই করে থাকে।

ছদ্মবেশধারী বলশেভিক শ্রমিকরা আশেপাশে থাকা শ্রমিকদের মাথায় বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলন ঢুকিয়ে দেয়। তারা যেন সহজে অন্যদের কাবু করতে পারে, সে জন্য বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের নিকট অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।

ফলস্বরূপ রাশিয়ার প্রতিটি শিল্প কারখানায় বিভিন্ন অধিকার আদায়ের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়া শুরু করে। ধীরে ধীরে তা নিষ্পেষিত মানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রথমে তা পুঁজিবাদ শিল্প-সমাজের বিরুদ্ধে শুরু হলেও পরে বুর্জুয়াদের বিরুদ্ধে রূপ নেয়। তারা রাজা নিকোলাসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু করে। প্রথম ধাপটি সুন্দরভাবে শেষ হলে দ্বিতীয় ধাপটি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়। ততদিনে ইহুদিরা ছদ্মবেশে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কিন্তু শ্রমজীবী মানুষদের উসকে দেওয়ার কাজটি তারা কীভাবে করল? মূলত সে সময় ইহুদিরা এত বেশি শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম দিয়েছিল, এর সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি ইউনিয়নেই ছিল একজন করে নেতা। আবার কয়েকটি ইউনিয়ন মিলে ছিল একটি মহাইউনিয়ন। তা ছাড়া, প্রতিটি শিল্পের (যেমন : টেক্সটাইল, কৃষি, পশুপালন, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি) জন্যও ছিল আলাদা আলাদা ইউনিয়ন। সকল সদস্যের কাছ থেকে নিয়মিত মজুরির একটি অংশ চাঁদা হিসেবে কেটে রাখা হতো। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হতো কেন্দ্রীয়ভাবে। প্রশিক্ষণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন দক্ষতা অর্জন কখনোই সম্ভব নয়।

'Hebrew labor movement'-এর মধ্যদিয়ে আমেরিকায় কম্যুনিস্ট বিপ্লবের যাত্রা শুরু হয়। এটি 'Jewish labor movement' নামেও পরিচিত। শুরু হয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। নিউইয়র্ক শহরের ফিফথ অ্যাভিনিউ ছিল মূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নিউ ব্রডওয়ের ১৪ থেকে ৩৪ নম্বর সড়ক পর্যন্ত এই অঞ্চলটির বিস্তৃতি ছিল।

রাশিয়া-পোল্যান্ড থেকে আসা ইহুদিরা এই পুরো শহরকে সোয়েটশপে পরিণত করে। এটি ছিল তৈরি পোশাক শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু। শার্ট-প্যান্ট, জুতার কাপড়, মোজা, কোট-সুয়েটার সবকিছু এখানে তৈরি করা হতো।

প্রতিটি বিল্ডিংয়ের ছাদে ছোটোখাটো পোশাক কারখানা গড়ে তোলা হয়। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা মানুষকে বিভিন্ন শিফটে কাজ করানো হতো। এই শহর ছাড়াও আমেরিকার আরও অনেক স্থানে পোশাক কারখান ছিল, তবে এই শহরকে তারা সবকিছুর কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিল। এরপর শুরু হয় মূল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

তাদের একদল তো এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে আছে। অপর একটি পক্ষ ছদ্মবেশে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে মিশে যায়। তারা ধীরে ধীরে শ্রমিকদের মাঝে মজুরি বৃদ্ধি, চিকিৎসা সুবিধা, চাকরি নিরাপত্তা, বাসস্থান, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ইত্যাদি নানা বিষয়ে অধিকার আদায়ে উসকে দেওয়া শুরু করে। ছদ্মবেশধারী শ্রমিক নেতারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে– কীভাবে সাধারণ শ্রমিকদের মানসিকতায় আন্দোলনের ঘি ঢালা যায় এবং নিজেকে নেতারূপে গড়ে তোলা যায়।

ইহুদিদের ধনী ভাইয়েরা অতি গোপনে তাদের নিকট অর্থ পৌঁছে দিত, যা দিয়ে একটি প্রাথমিক ফান্ড তৈরি করা হতো। মূলত এই ভাইয়েরা ছিল বিভিন্ন গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক। ফান্ডের অর্থ থেকে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা খরচ, মিটিং-মিছিল শেষে নৈশ্যভোজের আয়োজন, উৎসবের দিনগুলোতে উপহারের আয়োজনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো। তারা এসব খরচ, অমায়িক ব্যবহার ও জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জন করত। এভাবে তারা সফল হওয়া শুরু করে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠে অসংখ্য শ্রমিক ইউনিয়ন, যেখানে তারাই নেতা হতো। আর সাধারণ মানুষও হৃদয় থেকে তাদের বিশ্বাস করত।

সবকিছু গুছিয়ে উঠার পর তারা ইউনিয়ন ফান্ড তৈরির নামে প্রতি সদস্যদের ওপর চাঁদা নির্ধারণ করত। সে সময় একজন মহিলা পোশাক শ্রমিকের সাপ্তাহিক আয় যদি ৫৫ ডলার হতো, তবে ২৭.৫০ ডলার ইউনিয়নের ফান্ডে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হতো। কিন্তু এই অর্থের পুরোটা তো আর তাদের পেছনে খরচ হতো না! ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শ্রমিক ছদ্মবেশ ইহুদিরা কী পরিমাণ অর্থ কামিয়েছে, তা একবার চিন্তা করে দেখুন। এবার জানা যাক– ইহুদিদের যে সম্পদশালী ভাইয়েরা অর্থ সরবরাহ করত, তাদের কী হলো?

এর কিছুদিন পর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে শুরু হয় একের পর এক আন্দোলন, যা আমেরিকার বিভিন্ন পোশাক কারখানাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। মালিকরারও কিছুদিন তামাশার নাটক করে কিছু বেতন বাড়িয়ে দিত। আদতে এই বেতন কি শ্রমিকদের কোনো উপকারে আসে? মোটেও না। কারণ, পোশাক মালিকরাও তাদের উৎপাদিত পণ্যের

বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দেয়। বেতন তিন ডলার বাড়িয়েছে তো বিক্রয়মূল্য বাড়িয়েছে পাঁচ ডলার। ফলে শ্রমিকনেতা এবং মালিকপক্ষ উভয়েরই লাভ হলো। ইহুদিদের প্রটোকলের একটি ধারা মনে আছে?

'আমরা মজুরি বৃদ্ধির বিভিন্ন আন্দোলনে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করব। একই সঙ্গে বাজারে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেবো। ফলে বর্ধিত মজুরি কখনোই তাদের উপকারে আসবে না।'

শুরু হয় শ্রমবাজার ও পুঁজিবাজারের দ্বন্দ্ব, যার কথা বইয়ের শুরুতেই বলা হয়েছে। সে সময় এই পুঁজিবার যাদের দখলে ছিল, তাদের কয়েকজনের নাম আবারও উল্লেখ করছি : Schiffs, Speyers, Warburgs, Kahns, Lewisohns এবং Guggenheims। তারা কীভাবে শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করছে, তা তো বলাই হলো। কিছুদিন পরপর তারা মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করছে, আর পোশাক মালিকরাও উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝ থেকে নিস্পেষিত হচ্ছে জ্যান্টাইলরাই। ইহুদি মালিকরা যখন মূল্য বাড়াত, তখন সব গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠান একযোগে অনুসরণ করত। এদের মধ্যে কোনো জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠান পড়ে গেলে তাকেও এই নিয়ম অনুসরণ করতে হতো। কিন্তু ১৯১৮-১৯ সালের দিকে Wanamaker's প্রতিষ্ঠানটি বেকে বসে। তারা উলটো দাম কমানোর ঘোষণা দেয়। এটি ছিল একজন খ্রিষ্টানের প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু একটি-দুটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে তো আর সমাজ বদলানো সম্ভব নয়। সে সময় শুধু নিউইয়র্কেই ছিল ২৭৬০টি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন ধরনের স্যুট ও পোশাক তৈরি করত। ১২০০টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের কাপড় তৈরি করত। ২৮৮০টি প্রতিষ্ঠান পশমি পণ্য তৈরি করত। ৬০০টি প্রতিষ্ঠান মেয়েদের স্কার্ট তৈরি করত এবং ১৪০০টি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামাল ও সরঞ্জাম সরবরাহ করত। বলে রাখা ভালো, এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ইহুদি বণিকদের অর্ডারে কাজ করত। যেসব ব্যবসায়িক জোটের মাধ্যমে তারা গার্মেন্ট শিল্পের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তাদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

- Associated Boy's Clothing Manufacturers of Greater New York
- Associated Fur Manufacturers
- Associated Shirt Manufacturers
- Association of Embroidery and Lace Manufacturers
- Children's Dress Manufacturer's Association
- Cloak, Suit and Skirt Manufacturer's Protective Association
- Cotton Garment Manufacturers' of New York
- Dress and Waist Manufacturers' Association
- East Side Retail Clothing Manufacturers' Association

- Ladies' Hat Manufacturers' Protective Association
- Mineral Water Dealers' Protective Association
- National Association of Separate Skirt Manufacturers
- National Society of Men's Neckwear Manufacturers
- New York Association of House Dress & Kimono Manufacturers
- New York Tailors' Verein
- Shirt Manufacturers' Protective Association

তাদের একটি অভিভাবক সংগঠন রয়েছে, যার নাম International Fur Workers' Union of the United States and Canada। তারা পোশাক শিল্পের প্রতিটি কাজকে আলাদা আলাদা অংশে বিভক্ত করেছে। যেমন : বোতামঘর তৈরি, প্যান্টের জিপার, বিভিন্ন মাপে কাপড় কাটা, জামার আস্তিন ও জামার কলার তৈরি করা ইত্যাদি। প্রতিটি কাজে জড়িত শ্রমিকদের নিয়ে তারা পৃথক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে। এদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

- Feather Boa Makers' Union
- Fur Cap Makers' Union
- Fur Cutters' Union
- Fur Dressers' Union
- Fur Dryers' Union
- Fur Floor Walkers' Union
- Fur Hatters' Union
- Fur Head and Tail Makers' Union
- Fur Lined Coat Finishers' Union
- Fur Nailers' Union
- Fur Operators' Union
- Fur Pluckers' Union.

শুধু তাই নয়; বিভিন্ন ক্রেতা সম্প্রদায়ের জন্যও তারা পৃথক সব ইউনিয়ন খুলে বসেছে। যেমন : শিশু পোশাক তৈরি শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা শ্রমিক ইউনিয়নগুলো হলো :

- Children's Jacket Makers (three unions)
- Children's Jacket Pressers
- Children's Sailor Jacket Makers' Union
- Children's Cloak and Reefer Workers' Union
- Children's Dressmakers' Union.

মেয়ে ও মহিলা পোশাক তৈরি শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা শ্রমিক ইউনিয়নগুলো হলো–

- Amalgamated Ladies' Garment Cutters' Union
- Bonnaz, Singer and Hand Embroiderers' Union
- Buttonhole Makers and Button Sewers' Union
- Childrens' Cloak and Reefer Workers' Union
- Cloak and Suit Piece Tailors and Sample Makers' Union
- Cloak Examiners, Squarers and Bushelers' Union
- Cloak Operations' Union
- Cloak, Skirt and Dress Pressers' Union
- Ladies' and Misses' Cloak Operators' Union
- Ladies' Tailors Alternation & Special Older Union
- Skirt and Cloth Dressmakers' Union
- Waterproof Garment Workers' Union
- White Goods Workers' Union
- Wrapper, Kimono, House Dress and Bath Robe Makers' Union.

এই ইউনিয়নগুলোরও একটি অভিভাবক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার নাম International Ladies' Garment Workers' Union।

এই বিশাল তালিকা দেখে বিস্মিত হচ্ছেন, তাই না? তবে এই প্রতিটি ইউনিয়ন শুধু ইহুদি নেতাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো না; কিছু জায়গায় জ্যান্টাইল নেতাদেরও নিয়োগ দেওয়া হতো, যেন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস পাকাপোক্ত করা যায়। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ হলে আবারও এই নেতাদের ধীরে ধীরে রাশিয়া পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রে তারা দুটি কৌশল ব্যবহার করত। এক, নিজেদের নাম পরিচয় পালটে খ্রিষ্টানের ছদ্মবেশ নিত।

দুই, রাশিয়ান মহিলাদের বিয়ে করে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করত। এরপরের ঘটনা তো আমরা জানি। প্রলেতারিয়েটদের জন্য বলশেভিক আন্দোলন এবং জার সরকারের পতন।

প্রেসিডেন্ট Mr. Taft-কে নিয়ে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

আগের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আমেরিকায় এ পর্যন্ত যত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে, তারা সবাই জায়োনিস্টদের হাতের পুতুল। তাদের ক্ষমতায় আনা হয়েছিল কেবল ইহুদিদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যই। আর যারা বেঁকে বসেছে, তাদের কিছুদিনের মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। William Howard Taft হলেন এমন একজন প্রেসিডেন্ট,

যিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে বেকে বসেছিলেন। আমেরিকার ২৭ তম এই প্রেসিডেন্ট ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন। ইহুদিদের সাথে তার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ১৯১১ সালে।

প্রথমে বলে রাখি, Mr. Taft ছিলেন অমায়িক চরিত্রের মানুষ। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে দ্বিমত করতেন না, যতক্ষণ না তা দেশ ও জাতির জন্য অমঙ্গলের কারণ হতো। ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণবাদ কোনো কিছুকেই তিনি গ্রাহ্য করতে না। নিজের বিবেকবোধ ও চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি কাজের সিদ্ধান্ত নিতেন। মানুষের কোনো কথা কখনো অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন না।

আগেও বলা হয়েছে, আমেরিকা জন্মের পর থেকেই ইহুদি লবিস্টরা হোয়াইট হাউসে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে প্রেসিডেন্ট সাহেবরা কখন, কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, আগামী নির্বাচনে কে ক্ষমতায় আসবে এবং অন্যান্য দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক কেমন হবে, তা তারা অনেক আগেই জেনে যেত।

যখন তাদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজন হতো, তখনই আমেরিকার প্রেসিডেন্টেদের কঠিন সব পরিস্থিতিতে ফেলে দিত। যেমন : সন্ত্রাসী হামলা, অর্থনৈতিক চাপ, কূটনৈতিক আক্রমণ ইত্যাদি। তা ছাড়া বিভিন্ন স্ক্যান্ডাল ফাঁস করার ব্লাকমেইল তো আছেই। রাশিয়ার সাথে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক বহু দিনের। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, ইহুদিদের জন্যই এই দুই দেশের সম্পর্ক বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সে সময় এই দুই দেশের মধ্যে চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। উভয় দেশের মধ্যে বড়ো অঙ্কের আর্থিক বিনিয়োগ হতো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুঝতেই পারল না হঠাৎ কী কারণে ১৯০৭-০৮ সালের পর থেকে রাশিয়ান সরকার আমেরিকান অভিবাসী গ্রহণে এত গড়িমড়ি করতে শুরু করে। মূলত সেখানকার সরকার আঁচ করতে পেরেছিল- নতুন ছদ্মবেশে পুরোনো শত্রুরা আবারও এ দেশে প্রবেশ করা শুরু করেছে। জার সরকার জানিয়ে দেয়- 'আমরা সাধারণ আমেরিকানদের নিয়ে বিচলিত নই। যারা নতুন ছদ্মবেশে পুনরায় এ দেশে প্রবেশ করছে, মূলত তারাই মাথাব্যথার কারণ।'

তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে আমেরিকান দূতাবাসে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়-

> 'অবিলম্বে যেন এই ইহুদিদের পাসপোর্ট প্রদান বন্ধ করা হয়। আমরা আপনাদের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করছি, কিন্তু এই আতিথেয়তা যেন আমাদের ওপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। এই সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর জন্য আপনাদের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী-

এ পর্যন্ত তাদের প্রায় ২০০০০০ সদস্য অভিবাসী হয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু এর প্রকৃত সংখ্যা যে আরও অনেক বেশি– তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা যদি শ্রমিক হিসেবে সেখানে থাকতে চায়, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে তাদের যেন নতুন পাসপোর্ট দিয়ে আমাদের দেশে পাঠানো না হয়।'

ইহুদিদের সাথে এমন উদ্ধত্য আচরণ কেন করা হলো, তার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা Mr. Taft-এর নিকট দাবি করে, আমেরিকা যেন রাশিয়ার সাথে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। উল্লেখ্য যে, ১৮৩২ সালে উভয় দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে এই দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি করা হয়। চিন্তা করা যায়, ৮০ বছরের এমন একটি সম্পর্ক শুধু ইহুদিদের জন্যই ভেঙে ফেলতে হবে! তাও কিনা সংখ্যালঘু একটি জাতিকে সন্তুষ্ট করতে!

ইহুদিরা Mr. Taft-এর কাছে দুটি দাবি করে। এক, রাশিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন; দুই, তাদের অভিবাসন নিয়ে কংগ্রেসে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা বন্ধ করতে হবে।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১, তারা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে একটি বৈঠকের আয়োজন করে। ইহুদিদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হন Jacob H. Schiff, Jacob Furth, Louis Marshall, Adolph Kraus এবং Judge Henry M. Goldfogle। হোয়াইট হাউজ লাইব্রেরি কক্ষে এর আয়োজন করা হয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেবের সিদ্ধান্ত শুনে তাদের চোখ কপালে ওঠে। কী ছিল তার সিদ্ধান্ত? এর অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো–

> 'রাশিয়া ও আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয় দেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। গত ৫০ বছরে আমাদের মধ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে। ইতোমধ্যে শিল্পায়নে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। আমাদের অনেকের ভবিষ্যৎ এই সম্পর্কের ওপর নির্ভর করছে। এই সম্পর্ক ছিন্ন করলে অনেক মানুষ সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তারা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসবে। আমাদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে, তাই এমনটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাদের সাথে আমাদের অনেক ধরনের চুক্তি রয়েছে। যেমন : বন্দি বিনিময় চুক্তি, সাংস্কৃতিক চুক্তি, খেলাধুলা চুক্তি ইত্যাদি। আপনারা যদি চান, এ জাতীয় কিছু চুক্তি আমরা রদ করতে পারি, কিন্তু বাণিজ্যিক ও আর্থ-সমাজিক চুক্তিগুলো কোনোভাবেই বর্জন করা সম্ভব নয়।
>
> রাশিয়ান ইহুদিদের এ দেশে আসতে কোনো বাধা নেই, তবে তাদের যত দ্রুত ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। তবে চাইলে আগামী কয়েক বছর ন হয় রাশিয়ার সঙ্গে নতুন কোনো চুক্তি করব না। মহোদয়গণ, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আসা করি আপনারা একমত হবেন।'

উপস্থিত প্রতিনিধিরা সবাই অবাক! Simon Wolf বলেন– 'প্রেসিডেন্ট সাহেব, এই সিদ্ধান্ত আপনি কোনো পত্রিকায় ছাপাবেন না।'

Jacob Schiff রাগান্বিত কণ্ঠে বলেন– 'না, তাকে ছাপাতে দিন। তিনি আমাদের সঙ্গে আজ যে ব্যবহার করলেন, তা পুরো পৃথিবী দেখুক।'

তাদের ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য করে প্রেসিডেন্ট নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। বুঝিয়ে দিলেন– মিথ্যা বলে তার সাথে পার পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের ওপর তার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তার সাথে উপস্থিত সবার চরম দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এক পর্যায়ে সবাই তাকে তিরস্কার করা শুরু করে। Jacob Schiff লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় করমর্দন পর্যন্ত করেননি। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বলতে থাকলেন– 'এর মানে কিন্তু যুদ্ধ, বুঝলেন? এর মানে কিন্তু যুদ্ধ!'

চিন্তা করুন, ১৫ তারিখের সম্মেলনটি সফল হলে উভয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কী হতো! কত মানুষ পথে বসত! ইহুদিরা তো সাধারণ মানুষে কথা ভাবে না। তাদের সব পরিকল্পনা শুধু নিজেদের ঘিরেই।

তার এই সিদ্ধান্তের পর প্রতিটি ইহুদি সংগঠনের মধ্যে বিরক্তির ছাপ ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদিরা চাইলে যে কী করতে পারে, তা দেখার মতো দৃশ্য। Jacob Schiff ব্যাংক থেকে প্রচুর অর্থ উত্তোলন করে এবং American Jewish Committee ও B'nai B'rith সহ সকল সংগঠনের মাঝে তা বণ্টন করে দেন।

পরবর্তী দশ মাস ইহুদিদের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রেসিডেন্ট সাহেবকে ব্যঙ্গ করে একের পর এক কলাম ছাপতে থাকে। ইহুদিরা আঞ্চলিক কংগ্রেস অফিসগুলোকে নিয়মিত চাপ দেওয়া শুরু করে, যেন তারা Mr. Taft-এর ছায়াতল থেকে বেড়িয়ে আসে। আর এ কারণেই হয়তো তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হননি, যেখানে আমেরিকার অধিকাংশ প্রেসিডেন্ট পরপর দুই মেয়াদে নির্বাচিত হয়।

১৯১২ সালে ঘটল আর একটি আজব ঘটনা। B'nai B'rith সংগঠনটি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে সম্মাননাস্বরূপ মেডেল প্রদান করে। তারা বলে–

> 'প্রেসিডেন্ট সাহেব তাদের প্রতি যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে, তার প্রতিদানস্বরূপ তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হলো।'

হোয়াইট হাউসের বারান্দায় ইহুদিদের একদল সদস্যের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ছবি তুলেন। ছবিটির দিকে তাকালে তাকে শুধু অসহায়-ই মনে হয়; মুখে কোনো উচ্ছ্বাস হাসির চিহ্ন ছিল না।

তার ব্যক্তিগত কিছু চিঠি পরবর্তী সময়ে ফাঁস হওয়ার পর এতটুকু আন্দাজ করা গেছে–তিনি বেশ আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। তাকে সারাক্ষণ গোপন নজরদারিতে রাখা হতো। তিনি আদৌ রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন কি না এবং সে জন্য নিজেকে কতটুকু গুছিয়ে নিয়েছেন, তা খুব কাছ থেকে কেউ পর্যবেক্ষণ করত। শেষ পর্যন্ত তাদের এই দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয়, তখন রাশিয়ার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলো জার্মান ইহুদিরা দখল করে। তারা হাতে পায় গুপ্তধনের ভান্ডার। উভয় দেশের বহু মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে। সমস্ত দোষ পড়ে সম্রাট নিকোলাসের ঘাড়ে। অন্যদিকে, পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে ধীরে ধীরে বলশেভিক আন্দোলন আরও জোড়দার হয়।

জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় : ইহুদি জালিয়াতি

ঐতিহাসিক নানা কারণে আমেরিকা এ পর্যন্ত বহুবার অভিবাসী গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়া, জার্মানি ও পোলান্ডের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা এতটা প্রকট ছিল, সে দেশের একজন সাধারণ মানুষও আমেরিকায় অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পায়নি। তারপরও লাখো ইহুদি ওই দেশগুলো থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করে। সেই সঙ্গে নিউইয়র্কের এলসা দ্বীপে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করে।

সে সময় ইউরোপের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে আমেরিকায় ইহুদিদের অভিবাসন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, আমেরিকা থেকে একদল প্রশিক্ষিত ছদ্মবেশী এজেন্ট পাসপোর্ট অফিসগুলোতে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে তারা এতটা দক্ষ, তাদের কোনোভাবেই সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। কখনো যদি কেউ তাদের প্রতি ন্যূনতম সন্দেহের চোখে তাকায়, তৎক্ষণাৎ তাকে বদলি করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুরো এই চক্রটিকে শক্তিধর কোনো হাত নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে সেই চক্রের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ একটি জাতিগোষ্ঠীর অভিবাসন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। প্রথমে তাদের বিশেষ অতিথি কোঠায় আমেরিকা পাঠানো হয়। তারপর বাকি কাজ সে দেশের অভিবাসন মন্ত্রণালয় সহজ করে দেয়। তাদের কোনো রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা জবানবন্দি পর্যন্ত দিতে হয় না।

এমন প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর প্রথমবারের মতো আমেরিকার অভিবাসন মন্ত্রণালয় নড়েচড়ে বসে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। তবে শুরু থেকে কিছু কংগ্রেস সদস্য ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠান তদন্ত কাজে অসহযোগিতার মনোভাব দেখায়। বিশেষত এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের প্রতিনিয়ত ওয়াংশিটন থেকে বাধা দেওয়া এবং ভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখা হয়। ফলে তদন্ত কাজ দীর্ঘায়িত হয়। দেখা যায়, এই পুরো চক্রটি ইহুদি গোত্রের সদস্য। সাথে সাথে তাদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচার করতে শুরু করে—'অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে, সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায় যে ইহুদিরা আমেরিকার পথে পালিয়ে আসছে, তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের এত ক্ষোভ কেন?'

বিষয়টি আরও মর্মস্পর্শী করতে তারা একদল ক্ষুধার্ত শিশু-মহিলার করুণ চিত্র ছাপিয়ে বড়ো বড়ো কলাম প্রকাশ করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারেনি, এই ছবিগুলো ইহুদিদের ভাড়া করা ফটোগ্রাফার দিয়ে তোলা! আর যে ক্ষুধার্ত মানুষের কথা বলা হচ্ছে, তা ছিল পুরোদস্তুর বানানো নাটক। কিন্তু বোকা আমেরিকানরা সবকিছু সত্য মনে করে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আশ্রয় প্রদান করেছে; ঠিক যেমনটা ঘটেছে রাশিয়ান ও জার্মানদের ভাগ্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে জনসংখ্যা গণনা নিয়ে আমেরিকায় একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়। কারণ, স্বাধীনতার পর হতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অভিবাসী হয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে পৃথক জাতীয়তা যেমন : জার্মান, রাশিয়ান, আইরিশ ইত্যাদি। তাই জাতীয়তার ওপর ভিত্তি করে একটি আদমশুমারি করার প্রস্তাব ওঠে। ৮০'র পূর্বে যদি কোনো অভিবাসী আয়ারল্যান্ড থেকে আসে, তবে তাকে আইরিশ, নরওয়ে বা সুইডেন থেকে এলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, রাশিয়া থেকে এলে রাশিয়ান এবং জার্মানি থেকে এলে জর্মান বলে ডাকা হতো।

এভাবে পরবর্তী দশ বছরের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬৬৬৫৬১ 'রাশিয়ান ইহুদি'-কে আমেরিকায় নথিভুক্ত করা হয়। কিন্তু নব্বই দশকের দিকে অভিবাসন মন্ত্রণালয় ভিন্ন কথা জানাতে থাকে। তারা যাদের এই নথিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাদের অধিকাংশই পোলিশ, সুইডিশ, জর্মান ও লিথুনিয়ান। কারণ, জন্মসূত্রে তারা এসব দেশের নাগরিক। হয়তো রাশিয়া থেকে তারা সরাসরি আমেরিকায় প্রবেশ করেছে বলে গণনা কাজে ভুল হয়েছে।

সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস সদস্যগণ 'জাতি ও জন্মভূমি' বিষয় দুটিকে মানদণ্ড ধরে আদমশুমারি করার প্রস্তাব করে। এটা কিছুটা হলেও যুক্তিসংগত। কিন্তু Senator Simson Guggenheim এ বিষয়ে জোরালো আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন– 'ইহুদি শব্দটি কেবলই একট ধর্মীয় উপাধি। এর সাথে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ জড়িত। জাতি ও ধর্ম কখনো এক বিষয় নয়। তাই এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের কখনো আলাদা জাতি বলা যাবে না।' Senator La Follette ছিলেন এই আলোচনা সভার চেয়ারম্যান। এবার তাদের আলোচনা লক্ষ করুন–

লা ফোলেত্তি : 'একটি জাতির সঠিক ইতিহাস জানতে তারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের শরীরে কার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের পূর্বপুরুষগণ কোথাকার অধিবাসী ইত্যাদি জানা প্রয়োজন।'

গুগেনহিম : 'তাহলে ধর্মের কথা কেন আসছে?'

(Senator McCumber ও Bailey আলোচনার সময় Senator Guggenheim-কে সমর্থন করেন)।

লা ফোলেত্তি : 'আমি আপনার আপত্তির কারণ বুঝতে পারছি না। প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের সমন্বয় করতে সমস্যা কোথায়?'

গুগেনহিম : 'কারণ, আপনি আবারও তাদের একটি জাতি বলছেন, কিন্তু তারা তো পৃথক কোনো জাতি নয়!'

(এবার Senator Bailey-কে সমর্থন করে Senator Cummins আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন)।

সিনেটর বেইলি : 'মনে করুন, আমি একজন হিব্রু এবং এ দেশে আমার জন্ম। এরপরও যদি আমেরিকান ব্যতীত অন্য কোনো নামে কেউ আমাকে সংজ্ঞায়িত করে, তাহলে আমি অবশ্যই এর বিরোধিতা করব।'

সিনেটর কামিন্স : 'আমার পূর্বপুরুষরা কোথাকার অধিবাসী এবং আমার শরীরে কাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তা বলতে কোনো সমস্যা নেই।'

সিনেটর বেইলি : 'এতে আমারও কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।'

সিনেটর কামিন্স : 'সত্যিই তো! এখানে ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।'

এরপর ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে এই বিতর্কের ওপর আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। Simon Wolf ছিলেন এ সম্মেলনের চাক্ষুষ সাক্ষী। Abraham Lincoln হতে Woodrow Wilson পর্যন্ত প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের সময়কালে Simon Wolf ইহুদিদের একজন সক্রিয় এজেন্ট হয়ে কাজ করেছেন। যেকোনো প্রশাসনিক ইস্যুতে তিনি ইহুদিদের পক্ষে কথা বলেছেন। Senator Dillingham উক্ত সম্মেলনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি তাদের জাতিতাত্ত্বিক বিতর্কের ওপর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। নিচে তা উপস্থাপন করা হলো–

মি.উলফস : 'আমরা একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতে চাই– যদি কোনো ইহুদি রাশিয়া হতে আসে, তবে সে রাশিয়ান। যদি রোমানিয়া হতে আসে, তবে রোমানিয়ান। যদি ফ্রান্স হতে আসে, তবে ফরাসি। যদি কেউ ইংল্যান্ড হতে আসে, তাহলে ইংরেজ। জার্মানি থেকে এলে জার্মান। তবে তাকে হিব্রু বা ইহুদি বলে সম্বোধন করা যাবে না।'

সিনেটর লডস : 'এর মধ্য দিয়ে কি আপনি স্বীকার করছেন, আপনাদের কোনো জাতীয় পরিচয় নেই?'

মি.উলফস : 'কীভাবে?'

সিনেটর লডস : 'আপনি কি বলেননি– ইহুদি শব্দটি কোনো জাতীয়তার পরিচয় বহন করে না?'

মি.উলফস : 'আমি গত ৩০ বছর Union of American Hebrew Congregations-এর মুখপাত্র হয়ে কাজ করছি। এই জাতিতাত্ত্বিক বিতর্ক নিয়ে আমি এ পর্যন্ত ইহুদিদের প্রভাবশালী বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন Dr. Cyrus Adler। তিনিও বলেছেন– "এই শব্দটি কোনো জাতিতত্ত্বের পরিচয় বহন করে না।"

সিনেটর লডস– Cyrus Adler-এর কথা উল্লেখ করে ভালো করেছেন। আমি নিজেও Jewish Encyclopedia-এর প্রারম্ভিক বিবৃতিতে তার স্বাক্ষর দেখেছি। সেখানে অন্যান্য অনেক বিবৃতির মধ্যে এটাও উল্লেখ ছিল–

> "সমস্যার সূত্রপাত হয় তখন থেকে, যখন ইহুদিরা নিজেদের জাতিগত পরিচয় পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে। ইহুদি হিসেবে জন্ম নিয়েও আজ তারা জাতিগতভাবে নিজেদের এই পরিচয় দিতে নারাজ। কিন্তু বিতর্ক যখন জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে, তখন কোনোভাবেই ইহুদিদের এই পরিচয় মুছে দেওয়া সম্ভব নয়।"'

এরপর Joseph Jacobs আরও উল্লেখ করেন–

> 'প্রাচীনকাল থেকে তারা এক ও অভিন্ন জাতি হিসেবে বসবাস করে আসছে। তাদের সমানে যে বিপর্যয়ই আসুক না কেন, তারা নিজেদের অভিন্ন জাতিসত্তা টিকিয়ে রেখেছে।' এরপরও আপনি কীভাবে বলছেন, এটি ইহুদিদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় বহন করে না?'

মি.উলফস : 'আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করেছি। আমি যা বলতে চাই, তার সবই Jewish Encyclopedia-তে আছে।'

সিনেটর লডস : 'তাহলে Benjamin Disraeli সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?'

মি.উলফস : 'জন্মসূত্রে তিনি একজন ইহুদি।'

সিনেটর লডস : 'কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও কি তিনি ইহুদি ছিলেন?'

মি.উলফস : 'না, ধর্মীয়ভাবে তার ইহুদিত্ব শেষ হয়ে গেছে।'

সিনেটর লডস : 'আহ! ধর্মীয়ভাবে একজন ইহুদি হিসেবে তিনি নিজেকে নিয়ে অনেক গর্ব করতেন এবং সবাইকে তা বলে বেড়াতেন, কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন করার কারণে কি তার জাতীয় পরিচয় বদলে যাবে?'

মি.উলফস : 'আমি বলছি না– ধর্ম পরিবর্তন করার দরুন তার জন্মগত পরিচয় বদলে গেছে। জন্মসূত্রে তিনি একজন ইহুদি এবং সবাই তাকে Heine ও Borne বলে সম্বোধন করে, কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার এই পরিচয় শেষ।'

সিনেটর লডস : 'তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হলো– ইহুদি বা হিব্রু কোনোটাই আপনাদের জাতীয়তার সঠিক পরিচয় বহন করে না।'

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে করা আদমশুমারিতে আমেরিকার জনসংখ্যাকে ৪৬টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। ফলে প্রতিটি জাতিকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন : উত্তরাঞ্চলীয় ইতালিয়ানদের আলাদা করা হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলীয় ইতালিয়ানদের থেকে। মরাভিয়ানদের (Moravians) আলাদা করা হয়েছে বহেমিয়ানদের (Bohemians) থেকে। স্পেনিশ-আমেরিকানদের আলাদা করা হয়েছে স্পেনিশ ইউরোপিয়ানদের থেকে, কিন্তু ইহুদিদের কোনোভাবে আলাদা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তাদের জন্য পৃথক কোনো শ্রেণি করা হয়নি। তারা ব্যতীত আর কেউ এই আদমশুমারিতে আপত্তি জানায়নি। রিপোর্ট প্রকাশকালে উল্লেখ করা হয়–

> 'জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে আদমশুমারি করা হয়েছে, তা আমেরিকায় বসবাসরত প্রতিটি অধিবাসী আনন্দচিত্তে মেনে নিয়েছে; শুধু একটি জাতি ছাড়া।'

জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে ইহুদিদের মন্তব্য

'আজ আপনাদের এমন এক রাষ্ট্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, বর্তমানে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে তা দ্রুতই বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিতে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক নানা কারণে এই রাষ্ট্রের বংশধরদের অসংখ্য শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। চাইলে রাষ্ট্রটির পূর্বে বিশেষণ হিসেবে "ইহুদি" যোগ করতে পারেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন– এ রাষ্ট্রটির পূর্ণরূপ কী হতে পারে!' -THEODOR HERZL

'আসুন আমরা সবাই এ সিদ্ধান্তে একমত হই, ইহুদিবাদ একটি পৃথক জাতিসত্তা। দেশ, পেশা, অবস্থান ও পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, সবাই তার সদস্য' - LOUIS D. BRANDEIS

Justice of the United States of Supreme Court.

Louis D. Brandeis হলেন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি এবং জায়োনিস্ট আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য। তার ভাষ্য অনুযায়ী–

> 'রাবাই পরিষদ এবং গণ্যমান্য আরও অনেকের ভাষ্য অনুযায়ী– যারা প্রকাশ্যে নিজেদের ইহুদি বলে স্বীকৃতি দেয় এবং ধর্মীয় সব অনুশাসনের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, কেবল তারাই এই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে কাউকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যা দ্বারা নিজেদের পছন্দসই একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে নেবে। একটি সঠিক ও কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন কাজ।

শরীরে 'ইহুদি রক্ত' প্রবাহিত হচ্ছে- এমন প্রতিটি ব্যক্তি এই সমস্যার সম্মুখীন। কিছু ধর্মীয় বয়ান দিয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বললেই এই সমস্যার সমাধান হবে না।' (Zionism and the American Jews)

Rev. Morris Joseph হলো, West London Synagogue of British Jews-এর একজন সদস্য। এবার তার ভাষ্য অনুযায়ী-

'নিঃসন্দেহে ইজরাইল একটি মহান জাতি। রাষ্ট্র হিসেবে এটি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, তা এর নাম থেকেই বোঝা যায়। যেনতেন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাম বহন করা কখনো সম্ভব নয়। ইজরাইল এমন একটি জাতির পরিচয় বহন করে, যারা নিজ স্বার্থে সামান্য ভুলটুকুও করতে রাজি নয়। সুতরাং, ইহুদিদের জাতীয়তা অস্বীকার করার অর্থ হলো ইজরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।' (Israel a Nation)

Aurther D. Lewis হলেন West London Zionist Association-এর একজন সদস্য। তার ভাষ্য অনুযায়ী-

'অনেকে এমন মন্তব্য করেন, রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টেন্টদের মতো ইহুদিরাও একটি স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী। তাদের ব্যাপারে বলছি- কীভাবে পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে হয়, তা আপনারা এখনও শেখেননি। যদি কোনো ইহুদি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে অনেকেই বলবে ধর্ম পরিত্যাগ করার দরুন সে আর এই গোত্রের সদস্য নয়। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব; যখন তার রুচিধারা ও চিন্তা-চেতনায় এখনও ইহুদিবাদিত্ব বিদ্যমান!' (The Jew a Nation)

Bertram B. Benas একজন বিখ্যাত অ্যাডভোকেট। তার ভাষ্য অনুযায়ী-

'ইহুদি সত্তা দ্বারা মূলত একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হচ্ছে। Israelites, Jews, Hebrews প্রতিটি পদবি এই স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীটির ঐতিহাসিক পরিচয় বোঝানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো যে তাদের ধর্মীয় পরিচয় বহন করছে, তা কিন্তু নয়।' (Zionism: The National Jewish Movement)

Leon Simon একই গোত্রের একজন বিখ্যাত লেখক ও পণ্ডিত। ধর্ম ও জাতীয়তা নিয়ে চলমান বিতর্কের অবসানকল্পে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি গবেষণা চালান। পরবর্তী সময়ে এই গবেষণার ফলাফল নিয়ে তিনি 'Religion and Nationality' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং 'Studies in Jewish Nationalism' খণ্ডে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। তিনি একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলেন- 'ধর্মই তাদের জাতীয়তার পরিচয় বহন করে এবং জাতীয়তা হলো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

Simon বলেন– 'অন্যান্য সব ধর্মের মতো আমাদেরও স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও অনুশাসন আছে, যা আমাদের মেনে চলা উচিত।' এবার তার প্রকাশিত প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো–

> 'মসিহের যুগে ইহুদিরা বিশ্বজুড়ে শুধু শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধই প্রতিষ্ঠা করবে না; তারা স্বীয় ঈশ্বর এবং নিজ ধর্মের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যও প্রকাশ করবে। এর মাধ্যমে আমাদের জাতির শ্বাশত অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে। এই ধর্মীয় বিশ্বাস সামান্য কিছু ধর্মীয় বই ও গির্জায় যাওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়; এ জন্য অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতিটি বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন।' (p. 14)
>
> 'ব্যক্তিগত পাপ মোচন এবং আত্মার পরিশুদ্ধি লাভের উপায় হিসেবে আমাদের তেমন কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, যেমনটা খ্রিষ্টানদের দেওয়া হয়েছে। ইহুদিতন্ত্র বোঝায় জাতীয় ঐক্য ও একাত্বতা, যার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং যেকোনো মূল্যেই হোক– আমাদের এ জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে।' (p. 20)
>
> 'ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মতো আমরাও যে একই শ্রেণির স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।' (p. 34)

Gratez একজন বিখ্যাত ইহুদি ঐতিহাসিক। তার ভাষ্য অনুযায়ী–

> 'নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েও আজ পর্যন্ত আমরা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখেছি। কেবল ধর্মমত ও সিনাগগের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকলে এই ঐক্য এত দিন পর্যন্ত টিকত না। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য যেনতেন কিছু ধর্মীয় অনুশাসন ও সিনাগগের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি।'

Moses Hess তাদেরই একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, যার কল্যাণে ইহুদিদের বহু প্রাচীন ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে। 'Rome and Jerusalem' শিরোনামে তিনি একটি বই লিখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন–

> 'ইহুদিবাদের অর্থ হলো– এ ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।' (p. 61)
>
> 'যদি সত্যিই আমরা একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতের অনুসারী হতাম, তবে বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতির সাথে নিজেদের জড়িত করার অনুমতি পেতাম না। এ জাতীয় কাজে অংশগ্রহণ করার কারণে আমাদের সাম্প্রদায়িকভাবে বহিষ্কার করা হতো। এ সমস্যার সমাধানকল্পে বলতে চাই– আমরা যেমন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের একটি অংশ, তেমনি একটি স্বতন্ত্র জাতিও।' (p. 71)

'এই ধর্মে পরিত্যাগের কিছু নেই। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তবুও সে একজন ইহুদি এবং সমাজ থেকে তাকে বর্জন করা হয়নি। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে সে নাহয় তার ধর্মীয় পরিচয় পালটে ফেলেছে, কিন্তু জাতীয় পরিচয় কীভাবে পালটাবে?' (p. 97-98)

১৯২০ সালে Zionist Organization of America ইহুদিতন্ত্র ও জায়োনিজমের ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এ গ্রন্থের একজন উল্লেখযোগ্য রচয়িতা E. Sampter-এর ভাষ্য অনুযায়ী–

'ইহুদিতন্ত্র নামকরণ হয়েছে জাতিসত্তার ইতিপরিচয় থেকে। একজন ধার্মিক ব্যক্তির ন্যায় অধার্মিক ব্যক্তিও এই গোত্রের সদস্য হবেন। হয়তো সে ধর্মীয় কাজগুলো নিয়মিত পালন করছে না, কিন্তু তার জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন থেকে থাকবে।' (Guide to Zionism, p. 5)

ইহুদিদের জাতীয় পরিচয়ের মূলভিত্তি সম্পর্কে Louis D. Brandeis বলেন–

'এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যার ওপর ভিত্তি করে বলতে পারি– আমাদের জাতীয়তা কলুষিত হয়েছে এবং রক্তে জ্যান্টাইলদের ধারা প্রবেশ করেছে। গত তিন হাজার বছরের পরিক্রমায় হয়তো জ্যান্টাইলদের কিছু পরিমাণ রক্ত আমাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেছে। যাযাবর জাতি হওয়ার দরুন আমরা কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। এরপরও আমাদের মাঝে জ্যান্টাইলদের রক্ত খুব কমই প্রবেশ করেছে। এমন কোনো ইউরোপীয় জাতি নেই, যারা আমাদের মতো জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।'

Aurther D. Lewis তার লেখা বই *The Jews a Nation*-এ ইহুদিদের জাতীয়তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

'জাতীয়তাবোধের জন্য আমাদের খুব সহজেই অন্য যেকোনো জাতি থেকে আলাদা করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, একজন ইহুদির দিকে তাকালেই আপনি তার পরিচয় বুঝে ফেলবেন, কিন্তু একজন ইংরেজের দিকে তাকালে নাও বুঝতে পারেন, আদৌ সে ইংরেজ না ফরাসি।'

Moses Hess জাতীয়তার পরিচয় প্রদানে ইহুদিদের শারীরিক গঠন তুলে ধরেছেন–

'ইহুদিরা বংশ পরম্পরায় যে শারীরিক গঠন পেয়ে এসেছে, চাইলেও তা কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন : ইহুদিদের কেউ তার নাকের গঠন পরিবর্তন করতে পারবে না অথবা কালো কোকড়ানো চুলের গঠন থেকেও

> বেরিয়ে আসতে পারবে না। হাজারবার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালেও তা সোজা করা সম্ভব নয়। আমাদের শারীরিক গঠন অন্য যেকোনো জাতি-গোষ্ঠী থেকে আলাদা। আমরা যেভাবে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছি, তা আর অন্য কোনো জাতি বজায় রাখতে পারেনি।'

আশা করি– এ পর্যন্ত যা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা পাঠকদের নিকট যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। ইহুদিদের জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম যে দুটি পৃথক বিষয়, তার আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। Benjamin Disrael ছিলেন একজন বিখ্যাত ইহুদি রাজনীতিবিদ। আঠারোশো শতাব্দীতে তিনি দুইবারের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশেষ কিছু দক্ষতার জন্য রানি ভিক্টোরিয়া তাকে '1st Earl of Beaconsfield' উপাধিতে ভূষিত করেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপরও তিনি নিজেকে ইহুদি বলে পরিচয় দিতেন এবং এ নিয়ে বেশ গর্বও করতেন।

অনুরূপ আরও একজন হলেন Otto Hermann Kahn। তিনিও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপরও তার সমগোত্রীয় জ্ঞাতি ভাইয়েরা তাকে ইহুদি ব্যতীত অন্য কিছু বলতে নারাজ। ওপরন্তু ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের অন্যতম পরিকল্পনাকারী Jacob H. Schiff-এর চোখে তিনি হলেন 'প্রিন্স অব ইজরাইল'।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, ইহুদিবাদ নিছক কোনো ধর্মীয় উপাধি নয়, যা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কোনো ইহুদি সদস্য কেবল ইজরাইল জাতির স্বার্থে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে, তবে তার জাতিগত পরিচয় পরিবর্তিত হবে না।

১৮৬২ সালে, *Rome and Jerusalem* বইটির প্রারম্ভিক অংশে লেখক Moses Hess উল্লেখ করেন–

> 'কোনো বিচক্ষণ জাতি এই সত্যটি অস্বীকার করবে না যে, সামনের দিনগুলোতে ইউরোপকে চরম রাজনৈতিক ভগ্নাবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং নিজেদের স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে।'

এ কথার দ্বারা তিনি মূলত ইউরোপকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সংখ্যায় কম হওয়ায় ইহুদিদের দুর্বল জাতি বলে মনে করা যে কতটা মারাত্মক ভুল হতে পারে, তিনি সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে Dr. J. Abelson বলেন–

> 'আকারে ছোটো হলেও ইহুদিরা অন্য সব জাতির মতো যেকোনো বিষয়ে সমান অধিকার রাখে; যেমনটা রাখে পোলিশ, রোমানিয়ান এবং সাইবেরিয়ানরা।'

একই সুরে Justice Brandies বলেন–

> 'প্রতিটি জাতি আজ নিজেদের পুনর্বাসন নিয়ে ব্যস্ত। একটি ছোটো জাতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা শেষ বিশ্বযুদ্ধ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য সব জাতি নিজেদের জন্য যে অধিকার দাবি করে, আমরাও তা সমানভাবে দাবি করার যোগ্যতা রাখি।'

Moses Hess বলেন–

> 'প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের দেশগুলোতে যেমন : রাশিয়া, পোল্যান্ড, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়াতে এখনও লাখ লাখ ইহুদি বসবাস করছে, যারা প্রতিদিন বিভিন্ন কাজের ফাঁকে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া রাজত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। তাদের এই প্রার্থনা কখনো বিফলে যাবে না।'

তাদের জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে বিতর্ক আগের অধ্যায়ে জন্ম নিয়েছে, তা পরিষ্কার করা সম্ভব হতো না– যদি না এসব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হতো। তবে তাদের ধর্ম ও জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে জ্যান্টাইলদের মাঝে যে বিভ্রান্তি, তার সুরাহা কিন্তু এখনও হয়নি। কীভাবে একজন ইহুদি অন্য ধর্ম গ্রহণ করার পরও ইহুদি থাকতে পারে, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না মেলা পর্যন্ত এই বিভ্রান্তির কোনো সুরাহা হবে না। মূলত ইহুদিদের দুমুখো নীতির কারণে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, সত্যই তা বোঝা কঠিন।

ইহুদিদের ধর্ম ও জাতিতত্ত্বের প্রকৃত পরিচয়

অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মনে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে– প্রাচীন যে বনি ইজরাইল জাতির কথা বিভিন্ন পুরানে পাওয়া যায়, তাদের অপর নাম ইহুদি। বিভ্রান্তির সূচনা আসলে এখান থেকেই। প্রকৃতপক্ষে সকল ইহুদি ইজরাইলি হলেও, সকল ইজরাইলিকে ইহুদি বলা যাবে না।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে– 'পয়গম্বর আব্রাহামের পৌত্র জ্যাকবের ১২ জন পুত্র ছিল। একত্রে তাদের বলা হতো বনি ইসরাইল। তাদের নাম রুবেন, সাইমন, লেভি, দান, নাফতালি, গাদ, আশের, ইসাখার, জেবুলন, জোসেফ, জুদাহ (Judah) ও বেনজামিন। তাদের সবাইকে বনি ইসরাইল ছাড়া আরও একটি নামে সংজ্ঞায়িত করা হতো– হিব্রু।

তারা ছিল সৃষ্টিকর্তার বিশেষ আশীর্বাদপূর্ণ একটি জাতি। ফলে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এসেছে অসংখ্য পয়গম্বর। বাইবেল এবং অন্যান্য পুরাণে উল্লিখিত গল্পসমূহ যেমন : তাদের মিশরে গমন, ফেরাউন কর্তৃক নির্যাতন, মোজেসের জন্মগ্রহণ, লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে সিনাই পর্বতে অবস্থান ইত্যাদি ঐতিহাসিক গল্প আমরা সবাই জানি।

১৯৯৪ সালে লেখক Israel Shahk ইহুদি জাতির ইতিহাস নিয়ে একটি বই রচনা করেন, যার নাম *Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years*। নিচের আলোচিত অংশটুকু বইটি থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হলো :

> 'বাইবেলের হিসাব অনুযায়ী মিশরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে তারা সিনাই উপত্যকা পাড়ি দিয়ে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। এর প্রায় ৪৫০/৫০০ বছর পর রাজা ডেভিড প্রথমবারের মতো জেরুজালেমকে শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরলোক গমনের পর তার পুত্র সলোমন ইজরাইলকে প্রথমবারের মতো নামরাষ্ট্র হিসেব প্রতিষ্ঠিত করেন। বনি ইজরাইলের ১২ পুত্রের নাম অনুযায়ী সেই রাষ্ট্রে ১২টি প্রদেশ করা হয়। রাজা সলোমনের শাসনামলে এই রাষ্ট্র বেশ ভালোভাবেই চলছিল। তবে তার পরলোক গমনের পর এই রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর দিকের ১০টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় 'Kingdom of Israel' এবং দক্ষিণের অবশিষ্ট দুটি প্রদেশ (জুদাহ ও বেনজামিন) নিয়ে গঠিত হয় Kingdom of Judah।
>
> উত্তরাঞ্চলীয় ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে প্রথমে নির্ধারিত হয় শিখিম (Shechem) এবং পরে সামারিয়া (Samaria)। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলীয় জুদাহের রাজধানী নির্ধারিত হয় জেরুজালেম। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে (আনুমানিক ৭২২ খ্রিষ্টপূর্ব) অ্যাসিরিয়ান সাম্রাজ্য উত্তরাঞ্চলীয় ইজরাইল সম্পূর্ণ দখল করে নেয় এবং সেখানে থাকা ১০টি গোত্রের সবাইকে নির্বাসিত করে। তারা সেই যে হারিয়ে গেছে, আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৮৬ সালে) ব্যবিলনীয়ানরা জুদাহ আক্রমণ করে প্রথম টেম্পল ধ্বংস এবং সেখানে থাকা দুটি গোত্রের বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বন্দি করে।'

আশা করি পাঠকদের মনে আছে, শুরুর দিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বলা হয়েছিল– ব্যাবিলনের বন্দি থাকা অবস্থায় এই জাতিগোষ্ঠীটি নিজেদের মধ্য হতে একজন রাজা নির্বাচন করে, যার অনুশাসন মেনে চলা তাদের সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এই রাজাকে বলা হতো Exilarch। তিনি বন্দিদের মানসিক বন্ধন মজবুত করার জন্য এক ধর্মীয় চেতনার জন্ম দেন, যা ছিল আব্রাহাম-জ্যাকব-মোজেসদের ধর্মীয় চেতনা থেকে অনেকটা ভিন্ন। এর কয়েক দশক পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে ব্যবিলন সাম্রাজ্য আখেমেনিডদের দ্বারা পরাজিত হলে জুদাহের অধিবাসীরা বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়।

তারা আবারও জেরুজালেমে ফেরে এবং দ্বিতীয় টেম্পল নির্মাণের কাজ শুরু করে। একই সঙ্গে নতুন জন্ম নেওয়া ধর্মীয় চেতনাকে নিজেদের মাঝে জিইয়ে রাখে। ধীরে ধীরে এই অনুশাসন তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মে রূপ লাভ করে, যাকে তাদের জাতিগত নাম অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা হয়। অর্থাৎ জুদাহ (Judah) থেকে জুদাইজম (Judaism)।

তবে নতুন এই ধর্মের সাথে আব্রাহাম-জ্যাকব-মোজেসদের ধর্মীয় চেতনার কিছু কিছু অংশের সাথে যথেষ্ট মিল আছে। তারা উভয়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তথাপি ওল্ড-টেস্টামেন্ট অনুশাসন তাদের জীবনধারায় কতটুকু গুরুত্ব বহন করে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, ওল্ড-টেস্টামেন্ট না এসেছে জুদাইজমের জন্য, আর না সৃষ্টিকর্তা তাদের জন্য পৃথক কোনো ঐশী গ্রন্থ পাঠিয়েছেন।

২০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে জুদাহ রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে নতুন এক ধর্মীয় গ্রন্থের প্রচার হওয়া শুরু করে। তার নাম তালমুদ (Talmud)। তালমুদের রয়েছে দুটি অংশ : একটি মিশনা (Mishna), অপরটি গ্যামারা (Gemara)। বিভিন্ন রাবাইয়ের অসংখ্য মৌখিক বাণীর লিখিতরূপ হলো মিশনা এবং তার ব্যাখ্যাসমূহ রয়েছে গ্যামারাতে। আদৌ কি এই তালমুদ সৃষ্টিকর্তা কোনো পয়গম্বরের মাধ্যমে জুদাহবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সংশয়। তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু ইতিহাসবিদ, যেমন Benjamin Freedman বলেছেন–

> 'এই তালমুদ কখনো সৃষ্টিকর্তার বাণী হতে পারে না। এই তালমুদ যেকোনো পাঠক নিজ উদ্যোগে পাঠ করতে শুরু করলেই বুঝবেন, এটা কেন সৃষ্টিকর্তার বাণী হতে পারে না।'

ইহুদিদের ধর্ম ও জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে যে বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে, এবার সে প্রসঙ্গে আশা যাক। ব্রিটিশ, পর্তুগিজ, পোলিশ, রুশ ইত্যাদি যেমন ব্রিটেন, পর্তুগাল, পোল্যান্ড এবং রাশিয়ার অধিবাসীদের জাতীয় পরিচয় বহন করে, তেমনি 'ইহুদি' শব্দটি জুদাহ রাজ্যের (Kingdom of Judah) অধিবাসীদের জাতীয় পরিচয় বহন করে। তবে ৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে যেহেতু এই রাজ্যের আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাই তারা বংশ পরম্পরায় এই জাতীয়তাকে টিকিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ ইহুদি পিতা-মাতার ঔরসজাত সন্তানরা সবাই জুদাহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। এই জাতীয়তা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া; সম্পত্তির ভিত্তিতে নেয়। এখন ব্রিটেন বা পর্তুগালে বসবাসরত কোনো অধিবাসী খ্রিষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও যেমন তার জাতিগত পরিচয় ব্রিটিশ বা পর্তুগিজ মুছে যাবে না, ঠিক তেমনি জুদাহ রাজ্যের কোনো অধিবাসী জুদাইজম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে তার জাতিগত পরিচয় 'ইহুদি' মুছে যাবে না। ঠিক এ কারণে আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে– Benjamin Disraeli ও Otto Hermann Kahn জীবনের একটা পর্যায়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তারা নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করতেন।

তাহলে এই অংশে প্রমাণিত হলো– জাতীয়তার ভিত্তিতে আমেরিকায় যে আদমশুমারি করার প্রস্তাবনা উঠেছিল, তাতে ইহুদিদের একটি জাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করায় কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু তারা ধর্মকে সেখানে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছে।

(বি.দ্র. তবে ইসলামি ধর্ম মতে, পয়গম্বর মূসা (আ.)-এর অনুসারী সবাইকে বলা হয় ইহুদি। এর সূচনা হয়েছিল পয়গম্বর ইয়াকুব (আ.)-এর বনি-ইসরাইল জাতির মধ্য দিয়ে।)

অ্যান্টি-সেমিটিজম কী? শুরুর দিকে একটি অধ্যায়ে এ বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। জেনে রাখা উচিত, সেমেটিক দ্বারা একগুচ্ছ ভাষাকে বোঝানো হয়। যেমন : হিব্রু, আমহারিক, তিগরিনিয়া, আরবি, আরামাইক ইত্যাদি। যারা এ সকল ভাষায় কথা বলে, তাদের বলা হয় সেমাইট। অর্থাৎ যারা এ সকল ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে থাকে, তাদের বলা হয় অ্যান্টি-সেমাইট; এখানে ধর্ম কোনো মুখ্য বিষয় নয়।

মুসলিম ও খ্রিষ্টানরাও নিজেদের সেমাইট বলে পরিচিতি দিতে পারে, যদি তাদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর যেকোনো একটি হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে পুনঃগঠিত ইজরাইল বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি ইহুদিদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে; হোক তা সত্য বা মিথ্যা, তবে তার ওপর অ্যান্টি-সেমাইট লেবেল চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা সম্পূর্ণ মনগড়া মতবাদ।

আজকের পৃথিবীতে যে এত মিলিয়ন মিলিয়ন ইহুদির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তারা কি আদৌ জুদাহ রাজ্যের প্রকৃত ঔরসজাত সন্তান? এ নতুন এক বিতর্কের জন্ম দেয়।

বলে রাখা উচিত, বর্তমান পৃথিবীতে যারা নিজেদের আদিম জুদাহ রাজ্যের উত্তরসূরি বলে দাবি করছে, তাদের অধিকাংশই সেই ঐতিহাসিক রাজ্যের প্রকৃত উত্তরসূরি নয়। তাদের অনেকের পূর্বপুরুষ প্রাচীন জেরুজালেমে কখনো পা পর্যন্ত রাখেনি। তাহলে তারা কীভাবে এই ভূমিকে নিজেদের বলে দাবি করছে? আর তারা যদি নকল ইহুদি হয়, তাহলে প্রকৃত ইহুদিরা কোথায়?

বিষয়টি যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি রহস্যময়। ১৯৭৬ সালে Arthur Koestler-এর প্রকাশিত বই *The Thirteenth Tribe* হতে নিচের অংশটুকু তুলে ধরা হলো :

> 'আপনাদের অনেকেই আছেন যারা খাজারিয়ান (Khazarian) সাম্রাজ্যের কথা জানেন না। মধ্যযুগের শুরু থেকে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা ককেশাস পর্বতমালার অববাহিকায় বসবাস করত। কৃষ্ণসাগর থেকে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্যন্ত সরু অঞ্চলটি এবং উত্তরের বিশাল সীমানাজুড়ে ছিল তাদের সাম্রাজ্য। তারা ছিল মধ্যযুগের অতীব শক্তিশালী একটি সাম্রাজ্য, কিন্তু তারপরও তাদের নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না।
>
> টার্কিশ, হান, পেশেনেগ এবং আরও অনেক জাতির সমন্বয়ে এই সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম খুব দ্রুত পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরলেও এই অংশে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। রুশ ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য

সেকালে প্রচণ্ড প্রতাপশালী হওয়ার পরও খাজারিয়ানদের কর দিয়ে পারস্পরিক বাণিজ্য করত। শুরুতে তারা জাতি হিসেবে পেগান হলেও দশম শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক কিছু কারণে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। সবশেষে মোঙ্গলদের আক্রমণে তারা সাম্রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়। এরপর তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আজকের পৃথিবীতে তারা আস্কেনাজি ইহুদি নামে পরিচিত এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে প্রাচীন জুদাহ রাজ্যের ইহুদিদের বহু আগেই অতিক্রম করেছে।

প্যালেস্টাইন পুনঃদখলের লক্ষ্যে জায়োনিস্টদের যে আগ্রাসন, তার প্রথম আহ্বান তাদের মধ্য থেকেই আসে। নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় যে ইজরাইলিদের নাম দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই এই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে তারা কীভাবে এতটা ধূর্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে, তা নিয়ে এ পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে। অধিকাংশ গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, তাদের সাথে সাধারণ মানুষের শারীরিক গঠন-প্রকৃতিতে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য।'

জুদাইজম (Judaism) যেভাবে ইহুদিবাদে (Jews) রূপ নিল।

পূর্বের অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে– জুদাহ রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের মাঝে যে ধর্মীয় চেতনার জন্ম দিয়েছে, পরবর্তী সময়ে তা-ই জুদাইজমে (Judaism) রূপ লাভ করেছে। কিন্তু তা কীভাবে 'ইহুদিবাদ' (Jew) শব্দে রূপায়িত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিষয়টি অনেক জটিল, তবে এই জটিলতার অনুসন্ধান করা অতীব জরুরি। কারণ, এর পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক রহস্যময় ধাঁধার সমাধান।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত Benjamin H. Freedman-এর লেখা বই *Facts Are Facts* এই পুরো অনুসন্ধানে আমাদের বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। নিচের পুরো আলোচনা এ বইটির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হলো :

যিশুর জীবদ্দশায় Pontius Pilate ছিলেন প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত রোমান সাম্রাজ্যের একজন গভর্নর। তার কাজ ছিল কর সংগ্রহ করা এবং তা রোমান রাজার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া। স্থানীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজের অংশ ছিল না। তারপরও যিশুর ক্রুশবিদ্ধের কাজটি তার তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়। তাকে যে ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল, তার ওপর ল্যাটিন ভাষায় লিখা ছিল– 'Iesus Nazarenus Rex Iudeorum' যার অর্থ 'Jesus of Nazarene Ruler of the Judeans'।

'যিশুর জীবদ্দশায় আধুনিক প্যালেস্টাইনকে তখন বলা হতো 'Iudaea'। অর্থাৎ, সে অঞ্চলের সকল অধিবাসীকে বলা হতো 'Iudaeus', যার বহুবচন হলো 'Iudaeorum'। ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'Judeans'।

'গসপেল অব জন' সর্বপ্রথম গ্রিক ভাষায় লেখা হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে St. Jerome সর্বপ্রথম নিউ টেস্টামেন্টকে গ্রিক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন, তবে তিনি সব বাক্য ও শব্দের ল্যাটিন অনুবাদ করেননি। অনূদিত ভার্সনটিতে তখনও অনেক গ্রিক শব্দের উপস্থিতি ছিল। কারণ, সেই শব্দগুলোর সঠিক ল্যাটিন ভাষান্তর করা সম্ভব হচ্ছিল না।

পঞ্চম শতাব্দী থেকে বাইবেল শ'খানেক ভাষায় অনূদিত হয়। তবে ল্যাটিন ভার্সনটি ছিল খুবই প্রভাবশালী। এরপর বিভিন্ন ভাষায় পূর্বে প্রকাশিত অনূদিত টেস্টামেন্টের পরিমার্জিত ও সংশোধিতরূপ প্রকাশ হতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষায় যে টেস্টামেন্ট প্রকাশিত হয়, তা ছিল ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Douai-Rheims এবং ১৬১১ সালে প্রকাশিত King James ভার্সন দুটির অনূদিত রূপ।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৭৫ সালে) প্রকাশিত ইংরেজি ভার্সনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। বাইবেলের ইতিহাসে ইহুদি (Jew) শব্দটি প্রথমবারের মতো এই ভার্সনটিতে সংযোজন করা হয়। এর আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বাইবেল বা টেস্টামেন্টের ভার্সন প্রকাশিত হয়েছে, তার একটিতেও ইহুদি (Jew) শব্দের উল্লেখ ছিল না। (পাঠকদের এ অংশটি বোঝার জন্য বাংলা 'ইহুদি' শব্দটির পরিবর্তে ইংরেজি Jew শব্দটি বেছে নিতে হবে।)

এমনকী পূর্বেকার প্রকাশিত সাহিত্যিক রচনগুলোতেও Jew শব্দটির উল্লেখ ছিল না। যেমন : শেক্সপিয়ারের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* উল্লেখ ছিল– 'What is the reason? I am a Iewe (Jew); hath not Iewe (Jews) eyes?"

ষোড়োশ শতাব্দীতে ইংরেজিতে প্রকাশিত গসপেলের ১৯ : ২১ শ্লোকটি হলো– 'Do not inscribe– the noarch of the Judeans (Ioudaios), but that He himself said I am monarch of the Judeans (Ioudaiso)।' অর্থাৎ এখানে জুদানদের ধর্মযাজকরা পিলাতকে বলেন– "এখানে জুদানদের রাজা না লিখে তার পরিবর্তে লেখ– এই লোক বলেছে, আমিই জুদানদের রাজ।'

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে প্রতিটি 'Judeans' শব্দকে পালটে 'Jews' করে দেওয়া হয়। ল্যাটিন শব্দ 'Iudaeus' থেকে যেভাবে 'Jew' শব্দের বিবর্তন হলো, তার একটি ধারা উপস্থান করা যাক : Gyu> Giu> Iu> Iuu> Iuw> Ieuu> Ieuy> Iwe> Iow> Iewe> Ieue> Iue> Ive> Iew> Jew.

ভাষাবিদরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, ইংরেজি একটি মিশ্র ভাষা। এটি প্রাচীন অ্যাংলো-সেক্সন ভাষাটি বহুজাতিক ভাষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। অ্যাংলো-সেক্সনরা ব্রিটেনে অনুপ্রবেশ করলে স্থানীয়দের মাঝে বহুবিধ মিশ্র ভাষা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করে। সে ধারা আজও অব্যাহত আছে। ভাষা শিক্ষার্থীরা স্বীকার করবে– ল্যাটিন বর্ণ 'J' যখন কোনো শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন তার উচ্চারণ ইংরেজি বর্ণ 'Y'-এর মতো হয়। যেমন : Yes ও Youth।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ইংরেজি বর্ণ 'J' যদি কোনো শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হতো, তখন তার উচ্চারণ হতো ঠিক 'Y'-এর মতো। অর্থাৎ 'J'-এর উচ্চারণগত বিবর্তন খুব সমসাময়িক একটি ঘটনা। অপরদিকে, জার্মান ভাষায় আজও ল্যাটিন উচ্চারণরীতি বজায় রয়েছে। জার্মান ভাষায় 'J' বর্ণটি ইংরেজি বর্ণ 'Y'-এর মতো উচ্চারিত হয়। তাহলে জার্মান ভাষায় 'Jude' শব্দটির উচ্চারণ অবিকল ল্যাটিন শব্দ 'Iudae'-এর মতো হয়। এই 'Jude' শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন পরবর্তী সময়ে রূপ নিয়ে হয় 'Jew'। তথাপি জার্মান ভাষায় আজও এর উচ্চারণ ল্যাটিন শব্দ 'Iudae'-এর মতো। কিন্তু ইংরেজি বর্ণ 'J' যেহেতু ধ্বনিগত পরিবর্তিত হয়ে 'জ্য'-তে রূপ নিয়েছে, সেহেতু ইংরেজি ভাষার তার উচ্চারণ পালটে গিয়ে হয়েছে 'Jew (জু)' এবং 'Judea' পালটে হয় 'Judaism (জুদাইজম)'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আরেকটি বিশেষত্ব হলো– সে বছর প্রিন্টিং মেশিনের বহুমুখী ব্যবহার শুরু হয়। ফলে প্রচুরসংখ্যক বাইবেল প্রিন্ট করা শুরু হয় এবং তা অল্পমূল্যে প্রত্যেক গির্জা ও মানুষের ঘরে ঘরে পৌছাতে শুরু করে। যারা এত দিন খরচের ভয়ে বাইবেল ক্রয়ের সাহস করত না, তখন তারাও স্বল্পমূল্যে ক্রয় করার সুযোগ পায়। খ্রিষ্টানদের প্রতিটি গির্জা ও ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে শুরু হলো– 'Jesus is a Jew; Jews are god choosen people; Get blessings from Israel এবং আরও অনেক।

ধীরে ধীরে নিউ টেস্টামেন্ট রূপান্তরিত হলো ইহুদিদের প্রশংসাবাণীতে। তবে কিছু বিষয় না বললেই নয়। ইংরেজি ডিকশনারিগুলো খুললে হয়তো Jews এবং Iudaeus শব্দ দুটির অর্থ প্রায় একই দেখাবে একদল হিব্রু জনগোষ্ঠী, যারা পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধর হিসেবে একসময় জেরুজালেমে থাকত। তবে শাব্দিক অর্থ এক হলেও Jews এবং Iudaeus জাতি দুটির মাঝে বড়ো ধরনের ফাঁরাক রয়েছে।

Iudaeus দ্বারা যেখানে বোঝানো হতো যিশুখ্রিষ্টের জীবদ্দশায় প্যালেস্টাইনে বসবাসরত সকল অধিবাসীদের, সেখানে Jews দ্বারা বোঝানো হয়– জুদাহ রাজ্যের সকল উত্তরাধীদের। মাঝ থেকে বাদ পড়ে গেল ইজরাইলের বাকি ১০টি গোত্র, যারাও কিনা বনি ইজরাইলের অংশ। তাই বর্তমান যুগের বাইবেল পাঠ করলে মনে হবে, কেবল Jews-রাই প্রাচীন ইজরাইলের প্রতিনিধিত্বকারী এবং এটিই বনি ইজরাইলের অপর একটি নাম। ঠিক এ কারণে বিশেষ এই ধারণাটি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মনে বধ্যমূল হয়ে চেপে বসেছে।

এরপরও একটি গল্প বাকি থেকে যায়। প্রাচীন যে খাজারিয়ান সাম্রাজ্যের কথা পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তারা মধ্যযুগের কোনো একটি সময়ে রাজনৈতিক কারণে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। আর এরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে জুদাহ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বহু আগেই অতিক্রম করে ফেলেছে। আজ ইজরাইল, আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে যে পরিমাণ ইহুদি দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই প্রাচীন জুদাহ রাজ্যের উত্তরসূরি নয়; বরং তারা মধ্যযুগে ধর্মান্তরিত হওয়া খাজারিয়ান রাজ্যের উত্তরসূরি।

তা ছাড়া ১৯১৭ সালের পর থেকে যে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনিদের উচ্ছেদ করে তাদের ভূমি দখল করে চলেছে, তাদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ কস্মিনকালেও এই ভূমিতে পা রাখেনি, তবুও তারা এই ভূমিকে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি এবং বাপ-দাদার আদি ভূমি বলে দাবি করে আসছে। তাদের প্রসঙ্গে Harold Rosenthal একবার বলেছিলেন– 'ইহুদিরা স্বচিত্তে বলে বেড়ায়– "আমরাই সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সম্প্রদায়।" অথচ তারা স্বীকার করতে চায় না, তাদের ঈশ্বর হলো লুসিফার (শয়তানের একটি নাম)।'

মজার বিষয় হলো– তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই, খাজারিয়ানরা ধর্মান্তরিত হওয়ার দরুন জুদাহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে, তবুও বেলফোর ঘোষণার মধ্যদিয়ে নবগঠিত ইজরাইল রাষ্ট্রকে কোনোভাবেই ইহুদিদের রাষ্ট্র বলা যাবে না। কারণ, প্রাচীন ইজরাইল গড়ে উঠেছিল ১২টি গোত্রের ভিত্তিতে। যদি ধরে নিই, আধুনিক ইহুদিদের মাঝে প্রাচীন জুদাহ ও বেনজামিনের উত্তরসূরিরা নিহিত রয়েছে, তাহলে বাকি ১০টি গোত্রের সদস্যরা কোথায়?

ইহুদিদের সমাজে আনুগত্যহীনতার চূড়ান্ত পরিণতি

আশা করি পূর্বের অধ্যায়ে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, 'ইহুদিবাদ' কেবল ধর্মীয় পরিচয় নয়; এটা একই সঙ্গে জাতীয় পরিচয়, যা ইজরাইলের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি কোনো ব্যক্তি হাজার বছরের জাতীয় ঐতিহ্য ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়– হোক তা খ্রিষ্ট বা ইসলাম– তারপরও সে ইহুদি থাকবে।

Jewish Encyclopedia অনুযায়ী– এই সমাজ ব্যবস্থার নাম হলো 'কাহাল'। এর আরও একটি নাম আছে 'সোভিয়েত'। ধর্মের প্রতি কে কতটুকু অনুগত, তা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কাহালকে অস্বীকার করে, তবে তার ইহুদিবাদিত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে সমাজ থেকে বর্জন করা হবে। সে অন্য ধর্ম গ্রহণ না করলেও কেবল 'কাহাল'-কে অস্বীকার করার কারণে ইহুদি থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ১৭ তম প্রটোকলে বলা হয়েছে–

> 'আমাদের প্রতিটি ভাইয়ের উচিত– তাদের সেইসব পারিবারিক সদসস্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যারা কাহালকে অস্বীকার করে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। হারানো রাজত্ব ফিরে পেতে এই অনুশাসন মেনে চলা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।'

কাহাল অস্বীকার করার কারণে যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা মামুলি কোনো ঘটনা নয়। নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে রক্ত বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে তারা বহু শতাব্দী যাবৎ আন্তঃবিবাহের সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখেছে।

একটা সময় ছিল, যখন ইহুদিদের কোনো সদস্য নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতো এবং পুরো সমাজ তাকে বয়কট করত। এটি ছিল কাহালভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার একটি অংশ, তবে বিংশ শতাব্দীতে আন্তঃবিবাহের প্রতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা হলেও হ্রাস পাওয়া শুরু করে। বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব লাভ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, গুপ্তচর হিসেবে অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্রীয় নানা সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে তারা বহির্বিবাহকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে।

কাহাল অস্বীকার করার কারণে যে কঠিন শাস্তি ভোগের কথা বলা হয়েছে, তা আলোচনা না করলেই নয়। উদাহরণ হিসেবে Spinoza-কে সামনে নিয়ে আসা যায়। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ইহুদি দার্শনিক, কিন্তু তিনি ইহুদি ধর্মের কঠোর সমালোচক ছিলেন। কারণ, তিনি স্বাধীন চেতনায় বিশ্বাস করতেন। তার জ্ঞান-দর্শন একসময় এই সম্প্রদায়টির জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে নিউ টেস্টামেন্টে উল্লিখিত 'Commandments of Men' সম্পর্কে তিনি যা বলতেন, তা তৎকালীন ধর্মযাজকদের সাথে মত-পার্থক্যের জন্ম দেয়। তার জ্ঞানের গভীরতা দেখে অনেক মানুষ তার অনুসারী হতে শুরু করে। তিনি যেন মুখ বন্ধ রাখেন, এ জন্য তার নিকট বড়ো অঙ্কের আর্থিক উপঢৌকনের প্রস্তাব করা হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে তারা আর্থিক উপঢৌকনকে একপ্রকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি হরহামেশাই দেখা যায়। Jacob Israel De Haan হলেন একজন বিখ্যাত ইহুদি লেখক ও ডাচ আইনবিদ। প্যালেস্টাইন ইস্যুতে আরব-ইজরাইল যে দ্বন্দের সূত্রপাত হয়, তা নিরসনের জন্য তিনি আর্থিক উপঢৌকনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন–

> 'জায়োনিস্টদের ধ্বংস করতে আরব দেশগুলো আজ উত্তেজিত। তবে তাদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক উপঢৌকনের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে। এই দুর্বলতা তাদের পরাজয় ও দীর্ঘ ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

তারা Spinoza-কে বাৎসরিক ১,০০০ ফ্লোরিন (Florins) উপঢৌকন প্রদানের প্রস্তাব করে। শর্ত হলো– তিনি ইহুদি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ধরে রাখবেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত হাজিরা দেবেন, কিন্তু তিনি ঘৃণার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রয়োজনে পশমি পোশাক তৈরি করে জীবন পার করবেন, তবুও এমন কু-প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না– বলে সাফ জানিয়ে দেন।

সমাজে জনপ্রিয়তা বেশি থাকার কারণে তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করার সাহস কারোরই ছিল না। তাই বড়ো এক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তাকে একঘরে এবং সর্ব সাধারণের সাথে যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়। অনুষ্ঠানটির অংশবিশেষ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

'অবশেষে নির্ধারিত দিনটি চলে এলো। এই ঘটনার সাক্ষী হতে প্রচুর মানুষ চারদিক থেকে জমায়েত হলো। হঠাৎ এক নির্দেশে সবাই চুপ হয়ে গেল। চারপাশ নীরব করে জ্বালানো হলো কালো রঙের মোম। তারপর উপাসনালয়ের পবিত্র স্থান থেকে "Law of Moses" গ্রন্থ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো ঘটনার মূল আনুষ্ঠানিকতা। প্রধান ধর্মীয় গুরু, যিনি একসময় Spinoza সাহেবের খুব কাছের বন্ধু ছিলেন, আজ তিনিই মূল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। বন্ধুর জন্য হৃদয়ে মায়া অনুভব করলেও আজ তাকে কঠিন রূপ ধারণ করতে হচ্ছে। উৎসাহী চোখগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ অজস্র শোকার্ত কণ্ঠে অভিসম্পাতের কীর্তন বেজে উঠল। সাথে সাথে চারদিক থেকে বেজে উঠল বাশের ভেঁপুর করুণ সুর, যা পুরো পরিবেশকে আরও মর্মস্পর্শী করে তুলল। এবার কালো মোমগুলো ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তে পূর্ণ একটি জারের ভেতর পড়তে শুরু করল।' (Lewes: Biographical History of Philosophy)

এরপর শুরু হলো চূড়ান্ত ধাপ। আদেশনামা পাঠ–

> 'উপস্থিত সকল ঋষি, দেবদূত ও গুরুজনের সম্মতিক্রমে কার্যবিধি ৬১৩ ধারা অনুযায়ী– যেখানে Joshua অভিসম্পাত করেছেন Jericho-কে এবং Elisha অভিসম্পাত করেছেন তার সন্তানদের, তার ভিত্তিতে আমরা সবাই Baruch de Spinoza-কে অভিসম্পাত করছি এবং তার সাথে সকল বন্ধন ছিন্ন করছি। তাকে অভিসম্পাত করছি দিনে ও রাতে, তার জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থার ওপর এবং তার যাবতীয় সব কাজের ওপর। স্রষ্টাও যেন তাকে ক্ষমা না করেন। স্রষ্টার ক্রোধ ও উন্মত্ততার আগুন যেন তার ওপর প্রজ্বলিত হয়। সকল অভিসম্পাতবাণী যেন তার ওপর শায়িত হয়। প্রস্ফুটিত দেবকরের উপস্থিতিতে আমরা তার ধ্বংস কামনা করছি। তার ধ্বংস হোক ইজরাইলের প্রতি পৃষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য। মহাজগতের সকল অভিসম্পাত তার ওপর পতিত হোক, যেমনটা এই গ্রন্থে লেখা আছে। সতর্ক করে দিচ্ছি, কেউ যেন তার সাথে বাক্য বিনিময় না করে। কেউ যেন তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে। কেউ যেন তার সাথে এক ছাদের নিচে না থাকে এবং কেউ যেন তার লেখা পাণ্ডুলিপি পাঠ না করে।' (Pollock: Life of Spinoza)
>
> 'শেষ বাক্যগুলো পাঠের সময় মোম রাখার পাত্রগুলো রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল এবং চারদিকে মর্মস্পর্শী কান্নার রোল পড়ে গেল। আবারও কীর্তন বেজে উঠল। রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করে সবার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো– আমেন! আমেন!' (Professor J. K. Hosmer: The Jews)

এভাবে Spinoza-কে তাদের সম্প্রদায় হতে বহিষ্কার করা হয়। অধ্যায়ের শুরুতে কাহালের অপর নাম সোভিয়েত দেখে অনেকে হয়তো বিষয় দুটিকে এক করে ফেলছেন, তাই বিষয়টা পরিষ্কার করা দরকার।

মূলত, কাহাল আর সোভিয়েত এক বিষয় নয়; এদের মাঝে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কমিউনিজমকে সামনে রেখে, যেখানে রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদের মালিক হবে রাষ্ট্র নিজেই। আর জনগণ একটি নির্ধারিত পরিমাণের বেশি সম্পদ মজুত করতে পারবে না। রাষ্ট্র জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেই সম্পদ বণ্টন করবে। অন্যদিকে কাহাল বলে, জনগণ নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারবে। এর সাথে কিছুটা পুঁজিবাদের মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুখে সাম্যবাদের (কমিউনিজম) কথা বললেও অন্তরে পুঁজিবাদ। তারা সাম্যবাদের নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতা দখল করবে, কিন্তু সম্পদ বণ্টন করবে পুঁজিবাদের মতো। তাদের এই সমাজব্যবস্থা ইতোমধ্যে রোম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ডেনমার্ক, ইতালি, রোমানিয়া, তুরস্ক ও ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকাতেও এর যথেষ্ট অস্তিত্ব চোখে পড়ে।

শিল্প সংস্কৃতি : ইহুদি ছোবল

থিয়েটারশিল্প পৃথিবীর অতি প্রাচীন একটি সংস্কৃতি, যা বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সাধারণত নাটক-চলচ্চিত্রে মানুষ যা দেখে, মানুষ তা নিয়েই কল্পনার জগৎ তৈরি করে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মগজে নতুন নতুন মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। এ কারণে বিশেষ এই শিল্পটি ইহুদিদের পরিকল্পনায় কখনো উপেক্ষিত হয়নি। বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়ার সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিলেও থিয়েটার ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অক্ষত রেখেছে।

চলচ্চিত্র শিল্প (Movie Industry) বাজারে আসার পূর্বে থিয়েটার হলগুলো নিয়মিত ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন নাটক তৈরি করত, যা দেখার জন্য প্রতি সপ্তাহে লাখো মানুষ ভিড় করত। বিনোদনের নামে থিয়েটারে যিশুকে যতটা ছোটো করে উপস্থাপন করা হতো, তা কোনো বিবেকবান খ্রিষ্টানের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ বোঝেই না, তাদের অবচেতন মনে কীভাবে শয়তানি চেতনার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যিশু ও মেরিকে ছোটো করে আজ পর্যন্ত যত বেশি নাটক তৈরি করেছে, যার বর্ণনা এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

১৯১৮-১৯ সালের দিকে ইহুদিরা মাঝারি মানের একটি থিয়েটার থেকে টিকেট বিক্রি করে ৪৫০০-৫০০০ ডলার উপার্জন করত। এ রকম অসংখ্য থিয়েটার গোটা আমেরিকার বিভিন্ন শহরতলিতে গড়ে ওঠে। সুতরাং প্রতিদিন বা প্রতি মাসে তারা কত ডলার উপার্জন করত, তা হিসাব করে দেখুন। অন্যদিকে, নির্বোধ জ্যান্টাইলরা কষ্টে তাদের উপার্জিত মজুরির একটি বড়ো অংশ নিয়মিত এই সব কুৎসিত নাটক ও চলচ্চিত্রের পেছনে খরচ করত।

এই শিল্প ইহুদিদের দখলে যাওয়ার পর চারদিকে যে নগ্ন সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে, তা সবার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরে জন্ম নেয় চলচ্চিত্র শিল্প, যা গোড়া থেকেই ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আজকের সমাজে শেক্সপিয়রকে নিয়ে কোনো রকম আলোচনা হয় না।

সমাজ-সচেতনতামূলক গল্প নিয়ে হাজির হলে প্রডিউসারগণ ভ্রু কুচকে বিরক্তি প্রদর্শন করেন। সবকিছু জ্যাজ সংগীত ও যৌন আবেদনময়ী নৃত্যের নোংরামিতে ছেয়ে গেছে।

Sheridan, Sothern, McCullough, Madame Janauschek, Mary Anderson, Frank Mayo এবং John T. Raymond ছিল সোনালি দিনের কিছু থিয়েটারশিল্পী। তারা চলে যাওয়ার পর এই শিল্প নতুন কোনো যোগ্য উত্তরসূরি খুঁজে পায়নি। বর্তমানে যে নতুন অভিনেতারা থিয়েটার শিল্পে আসছে, তাদের অধিকাংশরই গড় বয়স ১৩ থেকে ১৭। পরিচালক ও প্রডিউসারগণ এই কম বয়সিদের প্রতি অধিক আগ্রহী। কারণ, তাদের নিজেদের মতো করে গড়ে তোলা সম্ভব; তা ছাড়া পারিশ্রমিকও কম। বলা চলে তারা থিয়েটার মালিকদের হাতের পুতুল।

যেকোনো চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকাদের আবেদনময়ী শয়নকক্ষের চিত্র প্রদর্শন যেন দৈনন্দিন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিক গল্পগুলো ইচ্ছামতো পরিবর্তনে মাধ্যমে যৌন আবেদন যুক্ত করে নিয়মিত চলচ্চিত্র বানানো হচ্ছে। এরপরও বলা হয়, সত্য কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র! কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, তা বোঝা এখন আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ঐতিহাসিক সেই গল্পগুলোতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনা হয় না, যেগুলো ইহুদিদের বীরত্ব নিয়ে লেখা হয়েছে। যেমন : Ben Hur। এর বাইরের সব নাটক বা চলচ্চিত্রে নগ্নতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যৌনক্ষুধা তৈরি এবং যিশুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে উপস্থাপন করে আমাদের মাথায় নাস্তিকতার বিষ ঢেলে দেওয়া যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে অভিনেত্রীদের নগ্নরূপে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাদের অধিকাংশই জ্যান্টাইল। খুব কম খরচের বিনিময়ে পরিচালক ও প্রডিউসারগণ তাদের বাজার থেকে কিনে আনে। এভাবে সংস্কৃতি জগতে শুরু হয় নতুন এক বিবর্তন। এই অপ-সংস্কৃতিগুলো কৌশলে জ্যান্টাইলদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সচেতন ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ থিয়েটারে যাওয়ার পরিবর্তে লাইব্রেরিকে শ্রেয় বলে মনে করবে। কারণ, নাটক-চলচ্চিত্র ও থিয়েটারে এখন নৈতিকতার ক্ষুধা মেটানো সম্ভব নয়। শেক্সপিয়র আজ কেবল থিয়েটার থেকেই নয়; পাঠ্যপুস্তক থেকেও হারিয়ে গেছে। যে প্রক্রিয়ায় ইহুদিরা থিয়েটার শিল্পে বিবর্তন এনেছে, তাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১. ইহুদিরা নতুন নতুন যন্ত্র-সামগ্রী সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিটি থিয়েটার মঞ্চকে জমকালো রঙিন সাজ দিয়েছে। লাইট, ক্যামেরা, লেন্স, ঝাড়বাতি, বাদ্যযন্ত্র, ঝকঝকে জামা-কাপড়, মঞ্চ, পর্দা প্রভৃতি সংযোজনের মাধ্যমে থিয়েটারগুলোতে এক 'Realistic Effect' নিয়ে এসেছে। আগে দর্শকরা যেখানে ২ ঘণ্টা চলচিত্রের পুরোটা সময় ধরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকত, এখন সেখানে নতুন কোনো প্রযুক্তির খেলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রতিভাধর অভিনেতাদের আজ তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না। ফলে কোনো রকম প্রতিভা ছাড়াই অনেক নতুন মুখ নিয়মিত নাটক-চলচ্চিত্রগুলোতে স্থান পাচ্ছে। এমনও আছে, যাদের দু-তিনটি নাটকে অভিনয় করার পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না; এমনকী দর্শকরাও তাদের চেহারা মনে রাখে না। কেন্দ্রীয় চরিত্রের থিয়েটারগুলোতে দলগত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের সময় যে পার্শ্ব চরিত্রদের দেখা যায়, তারা যেন কিছু সময় পর হাওয়া হয়ে যায়। যেমন : 'Floradora Girls'। থিয়েটারগুলোতে জ্যান্টাইল অভিনেতারা আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হচ্ছে। আর যুবকরা তো প্রযুক্তির খেলা দেখার পাশাপাশি অপেক্ষা করে, কখন ছোটো ছোটো জামা পরে নতুন কোনো অভিনেত্রী মঞ্চে আসবে?

২. থিয়েটার হলগুলোতে আজ যে শয়তানি চর্চা শুরু হয়েছে, তা খুব দ্রুত প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। টিকেট মূল্যের ওপর ভিত্তি করে থিয়েটারগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সম্পদশালীদের জন্য উঁচু হল এবং গরিবদের জন্য নিচু হল। অশ্লীলতার প্রদর্শন উঁচু শ্রেণির হলগুলোতে যতটা হয়, ততটা নিচু শ্রেণির ঘরগুলোতে হয় না। অর্থাৎ নিষিদ্ধ শয়তানের রূপ কে-কতটা দেখবে, তা টিকেট কেনার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে।

'Aphrodite' নাটকের শেষ সিজন তার একটি অকাট্য প্রমাণ। 'Aphrodite' হলো গ্রিকদের সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী। এই চরিত্রটি চূড়ান্ত নগ্নতা দিয়ে উপস্থাপন করেছে। আরও আকর্ষণীয় করার জন্য অভিনেত্রীকে চিতাবাঘ, হরিণ ও গাছপালার চামড়া পরানো হয়। নাটকটি যখন প্রথম মুক্তি পায়, তখন নিউইয়র্ক পুলিশ এর বিরুদ্ধে মামলা করে। এটিকে বাজার হতে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সাথে সাথেই ইহুদিদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো নাটকটির পক্ষে জ্যান্টাইলদের সমর্থন লাভের জন্য খুব সুন্দর করে, কাব্যিক ছন্দে আর্টিক্যাল প্রকাশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুক্ত সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে তারা সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। তারপর মামলা আদালতে তোলা হলে শুরু হয় নতুন নাটক। কারণ, প্রধান বিচারপতি, সহকারী বিচারপতি এবং গণ্যমান্য উকিল সবাই তো ইহুদি! মাদকদ্রব্য বিক্রি করা অবৈধ। কারণ, তা চোখে দেখা যায়, কিন্তু নৈতিকতায় বিষ ঢালতে সমস্যা নেই। কারণ, তা চোখে দেখা যায় না। ফলে মামলাটি খারিজ হতে বেশি সময় লাগল না।

প্যারিস ও ভিয়েনাসহ ইউরোপের আরও অনেক শহরের অবস্থা আজ একই রকম। রাতভর বায়েজিদের নৃত্যানুষ্ঠান, অশ্লীল সব কৌতুক এবং অর্ধনগ্ন ঝলমলে কাপড় পরা যুবতি মেয়েদের আসরে প্যারিস তথা ইউরোপীয় শহরগুলোর অলি-গলি ভরে গেছে। শুধু কি থিয়েটারশিল্প? বই, ম্যাগাজিন ও পত্রিকার প্রচ্ছদ ছাপাতেও নগ্ন তরুণীদের ব্যবহার করা হচ্ছে!

৩. থিয়েটারশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইহুদিদের উদ্ভাবিত নতুন কৌশল হলো 'স্টার'। এখানে স্টার অর্থ আলোচিত ও অনুকরণীয় অভিনেতা-গোষ্ঠী, যাদের আমরা জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা বলে অবিহিত করি। পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দায়িত্ব থাকে, এই স্টারদের পছন্দ-অপছন্দ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন যেন এমনভাবে উপস্থাপন করে, যাতে জ্যান্টাইলরা তাদের আদর্শ বলে মনে করে। ফলে এই স্টারদের অনুকরণে অনেক উঠতি বয়সি যুবক-যুবতি নিজেদের স্টারদের মতো করে সাজিয়ে নেয়। এতে থিয়েটার হাউজগুলোর নতুন নতুন মুখ খুঁজে পেতে তেমন কোনো কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু আজ যাদের স্টার হিসেবে দেখছি, কালও যে একই অবস্থায় দেখব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরিচালক ও প্রডিউসারগণ এখানে খুব সূক্ষ্ম একটি খেলা খেলে। অভিনেতারা যদি পরিচালকদের পছন্দমতো গল্পে অভিনয় করতে রাজি না হয়, তাহলে পরেরদিন থেকেই তাদের স্টার খেতাব মুছে যাবে। স্টার হতে গেলে নোংরা-নগ্নতায় ভরা গল্পে অভিনয় করতে হবে। সেইসঙ্গে অর্জন করতে হবে পরিচালকদের ব্যক্তিগত অনুগ্রহ!

বর্তমান থিয়েটার শিল্পে আর কখনো Mary Anderson বা Julia Marlowe-এর মতো গুণী অভিনেত্রীদের দেখা পাওয়া যাবে না। সত্যিকারের অভিনেতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তারা কোনো পরিচালক বা প্রডিউসারের ব্যক্তিগত অনুগ্রহের দানপাত্র হতে চায়নি। তারা শুরুতে জন-সমর্থন জুগিয়েছে এবং একটু একটু করে অভিনয় শিল্পে পারদর্শী হয়েছে। সেই সময় অভিনয়শিল্পে এত যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা ও নগ্নতা ছিল না। সেখানে ছিল শুধু নৈতিকতার খোরাক। আফসোস! তাদের মতো উত্তরসূরি আর গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

আজ পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ছোটো-বড়ো অনেক অডিশনের আয়োজন করা হয়। সকাল-বিকাল অডিশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অভিনেতাদের খোঁজা হয়। সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কিছু নাটক চলচিত্রের জন্য গ্রহণ করে এবং কাজ শেষে ছুড়ে ফেলা হয়। তাদের ব্যক্তিগত সম্মান বলতে কিছুই নেই।

৪. ১৮৮৫ সালের পর থেকে থিয়েটার শিল্পে দুটি নতুন বিষয়ের সংযোজন ঘটে : বক্স অফিস ও বুকিং এজেন্সি। থিয়েটার শিল্পকে বাণিজ্যিকীকরণ এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বুকিং এজেন্সিগুলো সম্ভাব্য ক্রেতাদের সন্ধান করে, যারা পুরো এক মৌসুম বা একাধিক মৌসুমের জন্য থিয়েটার হলগুলো কিনে নেয়। এতে কয়েক মৌসুমের জন্য থিয়েটারগুলো দর্শক পেয়ে যায়। ফলে তাদের আর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাদের মূলনীতি– দর্শক যা দেখতে চায় তা-ই দেখাও; হোক তা বস্তাপঁচা জিনিস।

বুকিং এজেন্সি সবচেয়ে বড়ো আঘাত হানে 'থিয়েটার ট্রাস্ট' সংস্কৃতির ওপর। থিয়েটার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে, নতুন নতুন গল্প-নাটক ও তারকা অভিনেতা তৈরি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করত, যা থিয়েটার ট্রাস্ট নামে পরিচিত ছিল। এর কারণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের এক বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি হতো।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি, মানুষের মনের কথা, সমাজের আনন্দ-বেদনা প্রভৃতিকে পুঁজি করে তৈরি হতো গল্প-নাটক। তা ছাড়া শেক্সপিয়ারের কালজয়ী নাটকগুলোতেও খুঁজে পাওয়া যেত সমাজের বাস্তব চিত্র। তখনকার থিয়েটারগুলো শিক্ষণীয় বহু বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিল। অর্থের জন্য নয়, হৃদয়ের আবেগ থেকে মানুষ অভিনয় শিল্পে আসত।

বুকিং এজেন্সি থিয়েটার শিল্পে নিয়ে আসে এক বাণিজ্যিক সংস্কৃতি, যা ধ্বংস করে দেয় এই পুরো শিল্পকে। যেখানে মুনাফার প্রসঙ্গ আসে, সেখানে শিল্প অবশ্যই নিজের গুণগত মান হারাবে। আজ যারা অভিনয় শিল্পে আসছে, তারা কেবল শারীরিক সৌন্দর্য বা পারিবারিক ক্ষমতা খাটিয়েই আসছে। বিপরীত দিকে দক্ষ অভিনেতা হওয়ার পরও নিজেকে প্রমাণ করতে পারছে না– এ যুগে এমন অনেক উদাহরণও পাওয়া যাবে। কারণ, তার পেছনে কেউ অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি নয়।

দর্শকদের বিভিন্ন প্রকার আনন্দের খোরাক জোগাতে 'Vaudeville' নামে বিশেষ এক থিয়েটারশৈলী তৈরি করা হয়। নাটক, গান, নৃত্য, কৌতুক, জাদু প্রদর্শনী, পশু-পাখিদের সার্কাস, ক্রীড়াবিদ, সুন্দরী নারী ইত্যাদির সমন্বয়ে সংগীতে হয় এই 'Vaudeville'। সবকিছু আছে, শুধু নেই নৈতিকতার উপাদান। Klaw & Erlanger-বুকিং হাউসটি কমিশনের বিনিময়ে বিভিন্ন থিয়েটার মালিকের সঙ্গে প্রডিউসারদের পরিচয় করিয়ে দিত। যেহেতু Vaudeville সাধারণ মানুষের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেহেতু প্রডিউসারদেরও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এভাবেই ইহুদিদের হাত ধরে গড়ে উঠে নতুন এক থিয়েটার ট্রাস্ট।

আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে– বুকিং হাউসগুলো থিয়েটার দলগুলোর মধ্যে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দিয়েছে। যেসব থিয়েটার যত বেশি হাস্যরস ও দর্শক জোগাতে সক্ষম, প্রডিউসারদের কাছ থেকে সেগুলো তত বেশি বাজেট লাভ করবে। এবার থিয়েটারগুলোতে নিত্য-নতুন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান চালু হওয়া শুরু করে। তা ছাড়া বাজারে তো এখন অল্প খরচে অনেক অভিনেতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ফলে নতুন এই অনুষ্ঠানগুলো চালিয়ে নিতে তাদের তেমন কোনো আর্থিক সমস্যা হয় না। আর দর্শকরাও এসব অখাদ্য আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। সারাদিন পরিশ্রম করে তারা ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে মজুরি পাচ্ছে, তার একটি বড়ো অংশ আবার তাদেরই পেটে চালিয়ে দিচ্ছে।

ইহুদিরা যেভাবে থিয়েটার শিল্পকে ধ্বংস করল

নতুন যে ট্রাস্ট সংগঠনটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার সদস্যরা হচ্ছেন- Klaw, Erlange, Nixon, Zimmerman, Hayman, Frohman, Rich, Harris ও Josheph Boork। ১৮৯৬ সালে এই ট্রাস্ট সংগঠনটি আমেরিকার ৩৭টি গুরুত্বপূর্ণ থিয়েটারকে নিজেদের করে নেয়। এর ফলে থিয়েটারগুলো বহু আগেই পরবর্তী মৌসুমের জন্য ভাড়া হয়ে যেত। নতুন মৌসুমের জন্য কী ধরনের গল্প-নাটক সংগীতে করা হবে, তা ট্রাস্টের সদস্যরা আগেই ঠিক করে দিত। তা ছাড়া যদি কোনো ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন বাণিজ্যিক চুক্তিতে থিয়েটারগুলো ভাড়া করতে চাইত, তবে তা ট্রাস্টের মাধ্যমে করা হতো। বিনিময়ে সংগঠনটি সপ্তাহে ৪৫০ হতে ১০০০ ডলার পর্যন্ত রয়েলেটি উপার্জন করত।

এই ট্রাস্টের নিবন্ধনের বাইরে যেসব স্বাধীন থিয়েটার ছিল, তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হওয়া শুরু করে। টিকেট বিক্রি একেবারেই কমে যায়। আর্থিক ক্ষতির কারণে তাদের সদস্যরা বাধ্য হয়ে অন্য থিয়েটারগুলোতে যোগ দেওয়া শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, 'Motion Technology'-কে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা আমেরিকার বাজারে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু করে। এই শিল্পের লাগাম শুরু থেকেই ইহুদিদের হাতে রয়েছে। কারণ, তারাই এর জন্মদাতা।

জ্যান্টাইলদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের কোনো কৌশলগত যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন পরেনি; বরং যে থিয়েটারগুলো আর্থিক ক্ষতির মুখে বন্ধ হয়েছিল, তাদের সদস্যরা চাকরির আশায় এই শিল্পে হাত পাততে শুরু করে।

তবে চলচিত্র শিল্পের উত্থান ঘটানো অত সহজ কাজ ছিল না। কারণ, থিয়েটারশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে চারদিকে জোরালো আন্দোলন শুরু হয়। Nat C. Goodwin, Joseph Jefferson, James A. Herne, James O'Neil, Richard Mansfield, Francis Wilson, Mrs. Fiske এবং James K. Hackett হলেন এমন কিছু ব্যক্তি, যারা দীর্ঘ সময় ধরে এই আন্দোলন টিকিয়ে রেখেছিলেন। সময়ের পরিক্রমায় আস্তে আস্তে তারা সবাই এই আন্দোলন থেকে সরে আসে।

প্রথমে সরে আসে Nat C. Goodwin. তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের প্রথম আহ্বায়ক। তবে তার বেশ কিছু দুর্বলতাও ছিল। যেমন : ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত কাজে তাকে প্রায়-ই নিউইয়র্কে যেতে হতো। নিকারবোকার থিয়েটারের ওপর তার বেশ লোভও ছিল। ইহুদিরা তাকে এই থিয়েটারের ম্যানেজার হওয়ার প্রস্তাব দেয়। ফলে আন্দোলনে ইস্তফা দিয়ে তিনি ট্রাস্ট সংগঠনটির গোলামে পরিণত হন।

Joseph Jefferson শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থিয়েটার শিল্পীদের সাথে এবং একই সঙ্গে ট্রাস্ট সংগঠনটিরও সদস্য ছিলেন। এককথায় তিনি ছিলেন গুপ্তচর।

Richard Mansfield ও Francis Wilson প্রতি রাতে থিয়েটার ঘরগুলোতে জ্বালাময়ী কিছু বাণী শোনাতেন। অনেক মানুষ রাতভর তাদের বাণী শোনার অপেক্ষা করত, কিন্তু অসংগঠিত একটি জনগোষ্ঠী এমন কিই-বা করতে পারে? মানুষ যে কথা শুনতে আসছে, এটাই তাদের জন্য পুরস্কার ছিল।

১৮৯৮ সালের দিকে Francis Wilson-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করলে ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট সংগঠন তাকে ৫০ হাজার ডলারের পারিতোষিক অর্থাৎ বকশিস প্রস্তাব করে। তিনি প্রস্তাবে রাজি হন এবং এটা দিয়ে ব্যাবসা শুরু করেন। এরপর পুরো আন্দোলন ভেস্তে যায়। বাকি যে সদস্যরা ছিল, তারাও কোনো একসময় এই আন্দোলন থেকে সরে পড়ে।

সবাই আত্মসমর্পণ করলেও Mrs. Fiske একা এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার স্বামী Harrison Grey Fiske-এর সাহায্য চাইলেন। তার স্বামীর নিউইয়র্কের নাম করা পত্রিকা প্রতিষ্ঠান *Dramatic Mirror*-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি একটি কলামে উল্লেখ করেন–

> 'থিয়েটার শিল্পের মৃত্যু সেদিন হয়েছে, যেদিন এর নিয়ন্ত্রণ একদল অযোগ্য ও অদক্ষ লোকের হাতে চলে গেছে। এর মাধ্যমে আমাদের গৌরব, ঐতিহ্য ও শালীনতার সূর্যাস্ত ঘটেছে। এরপরও কি আমরা এটিকে সুস্থ-সুন্দর বিনোদনের মাধ্যম বলব? যারা এই শিল্পকে নিজেদের করে নিয়েছে, তারা এটি পরিচালনায় একেবারে অদক্ষ। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র এই সন্ত্রাসী চক্রের দরুন ইতঃপূর্বেও বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' (Dramatic Mirror, December 25, 1897; Reprinted in March 19, 1898)

আগেও বলা হয়েছে, যখন কোনো ইহুদির ওপর আক্রমণ আসে, তখন তাকে রক্ষায় পুরো সম্প্রদায় এগিয়ে আসে। এবার তাদের পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠানগুলো Dramatic Mirror-এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আর্টিক্যাল প্রকাশ শুরু করে। হোটেল, স্টেশন, অফিস-আদালত সব জায়গা থেকে এই পত্রিকাটি বর্জন করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতারাও সরে পড়ে। সবশেষে Mr. Fiske-কে চাকরিচ্যুত করা হয়।

তিনি সেই কলামে আরও অনেক তথ্য উপস্থাপন করেন। যেমন : গোপন ছদ্মনাম ব্যবহার করে কারা এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কারা এটিকে নিয়ে সিন্ডিকেট বাণিজ্য করছে, কীভাবে তারা টিকেটের মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে? সেইসঙ্গে তিনি সেই সকল ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেন, যারা ইতঃপূর্বে সন্ত্রাসী তৎপরতায় অভিযুক্ত হয়েছে। তিনি এটাও উল্লেখ করেন– প্রচারণার কাজে বিভিন্ন শহরের পত্রিকাগুলোতে তারা এতটা উচ্চমূল্যে বিজ্ঞাপন দিত যে, দ্বিতীয় কোনো থিয়েটার প্রতিষ্ঠান সেখানে বিজ্ঞাপন ছাপানোর সুযোগই পেত না। পুরো বাজার শয়তান আর ভণ্ডে ছেয়ে গেছে।

এই খবরের প্রতিশোধ নিতে ট্রাস্ট সংগঠনটি Mr. Fiske-এর বিরুদ্ধে ১০ হাজার ডলারের মানহানি মামলা করে।

অবাক করা বিষয়– মামলাটি আদালতে তোলা হলে বিচারপতি সাহেব সাক্ষ্য শোনার ন্যূনতম প্রয়োজনবোধও করেননি; এমনকী তাকে কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত দেননি! যাদের অভিযুক্ত করে কলাম ছাপিয়েছিলেন, তাদের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানের ন্যূনতম আগ্রহ পর্যন্ত কেউ দেখায়নি। আদালত কক্ষে উপস্থিত এক মহিলা চেঁচিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলে তাকেও থামিয়ে দেওয়া হয়।

সেদিন আদালতে অন্যতম আসামি Abraham L. Erlanger হাজির ছিলেন না। ফলে তাকে আর জেরা করা হয়নি। তিনি বাদে যতজন সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের জেরা করার সময় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো বিচারক সাহেব 'overruled' করে যান। একে একে সবাই খালাস পায়। আর বিশাল অঙ্কের মানহানি মামলায় Mr. Fiske-কে অভিযুক্ত করা হয়।

তবে তিনি যে ভয়ংকর সত্য প্রকাশের সাহস দেখিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব যদি সেই যুগের মানুষরা উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে জ্যান্টাইল যুব সমাজের নৈতিকতাবোধ কখনো ধ্বংস হতো না। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, এই শিল্পে অশ্লীলতার যাত্রা তাদের হাত ধরেই হয়েছে, যারা একসময় জুতা পালিশ, পত্রিকা বিক্রি এবং টোকাইয়ের কাজ করত। সেকালে এই শিল্পের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন Morris Gest। তিনি ছিলেন রাশিয়ান ইহুদি। আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো প্রোডাকশন হাউস তার হাতে গড়ে ওঠে। থিয়েটার জগতের প্রথম দুটি অশ্লীল নাটক 'Aphrodite' ও 'Mecca' তার বিনিয়োগকৃত অর্থেই নির্মিত হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, নাটক দুটির সব টিকেট এক বছর আগেই বিক্রি হয়; যার অধিকাংশ ক্রেতা ছিল জ্যান্টাইল।

Mr. Gest-এর সফলতার বড়ো কারণ হলো– তিনি হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই করেছেন। রাশিয়া থেকে আমেরিকায় আসার পর প্রথমে তিনি বোস্টনে পত্রিকা বিক্রির কাজ করতেন। এরপর প্রপারটি বয়ের কাজ শুরু করেন (যারা বিশেষ কোনো চরিত্র ছাড়া নাটক-সিনেমাতে অংশগ্রহণ করে, তাদের প্রপারটি বয় বলা হয়)। ১৯০৬ সাল থেকে তিনি চোরাই পথে থিয়েটারের টিকিট বিক্রির কাজ শুরু করেন। এ জন্য বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরাও খান। একসময় তাকে থিয়েটার অঞ্চলগুলোতে নিষিদ্ধ করা হয়। এ রকম হাজারো কুৎসিত গল্প তার নামের সঙ্গে মিশে আছে।

প্রডিউসার হিসেবে তিনি দর্শকদের তা-ই দিয়েছেন, যা তারা দেখতে চেয়েছে। সমাজে যখন অশ্লীলতা সবে জায়গা পেতে শুরু করেছে, তখন তিনিও নিঃসংকোচে নিজের থিয়েটারগুলোতে অশ্লীলতার সংযোজন করেন। আর জ্যান্টাইল যুবকরাও খুব আগ্রহ নিয়ে এই অনুষ্ঠানগুলো দেখতে যেত। এর দরুন সব টিকেট আগেই বিক্রি হয়ে যেত।

এমন আরেকজন ব্যক্তি হলেন Sam Harris। তিনি দীর্ঘদিন Cohan & Harris প্রতিষ্ঠানটির একজন জুনিয়র অংশীদার হিসেবে কাজ করেছেন। Sam Harris একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির দর্শককে টার্গেট করেন, যারা মারামারি, রক্তারক্তি ও ভয়ংকর শারীরিক কসরতের প্রদর্শন দেখতে পছন্দ করত। তাদের জন্য 'Atrocious Melodrama' নামে নতুন একটি শৈলী তিনি থিয়েটার শিল্পে নিয়ে আসেন। সেকালের সেরা বক্সিং তারকাদের সঙ্গে তিনি চুক্তি করেন। যেমন : Dixon ও Terry McGovern। তা ছাড়া সুঠাম দেহের সকল যুবকদের তিনি থিয়েটারে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদের দিয়ে ভয়ংকর সব শারীরিক কসরত (Stunt) প্রদর্শনের আয়োজন করা হতো। Sam Harris নিজের প্রোডাকশন হাউসকে শক্তিশালী করতে Al H. Woods-কে অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব করেন।

Mr. Woods ব্যক্তি হিসেবে কিছুটা অসংযত হলেও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় তার বেশ অবদান রয়েছে। তিনি একসময় নিউইয়র্কের একটি নাট্যদলের হয়ে পিয়ানো বাজাতেন। তার নেতৃত্বে থিয়েটার জগতে কালজয়ী দুটি নাটকের জন্ম হয় : 'The Girl from Rector's' ও 'The Girl in the Taxi'। ভিয়েনার থিয়েটার প্রতিষ্ঠান এবং অপেরা হাউসগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তবে এটাও ঠিক, সেখানে তখন অশ্লীলতা ও নগ্নতার জমজমাট প্রদর্শন হতো। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তিনি নিজেও একসময় অশ্লীলতার মাঝে হারিয়ে যান।

Al Woods-এর মতো হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি বাদে এই শিল্পটি একদল অশিক্ষিত, মূর্খ ও নৈতিকতাহীন মানুষদের হাতে পড়ে। যারা সাহিত্যের কিছুই বোঝে না, তারাই আমাদের সাহিত্য শেখাচ্ছে। যারা দর্শনের কিছুই জানে না, তারাই দর্শন শেখাচ্ছে। যাদের কোনো নৈতিকতাবোধ নেই, তারাই আবার নৈতিকতার ছবক দিচ্ছে।

Devid Belasco থিয়েটার জগতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। অভিনয় দক্ষতার জন্য তাকে বিভিন্ন মহল থেকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। খুব অল্প সময়ে তিনি দর্শকদের মন জয় করে ফেলেন। তিনি যখন যিশুর চারিত্রে অভিনয় করতেন, তখন অনেকেই তার মাঝে যিশুর ছায়া খুঁজে পেত।

আঠারো শতকের শেষের দিকে ট্রাস্টের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সিরাকিউস থিয়েটারের ম্যনেজার Samuel Shubert ছিলেন এই ট্রাস্টের একজন সদস্য। জীবনের প্রথম দিকে থিয়েটার হলগুলোতে তিনি চা-নাস্তা তৈরির কাজ করতেন। কিছুদিন পর তিনি চোরাই পথে টিকেট বিক্রির কাজ শুরু করেন। এই টাকা জমিয়ে একসময় নিজের নামে একটি থিয়েটার খুলে বসেন। তার থিয়েটারের মূল বিষয় ছিল 'Burlesque and Comed' অর্থাৎ যৌন-আবেদনময়ী কৌতুক নাটক।

১৯০০ সালে Belasco ও Shubert ট্রাস্টের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে আসেন। নিউইয়র্কে তাদের ভক্তের অভাব ছিল না। থিয়েটারগুলোতে তখন খ্রিষ্টানরা

সুবিধা করতে পারছিল না বলে অনেকে ক্ষেপে গিয়েছিল। এই ক্ষোভটাকে তারা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। Shubert নাট্যগল্প সংগীতে, টিকেট বিক্রি ও থিয়েটার প্রচারণার কাজ করত। Belasco সেই গল্প অনুযায়ী ছোটোখাটো থিয়েটারগুলোতে অভিনয় করত। যিশু, পবিত্র আত্মা, খ্রিষ্টান পুরোহিত ইত্যাদি নানা চরিত্রে তিনি দর্শকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা চালাতেন। তার শারীরিক গঠন, কম্পমান কণ্ঠ, রুপালি চুল এবং লাজুক দৃষ্টি খ্রিষ্টান মেয়েদের মনে ছোবল মারত। অভিনয় শেষে তিনি ট্রাস্ট সংগঠনটির কুৎসিত বিভিন্ন গল্প এবং কীভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, তা তুলে ধরেন। ধীরে ধীরে সংগঠনটির প্রতি মানুষের অনীহা বাড়তে শুরু করে। তা ছাড়া উনিশ শতকের শুরুতে বার্ধক্যের কারণে সংগঠনটির অনেক সদস্য মারা যায়।

বাজারের এমন অবস্থা দেখে ১৯০৭ সালে ম্যানহ্যাটনে তিনি নিজেই একটি থিয়েটার খুলে বসেন। তত দিনে সবাই তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। শুরু থেকেই তিনি সফলতা পাচ্ছিলেন। ১৯১০ সালে পুরোনো ট্রাস্ট সংগঠনটি একেবারে ভেঙে যায়। এবার সেই সদস্যরা একে একে বেলাস্কো থিয়েটারে যোগ দেওয়া শুরু করে। এভাবে জন্ম নেয় নতুন আরেকটি ট্রাস্ট সংগঠন।

মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো খ্রিষ্টান অভিনেতারা থিয়েটার শিল্পে জায়গা পাবে। নতুন সংগঠনটি হয়তো পৃষ্ঠপোষকতা করবে। কিন্তু এখানেও তাদের বোকা বানানো হয়। মানুষ বুঝল না, সংগঠনটি নতুন হলেও ভেতরের মানুষগুলো পালটায়নি। খ্রিষ্টানদের ছদ্মনাম ব্যবহার করে তারা আবারও এই ট্রাস্টে যোগ দেয়। তাই সাধারণ মানুষ তাদের সনাক্ত করতে পারেনি। লেখক, নাট্যকারসহ কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো আগের মতো এবারও তাদের দখলে গেল। পার্শ্ব চরিত্রে কিছু সুন্দরী খ্রিষ্টান তরুণীকে নিয়ে আসা হতো। তবে তাদের অভিনয় যেন ইহুদিদের মতো হয়, তার জন্য আগে থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তারা নিজেদের পৌরাণিক গল্পগুলো নিয়ে নাট্যশালার আয়োজন করত। ধীরে ধীরে মানুষ আবারও থিয়েটারের দিকে ফিরেতে শুরু করল। যারা কিছুদিন আগেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, তারা বুঝতেই পারল না, এই অভিনেতাদের আসল পরিচয় তাদের ছদ্মনামের নিচে লুকিয়ে আছে।

একসময় মানুষ যখন সবকিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়, তখন সবাই ছন্মনামের খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসা শুরু করে। সে সময়ের বেশ কিছু জনপ্রিয় অভিনেতা হলেন : Al Jolson, Charlie Chaplin, Louis Mann, Sam Bernard, David Warfield, Joe Weber, Barney Bernard, Ed Wynne, Israel Leopold, Lou Fields, Eddie Cantor এবং Robert Warwick।

একইভাবে জনপ্রিয় কিছু অভিনেত্রী হলেন : Theda Bara, Nora Bayers, Olga Nethersole, Irene Franklin, Gertrude Hoffman, Mizi Hajos, Fanny Brice,

Bertha Kalisch, Jose Collins, Ethel Levy, Belle Baker, Constance Collier এবং Anne Held। এমন আরও অনেকে আছেন, যাদের সত্যিকারের পরিচয় কখনো প্রকাশ পায়নি। কারণ, তারা ছদ্মনামেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

এত কিছুর পরও তাদের স্বাদ মিটল না। এবার তারা থিয়েটারকে কেবল নাট্যশিল্পে আবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে চাইল সংগীত, নৃত্য-সংগীত ও চলচ্চিত্রে। এর জন্য দরকার পড়ে আলাদা আলাদা গান, কবিতা ও গল্প-উপন্যাসের। কিন্তু তাদের ভালো কোনো সুরকার, গল্প লেখক ও মঞ্চ ডিজাইনার ছিল না। ফলে বিখ্যাত কিছু জ্যান্টাইল কবি, গীতিকার, সুরকার, নাট্য লেখক ও গল্প লেখকদের তারা অর্থের বিনিময়ে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করে। এমন কিছু ব্যক্তির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

> Victor Herbert ও Gustav Kerker আমেরিকার সংগীত শিল্পে জনপ্রিয় দুটি নাম। বিখ্যাত গল্প *The Lion and The Mouse*-এর লেখক Charles Klein। এমন আরও অনেকে হলেন Jack Lait, Montague Glass, Samuel Shipman, Jules Eckert Goodman এবং Aaron Hoffman।

তাদের নির্দেশনায় বাধ্য হয়ে জ্যান্টাইল লেখকরাও একসময় যৌন গল্প লিখতে শুরু করে। যে গল্পে যৌনতার ন্যূনতম সংস্পর্শ নেই, তার প্রতি পরিচালক, প্রডিউসার ও ট্রাস্ট বোর্ড কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ করে না। কোনো অভিনেতা যদি এসব গল্পে অভিনয় করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে একেবারে বের করে দেওয়া হয়।

Shuberts নিউইয়র্কসহ আশপাশের বেশ কিছু থিয়েটার প্রতিষ্ঠান ইজারা নেওয়া শুরু করে। গান, গল্প, অভিনয়ের মতো শিল্পের কোনো শাখায় তার ন্যূনতম জ্ঞান ছিল না। তবে কীভাবে টিকেটের মূল্য বাড়াতে হয় এবং দর্শকদের থিয়েটারে আনতে হয়, তিনি তা খুব ভালো করেই জানতেন।

১৯২০ সালে থিয়েটার শিল্পে বড়ো ধরনের ধ্বস নামে। প্রায় ৩০০০ থিয়েটারশিল্পী তাদের পেশা পরিবর্তন করতে অন্যত্র চলে যায়। অনেকে থিয়েটার হলগুলো বিক্রি করা শুরু করে। এমন কঠিন অবস্থার মধ্যেই Shuberts নিউইয়র্কে ৬টি থিয়েটার হল ও ৪০টি নতুন নাটক তৈরির আগাম ঘোষণা দেয়। এমন হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে অনেকে তাকে পাগলও বলতে থাকে, কিন্তু তিনি কী তৈরি করবেন তা সাধারণ মানুষ তখনও বুঝতে পারেনি। তার চিন্তা ছিল গল্প-নাটক যাই হোক, তাতে যদি নগ্নতার মিশ্রণ থাকে, তাহলে দর্শকের অভাব হবে না।

১৯১০ সালের পর থেকে 'চলচ্চিত্র' নামক একটি নতুন শিল্পের জন্ম হয়, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Motion Picture'। নতুন নাটক তৈরির আগাম ঘোষণা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে– তিনি ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র শিল্পেও ক্ষমতাধর হতে চলেছেন। এ পর্যায়ে এসে নৈতিকাধর্মী থিয়েটার শিল্পের চূড়ান্ত মৃত্যু হয়। আজ একজন অভিনয় শিল্পীর দক্ষতা মাপা হয়–

পরিচালকের নির্দেশে তিনি কতটুকু অভিনয় করতে পারছেন তার ওপর। মহিলা শিল্পীদের জামা-কাপড় নির্ধারণে আজ আর কোনো নিয়মনীতি নেই। গান ও নৃত্য প্রদর্শনে যে যুবতিদের মঞ্চে উঠানো হয়, তাদের খামারের মুরগি বললেও ভুল হবে না।

সাধারণ মানুষ আজ আর নৈতিকতার জন্য আন্দোলন করে না। ইহুদিরা আঁচ করতে পেরেছিল, তাদের যৌনতা ভরা চলচ্চিত্রশিল্প নিয়ে জ্যন্টাইল সম্পাদকরা একসময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই তাদের ঘুষ দিয়ে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এমন অনেক সম্পাদক ছিল, যারা তাদের অর্থের সামনে বিক্রি হয়ে যায়নি। যেমন : S. Metclafe, Hillery Bill, Frederick F. Schrader, Norman Hapgood এবং James O' Donnell Bennett। তারা যথাক্রমে *Life, New York Press, Washington Post, New York Evening Globe* ও *Chicago Record-Herald* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সম্পাদকদের কাবু করতে না পারায় ইহুদিরা পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো কাবু করতে শুরু করে। আর এটাই ছিল তুলনামূলক সহজ কাজ। প্রথমে তারা বড়ো অঙ্কের অর্থ অনুদানের লোভ দেখিয়ে দলে ভেড়ানো শুরু করে। এতে কাজ না হলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়। এভাবে একে একে সবাই ইহুদিদের পায়ের নিচে ধারণা দিতে বাধ্য হয়। তারপর যেসব সম্পাদক তাদের বিরুদ্ধে লিখতে পারে বলে আশঙ্কা হয়, তাদের সবাইকে একে একে চাকরিচ্যুত করা হয়। এভাবে থিয়েটার ও চলচ্চিত্রশিল্প হয়ে উঠে ইহুদিদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জনের সম্ভাবনময় উৎস।

ইহুদিদের নগ্নতার থাবায় চলচ্চিত্রশিল্প

Anthony Comstock-এর নাম শুনেছেন কখনো? তিনি মিডিয়া জগতের বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিত্ব নন। তার নাম উচ্চারিত হলে চারদিকে হাসির ধুম পড়ে যেত। পত্রিকায় তাকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ কলাম লেখা হতো। অথচ বাস্তবে তিনি ছিলেন অশ্লীলতা, নোংরামি এবং সকল অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে একজন প্রতিবাদী ব্যক্তি। পেশায় ছিলেন পোস্টাল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সদস্য। এসব অপসংস্কৃতি যেন সমাজে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য তিনি 'সেন্সর বোর্ড' তৈরির প্রস্তাব করেন। আর এ কারণেই তিনি ইহুদি নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্রশিল্পের কাছে চিরশত্রু বনে যান। সাধারণ মানুষ যেন তার কথায় কর্ণপাত না করে, এ জন্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে তিনি মারা যান।

ব্যাপারটা এমন নয়– তারা ইচ্ছা করে খারাপ ও নোংরা জিনিস তৈরি করে। মূলত তাদের রুচিবোধটাই এমন। ইহুদিরা নোংরামির কতটা নীচু স্তরে পৌঁছে গেছে, তা তারা উপলব্ধিও করতে পারে না। এটা সত্যি– এখনও কিছু ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে।

তবে তাদের সহমর্মিতা জানানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কারণ, দর্শকসমাজ আজ সুস্থধারার চলচ্চিত্রের দিকে ফিরেও তাকায় না। সেন্সর বোর্ড প্রতিষ্ঠা পেলে ইহুদিদের নগ্নতা ভরা চলচ্চিত্র শিল্প ভয়ানক হুমকির মুখে পড়ত। তাই তারা সুকৌশলে এটাকে ঠেকিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

১৯০৯ সালে নিউইয়র্ক শহরে National Board of Review of Motion Pictures প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অশালীন ও নগ্ন চলচ্চিত্রের নির্মাণ ঠেকাতে চারদিকে যখন আন্দোলন শুরু হয়, তখন চাপের মুখে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথমে এর নাম ছিল Motion Picture Censorship। মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো অশ্লীল চলচ্চিত্রের নির্মাণ বন্ধ হবে। কিন্তু সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল এই বিশেষ চলচ্চিত্র নির্মাতা গোষ্ঠীটির স্বার্থ রক্ষা করা এবং কিছু একটা বুঝিয়ে সাধারণ মানুষদের আন্দোলনকে কবর দেওয়া। Frederick Boyd Stevenson সংগঠনটির একজন সাবেক কর্মী। ব্রুকলাইনের Eagle ম্যাগাজিনে তিনি উল্লেখ করেন–

> 'চলচ্চিত্র শিল্পের নাটাই ধরে যে যৌনতা সমাজে প্রবেশ করেছে, তার দরুন সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্দোলন ও মামলা-মোকাদ্দমা করেও যৌনতার আঠালো থাবা থেকে এই শিল্পকে উদ্ধার করা যাচ্ছে না। যেখানে একটি সুস্থ-শালীন চলচ্চিত্র থেকে আয় হয় ১০০০০০ ডলার, সেখানে যৌনতা ভরা একটি চলচ্চিত্র থেকে আয় হয় ২৫০০০০ থেকে ২৫০০০০০ ডলার। তাহলে বাজারে কোন চলচ্চিত্র বৃদ্ধি পাবে?'

Dr. James Empringham নিউইয়র্কের World ম্যাগাজিনের একটি কলামে লিখেন–

> 'কিছুদিন আগে চলচ্চিত্রশিল্প নিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। অবাক করা ব্যাপার– উপস্থিত ৫০০ জন সদস্যের মধ্যে কেবল আমিই ছিলাম খ্রিষ্টান, আর বাদ বাকি সবাই ইহুদি।'

শতাব্দীর শুরুতে মাত্র ১০টি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আমেরিকার প্রায় ৯০ ভাগ চলচ্চিত্র নির্মাণ করত। এর ৮৫ ভাগ সদস্যই ছিল ইহুদি। দর্শকসংখ্যা বাড়াতে পৃথিবীজুড়ে তারা অসংখ্য শাখা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তৈরি করে দশ হাজার সিনেমা হল। যে গ্রাম্য মানুষ একসময় থিয়েটারও দেখতে যেত না, তারা আজ দল বেঁধে সিনেমা হলে যাচ্ছে।

বাজারে সুন্দর ও সুস্থধারার চলচ্চিত্রের অভাব নেই– এটা শুনে পাঠকরা হয়তো চোখ কপালে তুলবেন। সত্যি বলতে শিক্ষামূলক, মার্জিত ও সুস্থধারার অনেক চলচ্চিত্র এখনও তৈরি হচ্ছে, তবে তা দর্শক মহলে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। হল মালিক এমন কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শনে রাজি হবে না, যেখানে বাণিজ্যিক ঝুঁকি রয়েছে। সবার মনে এমন একটি ধারণা গেঁথে বসেছে, নগ্নতা ও যৌনতার সংস্পর্শ না থাকলে দর্শক সিনেমা হলে আসবে না।

তবে এই ধারণার বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দেন David Wark Griffith। ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে তিনি একটি শিক্ষণীয় চলচ্চিত্র তৈরি করেন। ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি সিনেমা হল ভাড়া নেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, চলচ্চিত্রটি বাণিজ্যিকভাবে বেশ সফল হয়। সেইসঙ্গে দর্শকরাও দারুণ মুগ্ধ হয়।

তাহলে ইহুদিরা এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে না কেন? আপনাদের বুঝতে হবে– যাদের মধ্যে শিক্ষা, সাহিত্য, আদর্শ ও নৈতিকতার জ্ঞান নেই, তারা কখনো নোংরামি ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। যে মাছ ধরতে জানে না, সে তো কেবল পানি-ই ঘোলা করবে। 'শিল্প' বিষয়টা কী, তা-ই তো ইহুদিরা জানে না। তারা বলে– দর্শক যা চাচ্ছে, আমরা তা-ই তৈরি করছি। এটা ঠিক যে, বর্তমান যুব সমাজের বিরাট একটা অংশ নৈতিকতা-বিবর্জিত। সমাজের এই অধঃপতন কীভাবে হয়েছে, তা ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যিশুকে আজ আমরা কজনই-বা স্মরণ করি! প্রতি সপ্তাহে কজন গির্জায় যাই? এমতাবস্থায় যৌনতা ভরা চলচ্চিত্রে দর্শকের অভাব হওয়ার কথা নয়।

Carl Laemmle একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং Universal Film Company-এর মহাপরিচালক। জন্মসূত্রে তিনি জার্মান ইহুদি। আমেরিকান দর্শকরা কোন ধরনের চলচ্চিত্র দেখতে আগ্রহী, তা জানার জন্য 'What Do You Want?' শিরোনামে তিনি একটি জরিপ করেন। Mr. Laemmle ধারণা করেছিলেন, হয়তো ৯৫ শতাংশ দর্শক বলবে তারা সুস্থধারার চলচ্চিত্র দেখতে আগ্রহী, কিন্তু ৬০ শতাংশ দর্শকই যৌনতাময় চলচ্চিত্রকে সমর্থন করে!

'কোকেন' যেমন একজন মাদকাসক্তের দৈনন্দিন চাহিদা, তেমনি যৌন চলচ্চিত্রও নৈতিকতা-বিবর্জিত সমাজের দৈনন্দিন চাহিদা। মাদকাসক্ত রোগীর সুস্থতার জন্য তাকে যেমন কোকেন থেকে দূরে রাখা উচিত, তেমনি সমাজে নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে যৌন দৃশ্যের প্রদর্শন বন্ধ করা উচিত। দর্শক যা চাচ্ছে, তা-ই তাদের দিচ্ছি– এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না।

অশ্লীল চলচ্চিত্রের নির্মাণ ঠেকাতে আমেরিকার বার কাউন্সিলে বেশ কয়েকটি প্রোডাকশান হাউসের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলা ঠেকাতে যে উকিল ও আইনজীবীগণ হাজির হন, তারা সবাই ছিলেন ইহুদি। যেমন : Meyers, Ludvigh, Kolm, Friend ও Rosenthal; এমনকী একজন রাবাইকে পর্যন্ত এই আন্দোলন ঠেকানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি খুব চৌকসভাবে একটি বক্তৃতা দেন। তার কিছুটা অংশ তুলে ধরা হলো–

'আমি একজন ইহুদি। আপনাদের কি মনে আছে, অশ্লীল থিয়েটারগুলো ইতঃপূর্বে আমাদের ধর্মকে ছোটো করে কত নাট্যশালার আয়োজন করেছে? দর্শকদের নিকট আমাদের ধর্মকে কতটা হাস্যরসাত্মক বানিয়েছে? আমাদের হৃদয়ে তা কতটা কষ্টের দাগ কেটেছে?'

তাদের ধর্মকে যদি কেউ ছোটো করে থাকে, তবে সেটা তারাই করেছে। আগেই বলেছি, শিল্পকলা সম্পর্কে খ্রিষ্টান শিল্পীদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। নিছক একটি ধর্মের পেছনে লাগার কোনো প্রয়োজন তাদের পড়েনি।

তিনি আরও বলেন– 'বিষয়টির সমাধান করতে আমরা B'nai B'rith নামে এক সংগঠন তৈরি করি। সংগঠনটি বর্তমানে Anti-Defamation League নামে পরিচিত, যার সদর দপ্তর শিকাগোতে অবস্থিত। আমরা একত্রিত হয়ে ক্যাথলিক গির্জা, সমাজের ধর্মীয় সব সংগঠন এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানদের নিকট চিঠি পাঠাই, যেন আমাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করে আর কোনো চলচ্চিত্র তৈরি না হয়। পৌরাণিক চরিত্রগুলো উপস্থাপন করতে সমস্যা নেই, কিন্তু তাদের নিয়ে যেন ব্যঙ্গ চিত্র করা না হয়। এরপর আমরা প্রতিটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি পাঠাই এবং ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করি, যেন এমন কোনো চলচ্চিত্র বা নাটকের অনুমতি দেওয়া না হয়, যেখানে আমাদের ধর্মকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফলাফল কী? আমরা কোনো কংগ্রেস বা আদালতে মামলা করতে যাইনি। আমরা কিন্তু আপনাদের মতো দলবেঁধে আন্দোলনও করিনি। আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়েছিলাম এবং একত্রিত হয়ে ধর্মবিরোধী চলচ্চিত্র নির্মাণ বন্ধ করেছি।'

সত্যিই যদি ধর্মকে অপবিত্রতার হাত থেকে রক্ষা করা Anti-Defamation Leauge-এর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে খ্রিষ্টান ধর্মকে যখন কলুষিত করা হয়, তখন তারা চুপ থাকে কেন? রাবাই যদি খ্রিষ্টানদের এত উপদেশ দিতে পারেন, তাহলে নিজেদের কেন এই উপদেশ দিচ্ছেন না?

রাবাই আরও বলেছেন– 'অশ্লীল-নোংরা থিয়েটারগুলো ইতঃপূর্বে বহুবার তাদের ধর্মকে ছোটো করেছে।'

বিশ্বাস করা যায়, আমেরিকার মাটিতে ইহুদি ধর্মকে ছোটো করা হয়েছে! এটা তো কোনো খ্রিষ্টানের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব! ভিনগ্রহের কোনো এলিয়েন যদি করে থাকে, তবেই মেনে নেওয়া সম্ভব। তাহলে তাদের ধর্মকে কীভাবে ছোটো করা হলো? উত্তর শুনলে পিলে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে।

কোনো জনসমাবেশে যদি যিশুকে স্মরণ করা হয়, তবে তা ইহুদিদের জন্য চরম অপমানকর বিবেচনা করা হয়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যদি জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে যিশুর নাম উল্লেখ করেন কিংবা কোনো চলচ্চিত্রে খ্রিষ্টধর্মকে মর্যাদার সঙ্গে প্রচার করা হয়, তবে সেটাকেও চরম অপমানকর মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সেকালে *Life of the Savior* নামক একটি চলচ্চিত্রের প্রচারণা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, উক্ত সিনেমায় যিশু ও খ্রিষ্টান ধর্মকে বড়ো করে উপস্থান করা হয়েছে।

Way Down East ও *The Shepherd of the Hills* চলচ্চিত্র দুটিকে কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? কারণ, গ্রাম্য জীবন, কৃষি সংস্কৃতি ও জীবন-প্রবাহ সম্পর্কে ইহুদিদের কোনো ধারণা ছিল না। গ্রামের মানুষদেরও যে একটা জীবন আছে, তা তারা বুঝতেই চাইত না। তাদের জন্ম হয়েছে বিভিন্ন শহুরের অলিতে-গলিতে, যেমন : ফ্রাঙ্কফুট, হ্যানয়, ওয়ারস, নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস ইত্যাদি। কৃষকরা তো তাদের কাছে হাসির পাত্র।

ইহুদিরা ভাবে– এই ধরনের চলচ্চিত্র দিয়ে তাদের বক্স অফিসে পয়সা আসবে না। সুতরাং এসবের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া তারা এটাও চায় না– এমন কোনো চলচ্চিত্রের প্রদর্শন হোক, যেখানে পুঁজিবাদ ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে গ্রাম্য কৃষকদের নিষ্পেষিত জীবনচিত্র ফুঁটে ওঠে।

চলচ্চিত্রশিল্প থেকে শালীনতা ও নৈতিকতা যে বহু আগেই বিদায় নিয়েছে, তা আমরা ভালো করে জানি। তারপরও অনেক সংগঠন এ পর্যন্ত ছোটোখাটো বহু আন্দোলন করেছে, কিন্তু ফলাফল কিছুই হয়নি। কারণ, আমরা সমস্যার মূল শিকড়ে পৌঁছাতে পারিনি। কে জানে, যারা আন্দোলন করছে তারা হয়তো ইহুদিদেরই কিছু সদস্য! আমরা যদি এসব সংগঠন ও সদস্যদের চিহ্নিত করতে না পারি, তাহলে বছরের পর বছর আন্দোলন করেও কোনো সমাধান হবে না।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পে ইহুদিদের একচেটিয়া আধিপত্য

একটা সময় ছিল, যখন ইহুদিরা খ্রিষ্টান ছদ্মবেশে ব্যাবসা-বাণিজ্য করত, যেন তাদের কেউ অবজ্ঞা না করে। তবে আজ তারা অনেক সাবলম্বী। সমাজে এখন নিজ পরিচয়ে কাজ করতে পারে। সম্পদ তো অনেক হলো, এবার কিছু খ্যাতি কামানো দরকার! সেই কাজটা করে দিয়েছে চলচ্চিত্র শিল্প, যা আজ তাদের মিলিয়ন ডলার উপার্জনের রাস্তা করে দিয়েছে। এখন তাদের প্রথম লক্ষ্য, যেভাবেই হোক সিনেমা হলগুলোতে দর্শক বাড়াতে হবে। দেখবেন, দিন-রাত সিনেমা হলগুলোতে মানুষের উপচে পরা ভিড়। এমন তো নয়– প্রতিদিন-ই সুন্দর সুন্দর চলচ্চিত্র, গল্পনাট্য ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন হচ্ছে, তাহলে মানুষ হলগুলোতে প্রতিদিন কী দেখার জন্য এত ভিড় করে?

কেউ না কেউ তো আছেই, যে আমাদের মগজ নিয়ন্ত্রণ করছে। এটা ঠিক, আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই ইহুদিরা আবিষ্কার করেছে, কিন্তু তার অধিকাংশই মানব সভ্যতার কোনো উপকারে আসেনি। কারণ, এগুলো দিয়ে কেবল সভ্যতাকে ধ্বংসই করা যায়; গড়া সম্ভব নয়।

যে প্রতিষ্ঠানগুলো আজ পুরো পৃথিবীর চলচ্চিত্রশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : The Famous Players, Selznick, Selwyn, Goldwyn,

Fox Film Company, The Jesse L. Lasky Feature Play Company, United Artists' Corporation, The Universal Film Company, The Metro, Vitagraph, Seligs, Thomas H. Ince Studios, Artcraft, Paramount Picture ইত্যাদি। এবার প্রতিষ্ঠানগুলো কাদের হাতে জন্ম নিয়েছে এবং কারা পরিচালনা করছে, তা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

The Famous Players প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালক হলেন Adolph Zukor। তিনি একজন হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি। চলচ্চিত্র জগতে আসার আগে নিউইয়র্কের হ্যাস্টার স্ট্রিটে পশমি পণ্যের ব্যাবসা করতেন। মানুষের ঘরে ঘরে পণ্য ফেরি করতেন। জীবনের প্রথম সঞ্চিত অর্থ তিনি 'নিকেল থিয়েটারে' বিনিয়োগ করেন এবং Marcus Loew-এর সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করেন।

Adolph Zukor পরবর্তীকালে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিজের ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। যেমন : Famous Players-Lasky Corporation, The Oliver Morosco Photoplay Company, Paramount Pictures Corporation এবং Artcraft Pictures। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি আমেরিকার অন্যতম ধনকুবের হয়ে ওঠেন।

অনেকে বলে United Artists Corporation জ্যান্টাইলদের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু American Hebrew ম্যাগাজিনের একটি আর্টিক্যাল অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালক হলেন Hiram Abrams। এটি একসময় চারজন তারকা অভিনেতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের নাম হলো Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin ও David Wark Griffith। জন্মসূত্রে Hiram Abrams রাশিয়ান ইহুদি। ওরেগন শহরে থাকাকালে তিনি সংবাদপত্র বিক্রি করতেন। কিছুদিন পর 'Penny Arcade' নিয়ে কাজ শুরু করেন। Paramount Pictures Corporation-এর তিনি একজন যৌথ প্রতিষ্ঠাতা এবং এর কিছুদিন পরই প্রেসিডেন্ট হন।

Fox Film Corporation ও Fox Circuit Theater প্রতিষ্ঠান দুটি William Fox-এর একক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। তিনি একজন হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি। ধারণা করা হয়– তার প্রকৃত নাম William Fuchs। একসময় তিনি স্পঞ্জ কাপড়ের বাণিজ্য করতেন। তা ছাড়া 'Penny Arcade' বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে তিনি পেশাজীবন শুরু করেন। এটি অনেকটা বায়োস্কোপের মতো। বাক্সের ভেতর নাটাইয়ের একটি রিলে অনেকগুলো পর্ন ছবি স্থিরচিত্র আকারে সাজানো থাকত। বাক্সের ফুটায় চোখ রাখা মাত্রই রিল ঘুরিয়ে স্থির চিত্রগুলো পর্যায়ক্রমে দেখানো হতো। কিছু কয়েনের বিনিময়ে যে কেউ-ই এসব দেখতে পারত।

Metro Pictures Corporation গড়ে তোলার পেছনে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন Marcus Loew। সেকালে তিনি আমেরিকার ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শেয়ারহোল্ডার ছিলেন।

চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে Marcus Loew ও Adolph Zukor খুব পরিচিত দুটি নাম। তারা উভয়েই একসময় পশমি পণ্যের বাণিজ্য করতেন। Zukor একাই চলচ্চিত্র শিল্পে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে Loew-এর প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন। তিনি সবচেয়ে বেশি তৈরি করতেন Vaudeville শ্রেণির চলচ্চিত্র, যা মূলত নীচু শ্রেণির হলগুলোতে দেখানো হতো। পরবর্তী সময়ে তিনি একাই ১০৫টি সিনেমা হল গড়ে তোলেন।

Goldwyn Film Corporation পরিচালনা করতেন Samuel Goldwyn, যিনি ছিলেন একজন পোলিশ ইহুদি। চলচ্চিত্র শিল্পে আসার পূর্বে তিনি বিভিন্ন পণ্যের পাইকারি ব্যবসায় করতেন। ১৯১২ সালে Jesse Lasky ও Cecil DeMille-এর সাথে ২০০০০ ডলার বিনিয়োগ করে তার প্রথম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এতে তিনি এতটাই লাভ করেন যে, পরবর্তীকালে ২০০০০০০০ ডলার বিনিয়োগ করে Shuberts, A.H.Woods ও Selwyns-কে সাথে নিয়ে আরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে মূলত জ্যান্টাইল লেখকদের গল্প-উপন্যাস নিয়ে নাটক-চলচ্চিত্র তৈরি করা হতো।

Universal Film Company বাজারের অনেকের নিকট Universal City নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে Carl Laemmle-এর একক নিদের্শনায়। তিনি একজন জার্মান ইহুদি। ১৯০৬ সালে এই শিল্পে তিনি প্রথম পা রাখেন। পূর্বে তার কাপড়ের ব্যাবসা ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন নতুন ট্রাস্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়, তখন তিনি সুকৌশলে সেখানে প্রবেশ করেন। পরে ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস Universal City প্রতিষ্ঠা করেন।

Select Picture Corporation ও Selznick Pictures প্রতিষ্ঠান দুটি গড়ে উঠে Lewis J. Selznick-এর একক নেতৃত্বে, যিনি ছিলেন একজন রাশিয়ান ইহুদি। একসময় তিনি World Film Corporation-এর সহকারী পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

এরা ছাড়াও ইহুদিদের আরও অনেক সদস্য রয়েছে, যারা সরঞ্জামাদি প্রস্তুত, অভিনেতা বাছাই, শুটিং স্থান নির্ধারণ, সিনেমা হল তৈরি, বিজ্ঞাপনের প্রচার, বাজারে টিকেটের চাহিদা বৃদ্ধি করাসহ এ জাতীয় বিভিন্ন কাজ করত।

আমাদের চারপাশে আজ অনেকের দেখা মিলবে, যাদের নিকট চলচ্চিত্রই একমাত্র বিনোদন মাধ্যম। অনেকে আছে, যাদের দিনে একবার হলেও সিনেমা হলে যেতে হয়। আবার কেউ কেউ আছে, যাদের দুপুর ও রাতে দুইবার যেতে হয়। এখন তো প্রায় সিনেমা হলগুলোই দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। অনেকে তো দিনের ৩/৪ ঘণ্টা সময় শুধু এসব দেখেই কাটিয়ে দেয়। মূলত আমাদের মস্তিষ্কে নাটক-সিনেমার প্রতি এক অদম্য ক্ষুধার জন্ম নিয়েছে। বাজারে এসবের চাহিদা এতটা বেড়েছে–

এতগুলো প্রতিষ্ঠান মিলেও এই চাহিদার জোগান দিতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই মানুষ একই নাটক-চলচ্চিত্র বারবার দেখে সময় কাটাচ্ছে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, ভালো জিনিস প্রতিদিন তৈরি করা যায় না। তাই আজ যেসব চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটা হয়তো ভালো, আর বাদবাকি সব বস্তাপঁচা জিনিস। মানুষ কষ্ট করে যে অর্থ উপার্জন করে, তা নোংরামিতে ভরা চলচ্চিত্র দেখে নষ্ট করে।

চলচ্চিত্রে ইহুদি চরিত্রগুলো তখনই আনা হয়, যখন তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হয়।

১৯১১ সালে Triangle Shirtwaist Factory-তে আগুন ধরে প্রায় ১৫০ জন পোশাককর্মী মারা যায়, যাদের বেশিরভাগই ছিল নারী। এই গল্পের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক মেয়র একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন; যার নাম হবে 'The Locked Door'। গল্প লেখার দায়িত্ব পেলেন একজন ইহুদি, যিনি বিভিন্ন Holocausts-এর ওপর আগেও অনেক গল্প লিখেছেন। দুর্ঘটনায় যে নারীরা মারা যায়, তাদের চরিত্রে তিনি ইহুদি মেয়েদের চরিত্র ঢুকিয়ে দেন, যাদের নামমাত্র মূল্যে পোশাক শিল্পের মালিকরা খাটিয়ে মারছে। আগুন লাগার পর তারা বেরিয়ে আসার কোনো পথ পায়নি। কারণ, প্রধান ফটক বন্ধ ছিল। ঠিক এ রকম সুবিধাজনক জায়গাগুলোতে তারা নিজেদের চরিত্র প্রবেশ করায়। আর যখন রাবাইদের ভূমিকা আসে, তখন পূর্ণ ধর্মীয় সম্মানের সঙ্গে তাদের উপস্থাপন করা হয়।

চলচ্চিত্র শিল্পে খ্রিষ্টান ধর্মকে কতটা নোংরা করা হয়েছে, তা বিগত অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শুধু যিশুকে ব্যঙ্গ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; ধর্মীয় গুরু ফাদার ও পোপদের নিয়েও অনেক নোংরা চরিত্রের জন্ম দিয়েছে। খুনি, সন্ত্রাসী, পর্নগ্রাফি, ড্রাগ ব্যবসায় ইত্যাদি প্রতিটি চরিত্রে তাদের উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে ইহুদিদের দুটি লাভ হয়েছে :

এক. খ্রিষ্টানদের ধর্মভক্তি হ্রাস পেয়েছে।

দুই. পকেটে মুনাফার অঙ্ক ভারী হয়েছে।

আজ অনেককে বলতে শোনা যায়– 'ধর্ম বলতে কিছু নেই, এটা মানুষের সৃষ্টি। যারা নিজেদের ধার্মিক বা ধর্মীয় গুরু বলে দাবি করে, তারা আসলে ধর্ম বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের রাস্তা করছে।' মূলত এই নাস্তিকতার প্রসার ইহুদিদের হাত ধরেই হয়েছে।

সবকিছু যে ইহুদিদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের অংশ, তা কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? এই শিল্পে এখন একটি বিষয় নিয়মিত দেখা যাচ্ছে। অনেক খ্রিষ্টান লেখক ইহুদিদের জন্য গল্প লিখছে। অথচ তারাই একসময় ইহুদিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। আর আজ তারা হলোকাস্ট ও পৌরাণিক কাহিনিগুলো নিয়ে একের পর এক গল্প লিখে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, মানুষকে ইহুদিতন্ত্রে ধাবিত করতে তারা কতটা সফল হয়েছে।

(শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গত ৭০ বছরে শুধু হলোকাস্টের ওপর হলিউডে ২৩০টিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, যেন মানুষের মনে ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা যায়।)

আজ কে স্টার হবে, তা প্রডিউসার ও পরিচালকদের ওপর নির্ভর করে। যদি কোনো অভিনেতা তাদের গল্পে অভিনয় করতে রাজি না হয়, তাহলে সে সেখানেই বাদ পড়ে। তাই অনেক অভিনেতাকে আজ বিভিন্ন নোংরা পথ পাড়ি দিয়ে স্টারের খেতাব অর্জন করতে হচ্ছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেও অনেকে স্টার হচ্ছেন। যেমন : সিনেমা পরিচালক ও প্রডিউসারের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজন।

আরেকটি বিষয় খেয়াল করার মতো। সবাইকে কিন্তু একই শ্রেণির স্টার বানানো হয় না। কাউকে প্রথম শ্রেণির, কাউকে দ্বিতীয় শ্রেণির, কাউকে তৃতীয় শ্রেণির। বাদবাকিরা থাকে পার্শ্ব চরিত্রে। এর ফলে কী হয়? প্রতি শ্রেণির স্টারের জন্য নির্দিষ্ট একটি পারিশ্রমিক বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো স্টার চাইলেও প্রথম শ্রেণির মতো পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না। আর পার্শ্ব চরিত্রের অভিনেতারা তো পরিচালক ও প্রডিউসারদের দয়া-মায়ার ওপর নির্ভর করে। একটু খেয়াল করলে দেখবেন– প্রত্যেক অভিনেতাই নিজস্ব অবস্থান থেকে যথেষ্ট ভালো অভিনয় করছে। তারপরও সবাই একই শ্রেণির স্টার হতে পারছে না। মূলত এই বিভাজন আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প তৈরি করেছে। নাটক-চলচ্চিত্রের চাহিদা বাজারে যত বাড়বে, স্টারদের এমন বিভাজন ততই বাড়বে।

সংগীতশিল্প ধ্বংসে ইহুদিদের পরিকল্পনা

New York Times প্রতিষ্ঠানটির মালিক আমেরিকার একজন প্রতাপশালী ইহুদি। তবুও ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি কলাম প্রকাশ করে, যার ফলে তাদের অ্যান্টি-সেমেটিক বলে অভিযুক্ত করা হয়। কলামটির কিছু অংশ উপস্থাপন করা হলো :

'Irving Berling ও Leo Feist-সহ আরও কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সাতটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমেরিকার প্রায় ৮০ ভাগ কপিরাইটযুক্ত সংগীত নকল করে বাজারে পরিবেশন করছে। একই সঙ্গে তা পর্ন চলচ্চিত্রের আবহ সংগীত (Background Music) হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। টেক্সাস প্রদেশের Federal District Court-এ এ নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পিয়ানো থেকে শুরু করে জনপ্রিয় অনেক বাদ্যযন্ত্রের সুর তারা যথেচ্ছা নকল করে যাচ্ছে। দেখা যায়– দুই-তিনটি সংগীতের সুর একত্রিত করে তারা একটি নতুন সুর তৈরি করছে।

অভিযুক্ত সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো : Consolidated Music Corporation, 144 West Thirty-seventh street, Irving Berlin Inc, 1567 Broadway; Leo Feist Inc,

231 West Fortieth Street, T. B. Harms, Francis, Day and Hunter Inc, 62 West Forty-fifth street, Shapiro, Bernstein & Company, *218 West Forty-seventh street*, *Watterson*, Berlin & Synder Inc, *1571* Broadway and M. Witmark & Sons Inc, 144 West Thirty-seventh street.

এই প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত Consolidated Music Corporation-এর মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের পরিচালনা করছে।'

১৮৮০-এর দশকে ইউরোপ-আমেরিকার সংগীত শিল্পে বড়ো ধরনের এক বিপ্লব ঘটে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই শিল্পে অনেক ভারী ভারী বাদ্যযন্ত্রের আগমন ঘটতে দেখা যায়। জন্ম নেয় জনপ্রিয় অনেক সংগীত রীতি। যেমন : Monkey Talk, Jungle Sequals, Grunts & Squaks, Gasps ইত্যাদি। এই সময় বিভিন্ন ব্যান্ড হাউজগুলোর মাঝে কাঁদা ছোড়াছুড়ির ঘটনাও শুরু হয়। হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া একটি শক্তির দাপটে বাজারের জনপ্রিয় অনেক ব্যান্ড দল তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে পড়তে থাকে। দিশেহারা হয়ে পড়ে সেই হাউসগুলোতে কর্মরত বাদক, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীরা। সুযোগ বুঝে সেই দাপুটে শক্তিটি অর্থের জোরে তাদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। তাদের মেধাকে ব্যবহার করে তৈরি করে নতুন সব অর্কেস্ট্রা এবং সংগীত রীতি, যা আজ অবধি বাজারে টিকে আছে। বর্তমান এই শিল্পে যে ধাতবযন্ত্রকেন্দ্রিক নির্ভরতা, তা তাদের হাত ধরেই হয়েছে। এ ছাড়া জ্যাজ সংগীতের পুরোটাই ইহুদিদের আবিষ্কার।

ওপরে যে সাতটি প্রতিষ্ঠানের নাম বলা হয়েছে, তারা একাই আমেরিকার ৮০ ভাগ সংগীতশিল্প নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকি যে ২০ ভাগ রয়েছে– তাও ইহুদিদের ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে। অবাক না হয়ে পারা যায় না– যেদিকে তাকাই, সেদিকেই ইহুদিদের সংগীত দল! অথচ তারা আদৌ সংগীতের ব্যাকরণ বুঝে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তথাপি এটাও যে অর্থ উপার্জনের খনি হতে পারে, তা ইহুদিরা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল।

হঠাৎ এই অশুভ শক্তিটির আগমন বুঝতে পেরে তৎকালীন সংগীত বিশেষজ্ঞগণ যেসব আশঙ্কা বাণী ব্যক্ত করেছিলেন, তা *New York Times*-এর সেই কলামটিতে ছাপানো হয়। যেমন :

'পশ্চিমা সংগীতশিল্প ইহুদিদের সংক্রমণে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমেরিকার অবস্থা তারচেয়েও খতরনাক। আজ যদি তাদের এই শিল্প থেকে নিষিদ্ধ করা হয়, তবে পুরো সংগীতশিল্পকেই বন্ধ করে দিতে হবে। এই শিল্প যেন নীরস-নিস্তেজ হয়ে পড়বে। তাদের ছলনাময়ী সংগীত সুগভীর দক্ষতায় আমাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। প্রথমত, তাদের কিছু সারেগামা আছে, যা মানুষের মনে ত্বরিত আনন্দ তৈরি করে;

যদিও তা ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষেত্রে তারা উচ্চ ধাতব সুর (High Metalic Music) ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত, তাদের সংগীতের আরেক শ্রেণি চিকন ও আবেগি সুরের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্ত মানুষদের সাময়িক আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে। এটা মনে নেশাগ্রস্তের ন্যায় আবহ তৈরি করে। তৃতীয়ত, আবেগপ্রবণ (Romantic) ও কল্পনাপ্রেমী মানুষদের জন্য তাদের আরেকটা শ্রেণি রয়েছে। তারা দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের হিব্রু শিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছে এবং তা যুবসমাজের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আজকের সংগীতশিল্পকে যারা নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা মূলত ইউরোপিয়ান ইহুদি। আজকের তরুণ প্রজন্ম প্রকৃতপক্ষে তাই গাচ্ছে, যা তারা শিখিয়ে দিয়েছে। বিশ্বের বড়ো বড়ো ব্যান্ড হাউসগুলো ছাড়াও সংগীত পরিবেশনকারী কোম্পানিগুলোও তাদের আজ্ঞাধীন হয়েছে। যখনই কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব হয়, তখন তাদের অর্থের জোড়ে কিনে নেওয়া হয়। তা ছাড়া বাজারে সংগীতের প্রতিটি বিপণিবিতানেও ইহুদিদের আধিপত্যের কমতি নেই। শহরের বিভিন্ন অলিতে-গলিতে, এমনকী পাড়া-মহল্লার আশেপাশে গড়ে উঠা বিপণিবিতানগুলোতেও তাদের এজেন্টরা বসে আছে। অথচ তাদের অধিকাংশই জ্যান্টাইল এজেন্ট! তারা কেবল সেসব সংগীতের অ্যালবাম বিক্রি করে, যার অর্ডার ইহুদিদের কাছ থেকে আসে। ফলে প্রতিভাবান কোনো খ্রিষ্টান চাইলেও তার সংগীত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। কারণ, তার পেছনে কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই। ফলে তাকে বাধ্য হয়ে সেই অপশক্তির নিকট ধরনা দিতে হচ্ছে। যেমন : তাদের অন্যতম একটি প্রতাপশালী প্রতিষ্ঠান হলো Tin Pan Alley, যা আজ অবধি বাজারে টিকে আছে।'

একটি বিষয় বলে রাখা উচিত, ইহুদিরা সহজে নতুন কোনো গান বা সুর তৈরি করে না; আসলে তাদের সেই ক্ষমতাও নেই। তারা অন্য গানের সুর চুরি করে নতুন সুর করে এবং তা দিয়ে নতুন গান তৈরি করে। পুরাতন গানের বই, সারেগাম নোট, অপেরা স্বরলিপি, পল্লিগীতি ইত্যাদি সব খুঁজে খুঁজে তারা নিজেদের কাছে জমা করে। এসব মৌলিক সংগীতকে নিজেদের ধাতব যন্ত্রের (Metalic Instrument) নিচে রেখে বহুমাত্রিক সুর তৈরি করে। এভাবে তারা সংগীতজগতে নিজেদের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। বর্তমান যুগে আপনারা যেসব গান শুনছেন, তার অধিকাংশই শেষ প্রজন্ম বা তার আগের প্রজন্মের গেয়ে যাওয়া গানের বিকৃত রূপ। এই চৌর্যবৃত্তির ওপর প্রশ্ন করা হলে তারা বলে– 'আমরা তো চুরি করছি না, কেবল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংগীতে পরিবর্তন আনছি।'

সাধারণত জ্যান্টাইলদের সংগীতানুষ্ঠানগুলোতে কেবল সম্পদশালীরাই যাওয়ার সুযোগ পায়। কারণ, জ্যান্টাইলরা যা তৈরি করে তা নিখাদ মৌলিক সংগীত। এ জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। তাই তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানের টিকেটের মূল্যও অনেক বেশি হয়।

১৮৮০ সালের একটি ঘটনা। জ্যান্টাইলদের একটি সংগীত ধনী-গরিব সবার মাঝে প্রচুর জনপ্রিয়তা পায়, কিন্তু ধনীরা সেই সংগীত শুনতে পেলেও ব্যয়বহুল হওয়ায় গরিবরা তা থেকে বঞ্চিত হয়। ইহুদিরা এই সুযোগটিই লুফে নেয়। তারা পরিকল্পনা করল প্রতিটি গান নকল করার। কিন্তু গানগুলোর সারেগাম এতটাই কঠিন ছিল, তারা তা ভাঙতেই পারল না। ফলে নতুন আরেকটি পরিকল্পনা আটল; সুর একই থাকবে, সাথে নতুন গীতিকবিতা জুড়ে দেওয়া হবে এবং জ্যাজ ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে মূল সুরের মাঝে সামান্য বৈচিত্র্য আনা হবে।

মজার বিষয় হচ্ছে– তারা এখানেও চরমভাবে পরাজিত হলো, এমনকী নিজেদের হাসির পাত্র বানিয়ে ছাড়ল। মানুষকে ধোঁকা দিতে তারা ইংরেজি বাক্যের পরিবর্তে ইডিশ বাক্য ব্যবহার করল। তাই তাদের শিল্পীরা কী উচ্চারণ করছিল, তার একটা শব্দও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি। শুধু নাক টেনে সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরো সময়টা পার করে দেয়। প্রথমে একক সংগীত পরে যৌথ সংগীত; প্রতিটি গানেই ছিল একই সুর। দর্শক-শ্রোতারা এই রম্য অভিনয় দেখে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েছিল।

এরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ১৮৮৫ সালে Tin Pan Alley নিউইয়র্ক শহরে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। তারা ভালো কণ্ঠশিল্পী, লেখক ও প্রতিভাবান সুরকারের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ দল গঠন করে। অবুঝ শিল্পীরা ভেবেছিল– নামকরা এই সংগীত প্রতিষ্ঠানটি হয়তো বাজারে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাবে। কিন্তু তাদের যে কেবল ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তা অনেক পরে বুঝতে পারে। শুরু হয় মৌলিক সংগীত রচনা এবং বাজারের বিখ্যাত সব সংগীতের সারেগাম উদ্ধারের মিশন।

এই উদ্যোগের পেছনে প্রথমে যার নাম আসে, তিনি হলেন Julius Witmark। তার হাতে সংগীতশিল্প প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকতার ছোঁয়া পায়। তার সংগীত প্রতিষ্ঠানের নাম M. Witmark & Sons, যা ১৮৮৬ সালে নিউইয়র্ক শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে তিনি ছিলেন একজন ব্যালাড (Bllad/লোকসংগীত শিল্পী)।

এরপর আসে Irving Berlin-এর নাম। তার প্রকৃত নাম Isadore Baline। পেশা ছিল গান লেখা ও সুর করা। ১৮৯৫-১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংগীত শিল্পের ইতিহাসে 'Rag-time' বলা হয়। এই সময়টিতে জ্যাজ সংগীত পুরো আমেরিকায় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে। Irving Berlin ছিলেন এই সংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ। তার বিশেষ একটি কৃতি হলো– ১৯১১ সালে পরিবেশিত 'Alexander's Rag-Time Band' গানটি। এর জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই একটি গানই তাকে রাতারাতি অগাধ সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়। এই সংগীতের পেছনে Joe Frisco-এর অবদান নেহায়েত কম নয়। তাকে সে সময় বলা হতো জ্যাজ সংগীতের স্বঘোষিত বাদশাহ।

কিন্তু আপনি যদি তার জনপ্রিয় অ্যালবাম 'Berlin Big Hits'-এর গানগুলোর ওপর গবেষণা করেন, তবে দেখবেন– প্রতিটি গানের সুরই জোড়া-তালি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আরও ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে– প্রতিটি গানে ব্যবহার করা হয়েছে অকথ্য অশ্লীল শব্দ। অনেকের মনে হবে এই গানগুলো যেন পর্ন ছবির ধারা বিবরণী। এমন কয়েকেটি গান হলো : 'Harem Life'; 'You Cannot Make Your Shimmy Shake on Tea'; 'I Like it' এবং 'Mary Green, seventeen'।

খুব ভালো হতো, যদি পুরো একটি গান এখানে তুলে ধরা সম্ভব হতো। কিন্তু অকথ্য ভাষা দিয়ে এই বইটি নোংরা না করাই ভালো। গানগুলো শুনে অনেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে, ইনি কি সেই মাতা মেরি, যিনি যিশুকে গর্ভে ধারণ করেছিলনে!

সংগীত শিল্পে তাদের দ্রুত সফলতা অর্জনের আরেকটি বড়ো কারণ রয়েছে। তাদের অশালীন ও অকথ্য গানগুলো সহজেই তরুণ সমাজের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে। তারা মুখে যা উচ্চারণ করছে, তার অর্থ হয়তো নিজেরাও জানে না। তারা গানের কথার চেয়ে সুরের প্রতি অধিক আগ্রহী। তাই জনপ্রিয় সব মৌলিক সংগীতের সুরগুলো ব্যবহার করে একাধিক সংগীত তৈরি করে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে, তাদের তৈরি করা নতুন গানগুলোর সুর-তাল-লয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়, তবে সুরের ছন্দ ও কাঠামো একই থাকে।

বিভিন্ন শ্রোতার চাহিদার ধরন অনুযায়ী তারা সংগীত বাজারকে কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। প্রথম শ্রেণিতে থাকছে তরুণ শ্রোতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে বয়স্ক শ্রোতা। এর মধ্যে রয়েছে আরও অনেক বিভাজন। যেমন : কেউ উচ্চ ধাতব গান পছন্দ করে, কেউ চিকন সুরের গান পছন্দ করে, কেউ-বা মাঝারি সুরের গান পছন্দ করে। এবার তারা কোনো একটি মৌলিক গানের ছন্দ ঠিক রেখে সুর-তাল-লয়-এর মধ্যে পার্থক্য এনে প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা গান ও সুর তৈরি করে। এভাবেই ছোট্ট একটি কৌশল ব্যবহার করে এবং খুব অল্প পরিশ্রমে তারা একাধিক গান তৈরি করে চলেছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকৃত শিল্পীরা কখনো পেরে উঠছে না। কারণ, তারা চৌর্যবৃত্তিতে অভ্যস্ত নয়।

মানুষ এখন মৌলিক সংগীত নিয়ে একেবারেই গবেষণা করে না। ফলে এই শিল্পে বিশেষজ্ঞ না হলে কারও পক্ষে ইহুদিদের চৌর্যকর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর যারা সাধারণ শ্রোতা, তাদের পক্ষে তো কখনোই নয়। এবার কিছু বিখ্যাত গানের নাম জানিয়ে রাখছি, যা চাইলে যাচাই করে দেখতে পারেন : I'll Say She Does; You Cannot Shake That Shimmy Here; Sugar Baby; In Room 202; Can You Tame Wild Wimmen? চাইলে আরও অনেক গানের নাম এই তালিকায় আনা সম্ভব।

সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক সম্প্রদায়, অভিভাবক শ্রেণি ও সুশীলসমাজ আজ একটি বিষয় ভেবে খুবই বিচলিত, কী এমন নেশা যুবসমাজকে পেয়ে বসেছে যে, তাদের একদল সারাক্ষণ কেবল হতাশার গান শুনতেই পছন্দ করে? আরেক দল তো অশ্লীল ভাষার মধ্যেই ডুবে আছে!

যখন আমাদের সন্তানদের ড্রাগের নেশা পেয়ে বসেছিল, তখন কিন্তু শাসন করেও লাভ হয়নি। কারণ, ড্রাগ নিজ দায়িত্বে তাদের হাতে এসে হাজির। যতদিন না মূল উৎসে আঘাত হানা সম্ভব, ততদিন এই অপশক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। ড্রাগের মতো সংগীতশিল্পও এখন আমাদের যুবসমাজকে পেয়ে বসেছে। আজ যেকোনো সামাজিক পালা-পার্বন বা অনুষ্ঠানে এই গানগুলো উচ্চ শব্দে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলাফলও আমরা অনুধাবণ করতে পারছি। এসব গান কখনো আমাদের মনে চিরস্থায়ী আনন্দের জোগান দিতে পারে না; বরং আমাদের থেকে অধ্যাত্মিকতা নামক বিষয়টি ধ্বংসের মাধ্যমে কামুক করে তুলছে।

ইডিশদের খেলায় চিরস্থায়ী বলতে কিছু নেই। আপনি যেকোনো একটি পিয়ানো ক্লাবে যান, তাদের জিজ্ঞেস করুন তিন সপ্তাহ আগে কোন গানটি জনপ্রিয় ছিল? দেখবেন সে বলতে পারছে না। কারণ, সব সংগীতের ছন্দ তো একই রকম। কোনটা বাদ দিয়ে সে কোনটার নাম বলবে? শুধু যে সংগীত শিল্পের বেলায় এমনটা ঘটছে তা নয়; থিয়েটার, চলচ্চিত্র, পোশাক-আশাক, খাদ্য, রুচি, ফ্যাশন ইত্যাদি সবকিছুতে একই রূপ। এত কিছুর পরও আমরা মাঝে মাঝে ভালো জিনিস পাচ্ছি। হয়তো কোনো নির্মাতা তার সর্বস্ব উজাড় করে, মুনাফার প্রতি মায়া না করে কেবল নিজেরে শখ মেটাতে নান্দনিকতার জন্ম দিচ্ছে!

জাতিগতভাবে আজ আমরা এতটা বিভক্ত হয়ে পড়েছি যে, চাইলেও এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখতে পারব না। এর কারণ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ ব্যতীত এই অপসংস্কৃতি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার ভিন্ন কোনো উপায় নেই।

সংগীত শিল্পে অশ্লীলতা সংযোজনের ইতিহাস

সংগীত চর্চা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও এই শিল্পের চর্চা ছিল এবং সেখানেও আবেগ, বিরহ, ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সে যুগেও তরুণরা চলার পথে গুণগুণ করে গান গাইত, কিন্তু তখনকার গানের লিপি আর আজকের গানের লিপির মধ্যে রয়েছে অনেক ফাঁরাক। সত্যি বলতে, এটাকে জনপ্রিয় শিল্পরূপে জ্যান্টাইলরাই প্রতিষ্ঠা করেছে। আর ইহুদিরা এই শিল্পকে নোংরা-আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করছে। প্রেমের গান এখন আর ভালোবাসার জন্ম দেয় না; জন্ম দেয় কাম-উদ্দীপনার।

তরুণ সমাজ হয়তো বলবে– 'বর্তমানে আমরা যেসব জনপ্রিয় গান শুনছি, তার মধ্যে খারাপের তো কিছু দেখছি না। এসব শুনে তো আমাদের ভালোই লাগে!' তাদের উদ্দেশ্যে বলা প্রয়োজন, পছন্দ-অপছন্দ কিন্তু মানুষের অভ্যাসের একটি অংশ। এই অভ্যাস যে দুই-এক বছরে তৈরি হয়েছে, তা নয়। আগের অধ্যায়ে 'Rag-time' নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এটা এমনই একটি সময়কাল, যখন সংগীত শিল্পে খুব পরিকল্পিত উপায়ে নোংরা আবর্জনার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। সেই ইতিহাস তরুণসমাজ মোটেও জানে না। যে প্রজন্মগুলো এই বিপ্লবপরবর্তী সময়কালে বড়ো হয়েছে, তারা এসব সংগীত শুনেই বড়ো হয়েছে। তারা কী করে বুঝবে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ!

১৮৮০ সালের পূর্বেও এই নোংরা সংগীত সংস্কৃতির চর্চা ছিল, তবে তা একটি ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ ছিল। সমাজ থেকে বহুদূরে নির্দিষ্ট কোনো বায়েজিখানায় এসব নোংরা গানের চর্চা হতো। মুক্ত উদ্যানে বা জনসম্মুখে এসব গান পরিবেশনের কথা কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু ১৮৮০ সালের পর হঠাৎ এক বিবর্তন এসে আমাদের পুরো সভ্য সংস্কৃতিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

পুরোনো গানের কথা কখনো ভোলা সম্ভব নয়। সেসব গান বহু যুগ পরেও অমর হয়ে থাকে। কিন্তু বাজারে আজকে যা জনপ্রিয় গান, তার কথা এক-দুই মাস পর কেউ মনে রাখবে কি না সন্দেহ। আপনাদের হয়তো 'Listen to the Mocking Bird' গানটির কথা মনে আছে। বহু বছর পরও তা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। তবে যে পাখির কথা এখানে বলা হয়েছে, তা এখন হাঁস-মুরগির গানে পরিণত হয়েছে।

আরও আছে Ben Bolt, Nellie Grey, Juanita, The Old Folks at Home, The Hazel Dell, When You and I were Young, Maggie, Silver Threads Among the Gold। এগুলো আমাদের যুগের বিখ্যাত কিছু আবেদনময়ী গান। আজকের তরুণ সমাজ যারা এই অধ্যায়টি পাঠ করছে, তাদের উচিত নিজ উদ্যোগে এই গানগুলো শোনার চেষ্টা করা। তারপর এগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, বর্তমানে আপনারা কী ধরনের গানের চর্চা করছেন।

এমন আরও কিছু গান হলো– Annie Rooney, Down Went McGinty to the Bottom of the Sea, She's Only a Bird in a Gilded Cage, After the Ball is over। এদের মধ্যে নোংরামির কোনো ছায়া নেই।

মনোবিজ্ঞানীরা বলে, হতাশা ও বিরহের গান কিছুটা হলেও মানুষের মনে অলসতার জন্ম দেয়। তথাপি, My Wild Irish Rose ও In the Baggage Coach Ahead বিরহের গান দুটিতে এমন কিছু খুঁজে পাবেন না, যা আপনাকে খারাপের দিকে উসকে দেবে।

Jim Thornton-এর বিখ্যাত কিছু গান হলো– In the Shade of the Old Apple Tree, When the Sunset Turns the Ocean's Blue to Gold, Down by the Old Mill Stream, My Sweetheart's the Man in the Moon। আরও আছে Paul Dresser-এর বিখ্যাত গান, On the Banks of the Wabash এবং Charles Lawlor-এর বিখ্যাত গান, The Sidewalks of New York। এগুলো হলো সংগীত ইতিহাসের সম্পদ।

একসময় এ দেশে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংগীতেরও ভালো চর্চা ছিল। যেমন : Cheyenne, Hop on My Pony; Arawanna; Trail of the Lonesome Pine।

এরপর আসে আফ্রিকান সংগীত; যা আমাদের সমাজে সাপ হয়ে ঢুকে সর্বস্তরে বিষ পৌঁছে দেয়। এমন কিছু গান হলো– Congo; High Up in the Coconut Tree এবং Under the Bamboo Tree।

আফ্রিকান সংগীতের কাল থেকেই 'Rag-time'-এর আবির্ভাব। সংগীতশিল্প পরিবেশনে সংযোজন ঘটে 'Cake Walk' সংস্কৃতির (একটি নৃত্য দল, যেখানে মূলত নারীদের উপস্থিতি থাকে)। এমন একটি গানের উদাহরণ হচ্ছে– There'll Be a Hot Time in the Old Town Tonight। গানের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আবির্ভাব ঘটে একটি নতুন শব্দের 'ma baby'। সবার কানে বাজতে শুরু করে 'ma baby'। অপ্রয়োজনীয় ও অকথ্য বিষয়বস্তু দ্বারা গানের বাক্যগুলো শুরু হয়।

এরপর এসেছে 'Vamp Music'-এর যুগ। হাজারো নির্বোধ মেয়ে তাদের সৌন্দর্য বিকিয়ে দিতে মডেলিং পেশায় অংশগ্রহণ শুরু করে। Vamp সংস্কৃতির প্রথম আবির্ভাব হয় একটি ফরাসি উপন্যাসে, যা পরে নিষিদ্ধ করা হয়। সেখানে থিয়েটার প্রডিউসার Morris Gest গ্রিকদের প্রেমের দেবী 'Aphrodite'-কে নগ্নরূপে উপস্থাপন করে। ইহুদিরা যেভাবে তাদের সংগীত শিল্পে হেরেমবাসিনী মেয়েদের কাল্পনিক চরিত্র উপস্থান করেছে, তা Vamp-এর সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছে। এই কাজে তারা আমেরিকার সাদা চামড়ার কম বয়সি মেয়েদের যথেচ্ছা ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হতো না। দর্শকদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে– হেরেমবাসী মেয়েদের প্রকৃত চরিত্র হয়তো তা-ই, যা তারা উপস্থান করেছে।

এত সব অধঃপতনের পরও আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারছি না। কারণ, Anti-Defamation League। এই প্রতিষ্ঠানটি থিয়েটার, চলচ্চিত্র, ক্রীড়া, শিক্ষা, নেশাজ দ্রব্য ইত্যাদি প্রতিটি কাজেই ইহুদিদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা খুব ভালো করেই জানে, কোন পথে আমাদের আটকাতে হবে। কোথাকার আগুন পরে কোথায় গিয়ে লাগে– এই ভয়ে জ্যান্টাইলরা প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

সংগীত ও চলচ্চিত্র শিল্পে ইহুদিদের আবির্ভাবের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই জ্যান্টাইলদের বিরূপ ধারণা ছিল, তাই ইহুদি সংগীতশিল্পী বা তাদের কোনো অনুষ্ঠানের নাম শুনলে তারা উলটো দিকে পথ ধরত। তাদের থেকে দূরত্বের সর্বাত্মক মাপকাঠি বজায় রাখত, কিন্তু এখানেও তারা ধরা খায়। কারণ, ইহুদিদের রয়েছে 'ছদ্মনাম' কৌশল। এই একই কৌশলে তারা চলচ্চিত্র, থিয়েটার, শেয়ারবাজার ও ক্রীড়াশিল্পকেও নিজেদের করে নিতে থাকে। তারা বিভিন্ন ছদ্মনামে নিজেদের ব্যান্ডগুলোকে আমাদের মাঝে পরিচিত করা শুরু করে। যেমন : Geological Society এবং Scientific Society।

অমর শিল্প তৈরি করলে তো দ্রুত অর্থ উপার্জন সম্ভব নয়। তাই তাদের অমরত্বের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন প্রচুর গান, যা থেকে কাঁচা পয়সা উপার্জন করা সম্ভব। 'Rocked in the Cradle of the Deep'-এর সাথে I'm Always Chasing Rainbows গানটিকে মিলিয়ে দেখুন। এই দুটির গানের মিল বোঝার জন্য অন্তত সংগীত বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন নয়, 'Rocked in the Cradle of the Deep' নকল করে দ্বিতীয় গানটি তৈরি করা হয়েছে। মূলত দুটো গানই নকল হয়েছে 'Opus of Chopin' থেকে। এটা নিয়ে আদালতে দীর্ঘদিন মামলা হয়েছিল, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এরপর থেকে তারা গান চুরি করার অলিখিত বৈধতা পায়। গানের বাক্য যদি হুবহু না মেলে, তাহলে তাকে আর নকল বলা যায় না– এটাই ছিল আদালতের কথা। আর এটাও ঠিক, আইনজীবীরা তো আর সংগীত বিশেষজ্ঞ নয় যে গান চুরি ধরতে পারবে!

এমন নয় যে, বাজারে এসব উগ্র-সংগীতের উপচেপড়া চাহিদা রয়েছে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, বইটির একদম শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে–

> 'বিক্রয় শিল্পে ইহুদিদের মতো দক্ষ জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। বিক্রয় কাজে প্রতিবন্ধকতা তারা কোনোভাবে সহ্য করতে পারে না। একদিক দিয়ে আটকালে তারা নতুন আরেকটি পথ খুঁজে বের করে। বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির আবির্ভাবও ইহুদিদেরই হাত ধরেই।'

এটাই সংগীত শিল্পে তাদের সফলতার মূল কারণ। পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনে তারা নোংরা কাজ করতেও প্রস্তুত। এর প্রমাণ হচ্ছে– ইহুদিদের বিজ্ঞাপন হাউসগুলো। তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অশালীন ভঙ্গিমায় নারী মডেলদের উপস্থাপন করছে। তাদের শারীরিক সৌন্দর্যকে পণ্য বানিয়ে বিলবোর্ড, পোস্টার, ফ্লাইয়ার, ব্রসিউর ও ম্যাগাজিন ছাপাচ্ছে এবং তা সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। স্বভাবতই সমাজের হাতেগোনা কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত নীতিবান মানুষ ব্যতীত সবাই এসব বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ছে। তারা যেসব মিউজিক ভিডিও তৈরি করছে, তাতে উঠতি বয়সি অনেক তরুণ-তরুণী অবচেতন মনে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এসব কারণে তারা এই শিল্পে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থকড়ি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন যদি অর্থকে সফলতার মাপকাঠি ধরা হয়, তবে বলতে হবে ইহুদিরাই সফল।

তাদের আরও একটি বিশেষণ হলো– নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকা। অনেক পণ্যের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ যা পছন্দ করে, মূলত সেটাকেই জনপ্রিয় পণ্য বলা হয়। কিন্তু এমন যদি হয়– বাজারে কেবল একটি পণ্য রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তা ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন আর তাকে জনপ্রিয় পণ্য বলা চলে না। আজকের বাজারে যে গানগুলোকে আমরা জনপ্রিয় সংগীত বলে অভিহিত করছি, তা কেবল মাত্রাতিরিক্ত পুনরাবৃত্তির ফলাফল।

বিদেশি কোনো রাজকীয় অতিথি যখন আমেরিকা ভ্রমণে আসে, তখন তাদের আতিথেয়তায় জ্যাজ সংগীত পরিবেশন করা হয়। Prince of Wales যখন আমেরিকা ভ্রমণে আসেন, তার দেখাশোনার কাজে যে ছেলেটিকে রাখা হয়েছিল, তার নাম Rose। রোজের আমন্ত্রণে তিনি ইডিশ সংগীত নির্মাণ হাউস পরিদর্শনে হাজির হন। Prince of Wales ইডিশ সংগীত শুনে অসম্ভব মুগ্ধ হন; যদিও সেগুলো চুরি করে তৈরি করা ছিল। এরপর থেকে তিনি ইডিশ সংগীতের ভক্ত হয়ে যান।

আশা করি ইতোমধ্যেই উপলব্ধি করতে পারছেন, Charlie Chaplin-এর যে কমেডি চলচ্চিত্রগুলো আমরা দেখি, তার সাথে যে আবহ সংগীত (ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক) জুড়ে দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ জ্যাজ মিউজিক। কমেডি ছাড়া বিভিন্ন চলচ্চিত্রের থিম সংগীত তৈরিতেও আজ জ্যাজ বাদ্যযন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। চলচ্চিত্রের কোনো একটি অংশে দেখবেন, পেছন থেকে গান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং গল্পের নায়ক তার সাথে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে গান গাওয়ার অভিনয় করছে। এগুলোও জ্যাজ সংগীত।

মনে করুন, আপনার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য কোনো একটি রেস্টুরেন্ট বা কফি হাউসে গেলেন। খেয়াল করবেন– পেছন থেকে বাদকদল সংগীত বাজাচ্ছে, এর সাথে চলচ্চিত্রের নায়ক ঠোঁট নেড়ে নেড়ে অভিনয় করছে। আপনি বুঝতেও পারবেন না, কীভাবে এই সংগীতগুলো আপনার অবচেতন মনে জায়গা করে নিচ্ছে। একসময় আপনি নিজেও এই সংগীতগুলো গুনগুন করে গাইতে শুরু করবেন। শপিংমল, কফিশপ, সেলুন, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি যেখানেই যান না কেন দেখবেন, একই গান বাজছে কিংবা একই ছন্দের বিভিন্ন গান বাজছে।

ধরুন আপনার ছোট্ট মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু জামা কিনতে গেলেন। বাসায় এসে চেয়ারে আরাম করে বসামাত্র দেখবেন, আপনার মেয়ে শপিংমলে শোনা গানটি বিরবির করে গাচ্ছে। অর্থাৎ আপনি চাইলেও এই উগ্র সংগীতচর্চা এড়িয়ে যেতে পারছেন না।

ইহুদিদের প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির সংগীত রীতিতে বিভক্ত যেমন : Vamps, Harems, Hooch ও Hula Hula। তারা প্রতিটি সংগীত রীতির মধ্যে ইচ্ছা করেই প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দিয়েছে, ঠিক যেমনটা মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানগুলো একই প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ব্রান্ড বাজারে এনে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দেয়।

এখন কারও যদি Harem শুনতে ভালো না লাগে, তবে তার জন্য রয়েছে Vamp। অর্থাৎ আপনি যা-ই খুঁজুন না কেন, একটি দোকানেই সবকিছু পাবেন। আর বাজারে এই একটি দোকান বাদে আর কোনো দোকানের অস্তিত্ব নেই।

নোংরা গান লিখতে তো আর সৃজনশীলতা লাগে না! তাই হাজার হাজার গান তৈরি করতে ইহুদিদের তেমন পরিশ্রমও করতে হয় না। যদি এমন হয়– তাদের তৈরি করা কোনো গানে অশ্লীলতার আবহ নেই, তবে বুঝবেন সেই গানটি অন্য কোথাও থেকে চুরি করা হয়েছে! তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বছরব্যাপী যে পরিমাণ গান তৈরি করে, তার সিংহভাগ অন্য কোথাও থেকে চুরি করা।

ইহুদিরা পরিকল্পিতভাবে কিছু সমালোচক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। নতুন কোনো ইডিশ সংগীত মুক্তি পেলে তাদের ভাড়া করা সমালোচকদের একপক্ষ সেই গানের পক্ষে সাফাই গায়, অপর পক্ষ বিপক্ষে সাফাই গায়। আর জ্যান্টাইল সমাজ আগ্রহ ভরে বসে থাকে বিতর্কসভার চূড়ান্ত ফলাফল কী হয়, তা জানার জন্য। তারা সেই গানই ক্রয় করতে বাজারে যায়, যার পক্ষ বিতর্কে বিজয়ী হয়েছে। এই যখন অবস্থা, তখন তাদের গর্দভ বলার চেয়ে মস্তিষ্ক-বিকৃত জ্যান্টাইল বলাই শ্রেয়।

এভাবেই Tin Pan Alley প্রতিষ্ঠান আমেরিকার পুরো সংগীত বাজার নিজেদের করে নিয়েছে। আমেরিকার পর তাদের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন পৃথিবীর কোন অংশে গিয়ে পড়বে, তা বলা খুবই কঠিন। তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, ধীরে ধীরে তা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

ক্রীড়াশিল্পে ইহুদি জুয়াড়িদের দৌরাত্ম্য

প্রথমেই বলে রাখি, খেলাধুলায় ইহুদিদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ইহুদিদের মধ্য থেকে কেউ ভালো ক্রীড়াবিদ হতে পারেনি। এটা তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নয়। শারীরিক বা স্নায়ুবিক কোনো দুর্বলতার কারণে যে তারা খেলাধুলায় কম আসক্তি অনুভব করে তা নয়। হয়তো এটাও ইহুদি জাতিগত বৈশিষ্ট্য! কলেজ ও বিদ্যালয়গুলোতে ইহুদিদের সন্তানরা কেবল তখনই খেলাধুলায় অংশ নেয়, যখন তাদের নিয়ে কেউ কটু কথা বলে।

তবে শারীরিক খেলাধুলায় পারদর্শী না হলেও ইহুদিরা জুয়া খেলায় যথেষ্ট পারদর্শী। তাদের জুয়াড়িদের নোংরা থাবায় জনপ্রিয় প্রতিটি খেলাই বহুবার কুলষিত হয়েছে। দঙ্গল খেলায় (Wrestling) কিছু পেশিবহুল খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয়। মুষ্টিযুদ্ধের (Boxing) খেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। প্রতিবছর ঘোড়াদৌড় খেলার জন্য কেবল প্রশিক্ষণ মাঠেই হাজারো ঘোড়া আহত হয়, পরে অযত্ন-অবহেলায়

সেগুলো মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। কেন নিরীহ একটি প্রাণীকে নিয়ে এমন কুৎসিত খেলার আয়োজন করা হলো? কারণ, এতে রয়েছে প্রচুর মুনাফা উপার্জনের সম্ভাবনা। বাস্কেটবলও তাদের নোংরা হাতের স্পর্শ থেকে মুক্তি পায়নি।

১৮৭৫ সালে বেসবল খেলা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ধাক্কা খায়। জুয়া, গুন্ডামি, মাদকসেবন ও অব্যবস্থাপনার কারণে জনগণ কমিটির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একই অব্যবস্থাপনা ঘটতে দেখা যায় ১৯১৯ ও ১৯২১ সালেও। দর্শকরা মাঠ ছেড়ে বেড়িয়ে এসে টিকেট আগুনে পুরিয়ে দেয়। বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১৯১৯ সালে, যখন শিকাগো আমেরিকান ক্লাবের কাছে শিকাগো ন্যাশনালস ক্লাব পরাজিত হয়। গ্যালারিতে রটে যায়, উভয় দলের মধ্যে অর্থের লেনদেন হয়েছে। বেড়িয়ে আসে কিছু পরিচিত ইহুদি ব্যক্তির নাম। তখন বিক্ষুব্ধ দর্শক মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

১৯২০ সালে শিকাগো বনাম ফিলাডেলফিয়া জাতীয় দলের খেলা শুরু হওয়ার ঠিক আগের দিন শিকাগো ক্লাবের নিকট এক অদ্ভুত খবর আসে। কিছু পরিচিত ইহুদি জুয়াড়ি ফিলাডেলফিয়া ক্লাবের পেছনে বড়ো অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করছে। শিকাগো ক্লাব বিষয়টি দ্রুত ম্যাচ রেফারি Grover C. Alexander-কে জানায়। তিনি খেলা শুরুর আগ মুহূর্তে টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটিকে পুরো বিষয়টি অভিহিতি করেন, কিন্তু তারপরও সেই খেলা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে জুয়াড়িরা নির্বিঘ্নে উপার্জন করে নেয় নগদ কাঁচা পয়সা।

খেলা শেষে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। অবাক করা বিষয়, তদন্ত রিপোর্টে শিকাগো ক্লাবের আটজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়! চারদিকে এ নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। ফলে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রথম কমিটির ফলাফল বাতিল করা হয়। দ্বিতীয় কমিটির অনুসন্ধানে নতুন পাঁচজন অভিযুক্তের নাম উঠে আসে, যাদের সবাই ছিল ইহুদি। তাদের নাম হলো : Carl, Benny, Ben, Louis ও Levi। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি Replogle বলেন– 'উল্লেখকৃত ব্যক্তিরা ছাড়াও তো আরও অনেক অপরাধী আছে। তাদেরও খুঁজে বের করতে হবে। শুধু এই পাঁচজনকে শাস্তি দিয়ে কিই-বা এমন হবে!' তবে তাদের যেন কোনো প্রকার সাজা দেওয়া না হয়, সে জন্য শিকাগোর বিখ্যাত ইহুদি আইনজীবী Alfred S. Austrian পেছন থেকে কাজ করেন।

Albert D. Lasker হলেন American Jewish Committee-এর অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। তিনি সেই বিখ্যাত 'Lasker Plan'-এর রচয়িতা, যার মাধ্যমে পুরো বেসবল খেলার নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে চলে যায়। তবে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো– এই পরিকল্পনার প্রকৃত রচয়িতা কিন্তু তিনি ছিলেন না। এর প্রকৃত রচয়িতা ছিলেন Alfred S. Austrian; যিনি Mr. Lasker ও Replogle-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি Lasker সাহেবকে নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে পরিকল্পনাটি চালিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

১৯২০ সালে শিকাগো বনাম ফিলাডেলফিয়ার পাতানো খেলার মূল কারিগর ছিলেন তিনিই। খেলার রেফারি Hendryx-কে তদন্ত কাজে ডাকা হলে তিনি কী জবানবন্দি দিয়েছেন, তা কখনো প্রকাশ করা হয়নি।

এরপর আসে Arnold Rothstein-এর নাম। একাধিক ক্যাসিনো ছাড়াও তার ড্রাগ ও নেশাজ দ্রব্যের অবৈধ্য ব্যাবসা ছিল। তিনি নিউইয়র্ক ন্যাশনাল ক্লাবের অন্যতম স্টকহোল্ডার ছিলেন। তাকে বলা হতো একজন 'পিচ্ছিল ইহুদি'। কারণ, তিনি সব সময় হাত ফঁসকে বেরিয়ে যেতেন। তাকে কেন যে আটকে রাখা যেত না, সেই ব্যাখ্যা কেউ-ই দিতে পারে না।

দ্বিতীয় কমিটির রিপোর্টে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে– উকিল সাহেব আদালতে তার বিপক্ষে সাক্ষী তলব করে, কিন্তু বিচারালয়ে সেই সাক্ষীকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। শিকাগো বা নিউইয়র্কের কোনো পত্রিকা প্রতিষ্ঠান যেন তার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কিছু না লিখে, সে জন্য তাদের কাছে আগে থেকেই প্রচুর উৎকোচ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যে তার বিরুদ্ধে কলাম প্রকাশ লিখবে না, এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া এ ঘটনায় Mr. Austrian ছিলেন তার পক্ষের আইনজীবী।

২৮ জুলাই, ১৯২১, Evening Mail-এর সাংবাদিক Hugh S. Fullerton একটি কলামে প্রকাশ করেন–

> 'খেলার মাঠে দুর্নীতির দায়ে যে একবার অভিযুক্ত হয়েছে, তাকে কেবল একটি থেকে নয়; বরং সব ধরনের খেলা থেকেই বহিষ্কার করা উচিত। কারণ, তাদের নোংরা হাতের ছোঁয়ায় প্রতিটি শিল্পই প্রাণ হারাবে। নিউইয়র্কে Rothstein নামে একজন জুয়াড়ি আছে, যার ভয়ে পুরো শহর আতঙ্কগ্রস্ত। খেলার মাঠে যে বড়ো বড়ো জুয়া লেনদেনের গল্প শোনা যায়, তার প্রতিটির সঙ্গেই সে জড়িত বলে ধারণা করা হয়। কিছুদিন আগের বেসবল কেলেঙ্কারির সঙ্গেও সে সরাসরি জড়িত ছিল। সেই খেলাকে কেন্দ্র করে অন্তত ২ লাখ ডলারের লেনদেন হয়েছে, কিন্তু তার ক্ষমতার ভয়ে কেউ মামলা করতে পারছে না। এরপরও প্রতিটি খেলায় তার জন্য ভিআইপি বক্সসহ অনেক সুবিধা বরাদ্দ থাকে।'

এই কলামে তিনি আরও কয়েকজন জুয়াড়ির নাম উল্লেখ করে তাদের নিউইয়র্ক ক্লাবগুলো থেকে বয়কট করার সুপারিশ করেন।

এরপর আসে Harry Grabiner-এর নাম। তিনি হোয়াইট সক্স ক্লাবের ম্যানেজার Charles A. Comisky-এর স্থলাভীষিক্ত হয়ে ক্লাবটির দায়িত্বে আসেন। বেসবল খেলায় ক্লাবগুলোকে উৎসাহিত করতে 'Honor Systm' নামক একটি নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়।

এ নিয়ম অনুযায়ী হোম ক্লাবটি তার টিকেট বিক্রির একটি অংশ ভ্রমণকারী দলকে প্রদান করবে। টিকেটের মূল্য, আসন ও অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে একটি গ্যালারিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়। যেমন : box gate, pass gate, grandstand gate ও bleacher gate। কী পরিমাণ টিকেট বিক্রি হলো– তা খেলা শুরুর আগে, মাঝামাঝি সময়ে ও খেলা শেষে উভয় দলের দুজন প্রতিনিধি পর্যবেক্ষণ করে। এরপর পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে অর্থ ভাগাভাগি করে নেয়।

Grabiner ক্লাবটির পরিচালনা দায়িত্বে আসার পর থেকে ভ্রমণকারী দলগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠে– টিকেট বিক্রি নিয়ে যে হিসাব দেখানো হচ্ছে, তা অনেকটাই সন্দেহজনক। স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকের পরিমাণ আর প্রকাশিত টিকেট বিক্রির হিসাবের মধ্যে বিশাল ফাঁরাক দেখা যাচ্ছে। অভিযোগ তদারকি করতে বেসবল কমিটি ও ভ্রমণকারী দল গুপ্তচর বসায়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা বেসবল এখন বিনোদনের নাম করে টিকেট বাণিজ্য করছে! দুষ্টচক্র এই শিল্পে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, এখন পুরো খেলাটাই বর্জন করতে হবে।

বেসবল জগতে সবার মুখে মুখে যে জুয়াড়ির নাম শোনা যায়, তিনি হলেন Abe Attell। তার মতো দক্ষ ফিক্সার মাঠে দ্বিতীয়জন ছিল না। স্বয়ং ইহুদি মহলগুলোও তাকে ফিক্সার বলতে দ্বিধাবোধ করত না। তাদের ১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ টিম ছিল, যারা প্রতিটি খেলা শুরুর পূর্বে চাঁদা তুলে জুয়া খেলত। এমনও শোনা যায়, World Baseball Series-এর কোনো কোনো খেলাকে কেন্দ্র করে তারা ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত চাঁদা তুলেছে। অসংখ্য প্রমাণাদি থাকার পরও আদালত তাকে শাস্তি দিতে পারেনি।

এরপর আসে Barney Dreyfuss-এর নাম। তিনি পিটসবার্গ ন্যাশনাল লিগ ক্লাবের অন্যতম মালিক ছিলেন। 'Lasker Plan' বাস্তবায়নে সক্রিয় হওয়ার পর থেকে তিনি বেসবল জগতে বিতর্কিত হতে শুরু করেন। যদি প্রশ্ন করা হয়, বেসবল শিল্প ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণ কী? উত্তর একটাই, মাত্রাতিরিক্ত ইহুদি। তারপরও তদন্ত রিপোর্টগুলোতে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এমন শত শত তদন্ত কমিটি তৈরি করেও কাজ হবে না। কারণ, তাদের গুন্ডামি এতটা বেড়ে গেছে, অনেক ক্লাবমালিক খেলোয়ারদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকুও হরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

যে খেলোয়াড়দের তারা ছোটো থেকে লালন-পালন করে বড়ো করেছে, জুয়াড়ি দলগুলো অর্থের লোভ দেখিয়ে তাদের কিনে নেবে– এমন আশঙ্কা ক্লাবগুলোকে সর্বক্ষণ তটস্থ রেখেছে। এমনকী ম্যাচ রেফারিরাও তাদের লালসার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। যে রেফারিরা ফিক্সারদের লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হয়নি, তাদের কতটা অপমান ও লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়েছে, তা কেবল তারাই জানে।

যদিও ইহুদিদের চরিত্রে খেলোয়াড়সূলভ আচরণের লেশমাত্র দেখা যায় না, তারপরও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের দেখা যেত। Benny Leonard হলেন একজন ইহুদি বক্সিং খেলোয়াড়। পেশাদার জীবনে জিতেছেন অসংখ্য পুরস্কার। তবে মজার বিষয় হলো– পুরো ক্রীড়া জীবনে তিনি একবারের জন্যও শরীরে আঘাত পাননি, কিন্তু অনেক বিখ্যাত বক্সিং খেলোয়াড় আছেন, শারীরিক আঘাতের দরুন যাদের খেলাই ছেড়ে দিতে হয়েছে।

Kid Lavinge-এর কানে ঘুষি লাগার কারণে তিনি শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বুকে সজোড়ে ঘুষি লাগায় Ad Wolgast-কে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। Battling Nelson এতটাই আঘাত পান, শরীরে বড়ো ধরনের অস্ত্রপচার করতে হয়। অথচ Benny Leonard, Willie Ritchie ও Freddie Welsh-এর মতো খেলোয়াড়রা সারা জীবনে একটি আঘাতও পাননি! এটা নিয়ে তারা আবার গর্বও করেন! এর পেছনের গল্প হলো– তারা যা খেলেছে, তার সবই ছিল পাতানো খেলা। প্রকৃত খেলোয়াড়রা শারীরিক আঘাতের ঝুঁকি নিয়েই খেলতে আসেন, কিন্তু তারা আসেন নাটক করতে।

ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ ক্রীড়াশিল্প এখন ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। মঞ্চে বা মাঠে যে খেলাগুলো আমরা দেখি– বিশেষত মুষ্টিযুদ্ধ সম্পর্কিত খেলাগুলো তার অধিকাংশই বানানো নাটক। খেলা শুরু হওয়ার আগে একদল খেলোয়াড়কে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তারপর তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়। আমরা দেখি– একজনের ঘুষি খেয়ে অন্যজন লুটিয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পর সে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে ঘুষি মারছে। এভাবে কিছুক্ষণ অভিনয় করার পর সে-ই জয়ী হয়, যাকে আগে থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারাই বক্সিং ও রেসলিং টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে, রেফারি নিয়োগ দিচ্ছে, খেলোয়াড় বাছাই করছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, কে কোন খেলায় বিজয়ী হবে তা নির্ধারণ করে রাখছে এবং টিকেট মূল্য বাড়ানোর জন্য কালোবাজারিদের ভাড়া করেছে। এসবের কোনো কিছুই সাধারণ মানুষ জানে না। এমতাবস্থায় বাজি ধরে জয়লাভ করা একজন জ্যান্টাইলের পক্ষে কীভাবে সম্ভব?

চলচ্চিত্র শিল্পের ন্যায় এখানেও পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু খেলোয়াড়কে বাছাই করে বাজারে 'স্টার' বানায়, যেন জুয়াড়িদের মাঠ গরম রাখা যায়। ধীরে ধীরে ক্রীড়াশিল্পও যে 'বক্স অফিস' কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ পৃথিবীতে যদি গাধার চেয়েও কোনো নির্বোধ প্রাণী থেকে থাকে, তাহলে জ্যান্টাইল খেলোয়াড়দের সে নামেই সম্বোধন করা উচিত। তারা খুব কাছ থেকেই দেখছে– ইহুদি জুয়াড়িদের দৌড়াত্ম্যে আমাদের প্রতিটি ক্রিড়াশিল্প আজ কতটা ধ্বংসের মুখে। তারপরও কোনো খেলোয়াড় যদি জুয়াড়িদের সঙ্গে হাত মেলায়, তাহলে তাকে আর কিই-বা বলা যেতে পারে? চাইলে এমন অজস্র উদাহরণ এখানে তুলে ধরা সম্ভব!

Jack Johnson-এর নাম আশা করি অনেকে শুনেছেন। বক্সিং খেলায় তিনি চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবও পেয়েছিলেন। এই ভদ্রলোক বিলাসিতার দোষে পুরস্কারের অর্থ এত দ্রুত খরচ করে ফেলে যে, অচিরেই দরিদ্রতা নেমে আসে। এমতাবস্থায় একদিন Frazee ও Curley তাকে একটি পাতানো খেলায় অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। বলা হলো Jess Willard-এর সঙ্গে পরবর্তী খেলায় যদি সে হেরে যায়, তাহলে তাকে ৩৫,০০০ ডলার দেওয়া হবে। Jes Willard তখন দুর্বলশ্রেণির একজন খেলোয়ার ছিল। কেউ তাকে পাত্তাই দিত না। কিন্তু সে Jack Johnson-এর মতো খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিলো! জুয়াড়ি দুজন প্রচুর অর্থের বাজি ধরে পুরোটাই জিতে নিল। এই জুয়াড়ি হলো সেই Harry Frazee, যারা নিজেকে সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সম্প্রদায়ের অধিবাসী বলে দাবি করে। সেই যে Jack Johnson-এর ক্রীড়া-জীবনে ভাটা পড়ল, পরে আর কখনোই ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

এতে যে জুয়াড়ি দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তা নয়। কারণ, পৃথিবীতে গরিব মানুষের শেষ নেই। তাদের মধ্যে পেশিবহুল ও শক্ত-সামর্থ্যবান পুরুষেরও অভাব নেই। তা ছাড়া অল্প সময়ে শরীরের পেশিগুলোকে ফুলিয়ে নেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় ড্রাগ তো জুয়াড়িদের কাছে আছেই। সুতরাং অল্প সময়ে নতুন খেলোয়াড় তৈরি করে নেওয়া তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না। শুধু ড্রাগ দিয়ে তো আর স্টার বানানো যায় না। এ ক্ষেত্রে ইহুদিদের রয়েছে সমুদ্র পরিমাণ অর্থ। তাদের এত পরিমাণ অর্থ রয়েছে যে, তা দিয়ে প্রতিটি ক্লাব কিনে নেওয়া সম্ভব।

ম্যাচ পাতানোর অভিযোগে যখন কোনো খেলোয়াড়কে আদালতে তোলা হয়, তখন জুয়াড়িরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে; খেলোয়াড়দের রক্ষা করার কোনো তাগিদ জুয়াড়িদের থাকে না। আর কেনই-বা রক্ষা করতে যাবে! যে পরিমাণ অর্থ খরচ করে আইনজীবী ভাড়া করবে, তা দিয়ে তো নতুন আরেকজন খেলোয়াড় তৈরি করতে পারবে। ফলে সেই আদিকাল থেকে নিরীহ মানুষরাই কেবল ক্রসফায়ারের স্বীকার বা বলির পাঠা হয়ে আসছে। আর প্রকৃত অপরাধীরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চক্রান্তে আমাদের কত প্রতিভাবান খেলোয়াড় যে বলির পাঠা হয়ে হারিয়ে গেছে, তার তালিকা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এই মাত্রাতিরিক্ত জুয়াড়ি এবং সৃষ্টিকর্তার তথাকথিত মনোনীত সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের যদি ক্রীড়াজগৎ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব না হয়, তবে হয়তো একদিন ক্রীড়াজগৎ-ই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ, দূষণ বা নোংরামির বাহন কখনো সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম হতে পারে না।

হুইস্কি উৎপাদন শিল্প নিয়ে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

একটা সময় ছিল যখন হুইস্কিকে বলা হতো আভিজাত্যের প্রতীক। এটি ছিল ইউরোপ-আমেরিকার খুব জনপ্রিয় পানীয়। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যেকোনো অনুষ্ঠানেই এর প্রচলন ছিল। এর উৎপাদন প্রক্রিয়াতে ছিল নান্দনিক সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের পূর্বপুরুষরা ঘোড়া ও গল্পের বই যেমন পছন্দ করত, তেমনিভাবে শরাবও পছন্দ করত। প্রাচীন লেখক ও রাজাদের কাছে এটা ছিল গর্বের প্রতীক। কারণ, স্বাস্থ্য মান ও ভেজালশূন্যতা প্রাধান্য দিয়ে পরিশুদ্ধ আঙুরের রস থেকে এই শরাব তৈরি হতো। সে সময় বাজারে এমন অনেক শরাব পাওয়া যেত, যার সাথে বহু প্রজন্মের প্রাকৃতিক নির্যাস মিশে থাকত।

বলে রাখা ভালো, হুইস্কি ও শরাব উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আহামরি কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল ভাষাগত ব্যবহারে। যেমন : হুইস্কি হলো সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। আর শরাব সাহিত্যিক ভাষা, যা ব্যবহৃত হয় গল্প-কবিতা-উপন্যাসে। বিশুদ্ধ পানি ও ফলের রস ছাড়া আরও একটি উপাদান হুইস্কি উৎপাদনশিল্পে বিশেষভাবে জরুরি তা হলো– ধৈর্য। মানুষ কেবল শখ ও আবেগ থেকেই এই শিল্পে কাজ করত। এই শিল্পে কাজ করতে যে নান্দনিক দক্ষতার প্রয়োজন, তা অর্জন করতে দীর্ঘ সময়, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বাণিজ্যিক মুনাফা এখানে ছিল গৌণ বিষয়।

তাহলে এমন কী ঘটল, যার দরুন সচেতন মানুষেরা আজ হুইস্কি বর্জন করা শুরু করেছে! হঠাৎ এই অনীহার কারণ কী? মানবসমাজ কি আগের চেয়ে বেশি পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে? যা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক, তার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে সরকারের কেন এত কড়াকড়ি? কেন তার স্বাস্থ্যমান নিয়ে এত প্রশ্ন তোলা হচ্ছে?

কারণ, এই শিল্পে আজ ইহুদিদের থাবা পড়েছে। যে হুইস্কিকে আজকের সুশীলসমাজ বর্জন করছে, তার সাথে কয়েক প্রজন্ম আগের হুইস্কির রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শুধু তাই নয়; আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত এমন কোনো ভোগ্যপণ্য নেই, যা তাদের অশুভ থাবা থেকে মুক্তি পেয়েছে। হয়তো অনেকে হুইস্কি পান করে না। কিন্তু কীভাবে এর গুণগত মান নষ্ট করে এটিকে একটি অস্বাস্থ্যকর পানীয়তে পরিণত করা হলো, তার ইতিহাস জেনে রাখা উচিত। কারণ, এর সাথে চারপাশে ঘটমান অনেক ঘটনার সাদৃশ্য মেলানো সম্ভব হবে।

যে নান্দনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হুইস্কি উৎপাদন করা হয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা সত্যি-ই কঠিন। গল্প-সাহিত্যে (ইউরোপীয় সাহিত্য) যে অমর পানীয়ের কথা শোনা যায়, তা মূলত তিনটি অঞ্চলে তৈরি হতো। স্কটল্যান্ডের গ্যানলিভেটে, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাব্লিনে ও আমেরিকার কেনটাকি প্রদেশের ব্লুগ্রাস শহরে। প্রথমত, এই অঞ্চলগুলো ইহুদিমুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, এখানকার জ্যান্টাইলরা ভালো হুইস্কির জন্য অন্তত ১০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষ করত। তৃতীয়ত, এখানকার খাবার পানি ছিল অতি বিশুদ্ধ। এ কারণে এখানকার হুইস্কি ব্রান্ডগুলোর বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। যেমন : Pepper, Crow, Taylor ইত্যাদি।

অনেকেই হয়তো Bourbon Whisky-এর নাম শুনে থাকবে। এটি বিশ্বের জনপ্রিয় ব্রান্ডগুলোর একটি। এটি তৈরি হতো হুইস্কি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত আমেরিকার কেনটাকি প্রদেশে। একবার এর মূল কারিগর উৎপাদন খরচ কমাতে প্রতিষ্ঠানটিকে ইলিনয়েসে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ইলিনয়স ও বোরনের পানি এক নয় জেনে তিনি হতাশ হন। বোরনের পানি গ্লেন ক্রেকের চুনাপাথর মিশ্রিত পানি আর ইলিনয়সে পাচ্ছে শস্য কাজে ব্যবহৃত নদীর পানি। সামান্য এই পার্থক্যেই হারিয়ে যেতে পারে সু-বিখ্যাত একটি ব্রান্ডের বিশেষত্ব। তাই তিনি কারখানা স্থানান্তরের পরিকল্পনা বাতিল করেন। এ কারণে আঞ্চলিক বিশেষত্বের জন্য একই হুইস্কি পৃথক পৃথক নামে পরিচিত। যেমন : 'রাম' সবচেয়ে ভালো হয় জ্যামাইকাতে, 'পোর্ট শরাব' ভালো হয় পর্তুগালের ডোরো শহরে, 'শ্যাম্পেইন' ভালো হয় ফ্রান্সের রাইহেম শহরে এবং 'বিয়ার' ভালো হয় ব্যাভারিয়াতে।

যেই না বিশুদ্ধ 'হুইস্কি' বাজার থেকে গায়েব হয়ে গেল, অমনি 'বিয়ার' এসে জায়গা দখল করে নিল। শুরুতে কেবল সচেতন মানুষই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ফল ও সবজি রস হতে মিষ্টিজাত উপাদানসমূহ আলাদা করে ভারী পানীয় তৈরির যে কার্যপদ্ধতি, তাকে গাজন প্রক্রিয়া বলা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে এই কাজ করা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। কিন্তু ইহুদিরা এমন সব কৌশল উদ্ভাবন করে, যা দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে অতি অল্প সময়ে গাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। এভাবেই তারা অতি অল্প সময়ে প্রচুর হুইস্কি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করে। ফলে তাদের উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে কমে যায়। কারণ, আগে যে পানীয় তৈরিতে লাগত ১০ বছর, তা এখন হচ্ছে ১০ দিনে! কিন্তু তারপরও স্বাদ-রস-গন্ধে তাদের আলাদা করার কোনো উপায় নেই।

যেহেতু ভালো হুইস্কি তৈরি হতে দীর্ঘ সময় লাগে, তাই এর বিক্রয়মূল্য বেশি হবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহুদিদের উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে পারত। তা ছাড়া বাজারজাতকরণে ইহুদিদের মতো দক্ষ জাতি যে গোটা দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই, তা আগেই বলা হয়েছে। বিভিন্ন দোকান, সুপারস্টোর, সেলুন ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে তারা গড়ে তোলে মজবুত ব্যবসায়িক জোট। ইহুদিদের পানীয় বিক্রি করে এসব ব্যবসায়ীরা বেশ ভালো উপার্জন করত। কারণ, বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় এসব পণ্য বেশি বিক্রি হতো। আবার বিক্রি বেশি হওয়ায় তাদের কমিশনের পরিমাণও বেশি হতো। ফলে এ জাতীয় হুইস্কি খুব দ্রুত বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। আগে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ বছরে এক বোতল হুইস্কি কিনতেই হিমসিম খেতো, আজ পানির দরে কিনতে পারছে। অপর দিকে ভালো জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠানগুলো; যারা নিজেদের আবেগ ও ভালোবাসা পুঁজি করে দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রাচীন গৌরবময় হুইস্কি উৎপাদন ধারা অব্যাহত রেখেছিল, তারা বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যেতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না- তারা যা পান করছে, তা কৃত্রিমতায় ভরা বিষাক্ত পানীয় বৈ কিছু নয়।

বিষয়টির ওপর ১৯১৬ সালে John Foster Fraster তার লেখা *The Conquering Jew* বইয়ে উল্লেখ করেন–

> 'ইহুদিরা হলো আমেরিকান হুইস্কি শিল্পের রাজা। National Liquor Dealer-এর তালিকাভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগ সদস্যই এই গোত্রের সদস্য। শুধু তাই নয়; এখানকার যে প্রদেশগুলোতে তামাকের ভালো চাষ হয়, সেই অঞ্চলগুলোতে তারা অন্য প্রতিষ্ঠানকে ভিড়তে পর্যন্ত দেয় না। ফলে স্বল্পমূল্যে ইহুদিদের কাছে তামাক বিক্রি করা ছাড়া কৃষকদের ভিন্ন কোনো উপায় থাকে না। এর দরুন ইদানীং সিগারেট শিল্পে তাদের দাপট বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। American Tobacco Company যে পরিমাণ সিগারেট তৈরি করে, তা দিয়ে দেশের কেবল ১৫ ভাগ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। বাকি ৮৫ ভাগ আসে ইহুদিদের গুদাম থেকে।'

১৯০৪ সালে আমেরিকার Bureau of Chemistry-এর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন Dr. Wiley. সে বছর তিনি বাজারে চলমান হুইস্কি বিতর্কের ওপর একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এর অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো–

'ভালো হুইস্কি প্রস্তুত করা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, যা অনেকাংশে ব্যয়বহুল। এ প্রক্রিয়ায় অন্তত চার বছর সময় লাগে, যেন অ্যালকোহল অন্যান্য খাদ্য উপাদান জারণ (Oxidation) প্রক্রিয়া সম্পাদন করে– জৈব উপায়ে পানীয় রঙিন করতে পারে। এ জন্য উপাদানগুলো দীর্ঘদিন গুদামজাত করতে হয়, যা উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়।

ইহুদিরা কৃত্রিম উপায়ে কিছু কৌশল আবিষ্কার করে, যা দ্বারা মাত্র কয়েক ঘণ্টায় হুইস্কি তৈরি করা সম্ভব। একই পানীয় জ্যানটাইলদের প্রস্তুত করতে লাগে কয়েক বছর। প্রথম ধাপে, ফল বা সবজি রসের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মিশিয়ে পরিমাণ বাড়ানো হয়। দ্বিতীয় ধাপে, দগ্ধ চিনি ও কেমিক্যাল মিশিয়ে পানীয় রঙিন করা হয়। তৃতীয় ধাপে, রুচিকর স্বাদ ও গন্ধ সংযোজন করা হয়। এভাবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বা কয়েক দিনে প্রচুর পানীয় উৎপাদন করা সম্ভব, যা আপাত দৃষ্টিতে স্বাদে-গন্ধে সত্যিকারের হুইস্কি বলে মনে হবে। তবে এতে রয়েছে প্রচুর স্বাস্থ্যঝুঁকি। খাঁটি হুইস্কির যুগ বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে তা কেবল গল্প-উপন্যাসেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।'

Jewish Encyclopedia-তে উল্লেখ আছে–

> '১৮৯৬ সালে রাশিয়ান সরকার হুইস্কিশিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করায় অনেক ইহুদি পরিবারের ভাগ্যে দুর্দশা নেমে আসে।'

অতি মুনাফালোভী এই সম্প্রদায়টির হাত থেকে ভদকাশিল্প পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে রাশিয়ার সরকার তা রাষ্ট্রীয়করণ করে। পোল্যান্ড ও রোমানিয়াতেও একই ঘটনা ঘটে।

তাদের ব্যাংকাররা রোমানিয়ান কৃষকদের জমি আত্মসাৎ করে ভদকা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিত। পরে একই কৃষকদের দিয়ে স্বল্প মজুরির বিনিময়ে সেই জমিগুলোতে ভদকা তৈরির মূল উপকরণ চাষ করানো হতো। বিষয়টি জানতে পেরে আমেরিকার সুশীলসমাজ হুইস্কিশিল্প রক্ষায় প্রেসিডেন্ট দপ্তরে জোর দাবি জানাতে থাকে। এরপর সরকারি দপ্তর থেকে ঘোষণা আসে, যারা এই শিল্পে জড়িত হবে; হোক উৎপাদনকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী-সবাইকে যোগ্যতা প্রমাণ করে লাইসেন্স নিতে হবে। যদি এর বাইরে কারও দোকানে বা গুদামে হুইস্কি মজুদের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কিন্তু ইহুদিরা তো পারদের মতো! তাদের কোনো কিছু দিয়েই আটকে রাখার উপায় নেই। তাদের যে জালেই আটকানো হোক না কেন, ঠিকই ছিদ্র গলে বেড়িয়ে আসবে। লাইসেন্স আইন বলবৎ হওয়ায় ইহুদিদের বৈধ্য বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে গেলেও অবৈধ্য উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। এ পর্যায়ে তারা খুব সূক্ষ্ম একটি খেলা খেলে। এর চূড়ান্ত পরিণতি কী ছিল তা অধ্যায়টির শেষাংশে দেখতে পাবেন। তাদের পরিকল্পিত চক্রান্তটি তিনটি ধাপে নিচে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম ধাপ

ইহুদিরা সে সময়ের বিখ্যাত সব হুইস্কি ব্রান্ডের লোগো নকল করে নিজেদের বোতলে লাগিয়ে বাজারে সরবরাহ করতে শুরু করে। বাজারের বিপণন চক্রটির সঙ্গে ইহুদিদের ভালো সম্পর্ক ছিল বলে তারা আপসে বিষয়টি মেনে নেয়। কিন্তু চাইলেও তো আর মূল্য কমাতে পারছে না! কারণ, মূল্য তালিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যদি আপসে নকল পানীয়ের মূল্য কমায়, তারপরও বিষয়টি প্রকৃত উৎপাদনকারীর কানে চলে যাবে।

ফলে কোম্পানির যে গাড়িগুলো এক গুদাম থেকে অন্য গুদামে এবং দূরবর্তী স্থানে হুইস্কি পৌঁছে দিত, সেসব গাড়ির চলকদের সঙ্গে আঁতাত করতে শুরু করে। তারা চালকদের সঙ্গে চুক্তি করে গাড়িগুলোকে বিভিন্ন ঝোপঝাড় বা জঙ্গলে নিয়ে আসত। তারপর গাড়ির হুইস্কিগুলো পালটে নিজেদের বোতল সেখানে উঠিয়ে দিত। পুলিশি তদন্তে পাওয়া যায়, James E. Pepper-এর বোতলগুলোতে যে হুইস্কি পাওয়া যাচ্ছে, তা ইহুদিদের উৎপাদিত পানীয়। সে সময় বেশ কয়েকজন অপরাধীর নামও প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া বেশি দূর এগোতে পারেনি।

দেখা গেল, লাইসেন্স করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। যে ভেজাল বন্ধ করতে সুশীল সমাজের এত আন্দোলন, তা আগের মতোই রয়ে গেছে। ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে– এই নোংরা কাজে এমন সব বিখ্যাত হুইস্কি ব্রান্ড জড়িয়ে পড়েছে, যাদের রক্ষায় একসময় মানুষ আন্দোলন করেছিল। শুধু হুইস্কিই নয়; যত ধরনের পানীয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তত দিনে প্রায় সবকটি-ই বিষাক্ত হয়ে পড়েছে।

১৯১৩-১৪ সালে Bonfort's Wine & Spirits Circular প্রতিষ্ঠানটি একটি কলাম প্রকাশ করে। তাতে উল্লেখ্য করা হয়–

> 'বিখ্যাত সব ব্রান্ডের নামে যেসব হুইস্কি ও স্পিরিট আজ বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তা সবই ভেজালে পরিপূর্ণ। এই বাজার এতটা লাভজনক, একটি মহল মৌমাছির ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে এই শিল্পের ওপর চেপে বসেছে। অবৈধ ও ভেজাল মিশ্রিত পানীয় আমাদের সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তারা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক বিভিন্ন পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসবগুলোতে ঐতিহ্য রক্ষার্থে আজ আমরা যেসব হুইস্কি পান করছি, তা রাসায়নিক উপাদানে তৈরি পানীয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর মধ্যে ফলমূল বা ভেষজ উদ্ভিদের সামান্যতম নির্যাস নেই। কেবল কণ্ঠ ও গলনালিকে শান্ত করতে আমরা বাজারের এসব নোংরা ও বিষাক্ত সব পানীয় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। এমতাবস্থায় আমরা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।'

পরিস্থিতি যখন এতটা জটিল, তখন সুশীলসমাজ হুইস্কি পান করাই ছেড়ে দেয় এবং সবাইকে এ পানীয় বর্জনে আহ্বান জানায়। এই বর্জন আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পরে এবং এর সঙ্গে অনেক সংগঠন যুক্ত হয়। এই আন্দোলনে Young Men's Christian Association-এর অবদান কখনো ভোলার নয়। ক্রীতদাস বিতর্কের পর হুইস্কি-বিতর্ক আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো সমস্যায় রূপ নেয়। প্রবল আন্দোলনের মুখে আমেরিকান প্রশাসন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পানীয় উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ধাপ

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত Central Conference of American Rabbis-এ রাবাই Leo M. Franklin-এর বক্তব্যের খানিকটা অংশ তুলে ধরা হলো–

> 'ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে বিনয়ের সাথে সম্মানিত কংগ্রেস সভাসদগণের নিকট আর্জি জানাতে চাই, ধর্মীয় উৎসব এবং শাস্ত্রীয় আচার পালনের নিমিত্তে সংশোধিত হুইস্কি আইনে ইহুদিদের কিঞ্চিৎ ছাড় দেওয়া উচিত। আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচারে শরাব একটি ঐতিহ্যময় ও বাধ্যতামূলক বিষয়। শরাবহীন খিডিস[২৯] রাতগুলো আজ তার সৌন্দর্য হারাতে বসেছে। ধর্মীয় আচার পালনে হাজার বছর ধরে এ রাতে আমরা আঙুরের রস পান করে আসছি। আমাদের প্রার্থনা শুরু হয় আঙ্গুর রস দিয়ে তৈরি বিশেষ এক শরাব পানের মধ্য দিয়ে।

---

[২৯]. খিডিস (Kiddush)– সাব্বাত রাতের বিশেষ এক প্রার্থনা পর্ব, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য শরাব হাতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং গৃহকর্তা বিশেষ এক প্রার্থনাবাণী পাঠ করে।

আমাদের বিশ্বাস, দেশ ও জনগণের স্বার্থে যা ভালো, আপনারা তা-ই করছেন। বিগত কয়েক দশকে হুইস্কিশিল্প যে প্রাচীন গুণমান হারিয়ে বসেছে, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু তারপরও অন্যান্যদের ন্যায় আমরাও এ দেশের নাগরিক। এ দেশের জল-হাওয়ায় নিজেদের সঁপে দিয়েছি এবং দেশের সংবিধানের ওপর পূর্ণ শ্রদ্ধা ব্যক্ত করছি। মহামান্য সভাসদগণ, যে সংবিধানের বাস্তবায়নে আপনারা অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছেন, সেখানে উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি কি আপনারা ভুলে গেছেন? আজও মিলিয়ন মিলিয়ন ইহুদি নাগরিক এ দেশের উন্নয়নে রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছে। তারা এ দেশকে মনে-প্রাণে নিজেদের দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাহলে আপনারা কীভাবে তাদের আবেগের বিষয়টি (হুইস্কি) নতুন আইন পাসের সময় উহ্য রাখতে পারলেন?

আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। গত এক বছরে অসংখ্য রাবাইয়ের পক্ষ থেকে ১৫০টি চিঠি আমার নিকট এসেছে, যেখানে সবাই হুইস্কি উৎপাদনের অনুমতি চেয়ে আর্জি করেছে। আমি সত্যতা যাচাই করে দেখেছি, প্রতি দশটির মধ্যে নয়টি চিঠির উদ্দেশ্য ধর্মীয় উৎসব ও শাস্ত্রীয় আচার পালনে হুইস্কির উৎপাদনের অনুমতি লাভ করা। যেহেতু নতুন আইন অনুযায়ী অনুমতি ব্যতীত এই পানীয় উৎপাদন পুরোপুরি নিষিদ্ধ, তাই আপনাদের অনুমোদন একান্ত আবশ্যক।

গত কয়েক দশকে এই শিল্প নিয়ে যে বিতর্কের জন্ম হয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করছি না। সেই ভেজাল উৎপাদকদের মধ্যে যে আমাদেরও কিছু সদস্য জড়িয়ে ছিল, তাও অস্বীকার করছি না। তবে আমাদের পাশাপাশি খ্রিষ্টানদেরও তো অনেক সদস্য এ প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল। তা ছাড়া গুটিকয়েক অপরাধীর জন্য পুরো একটি সম্প্রদায় শাস্তি পাবে– এটাও সভ্য সমাজে কাম্য নয়।

আশা করি, কংগ্রেস সভাসদগণ বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করবেন এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক আমাদের ধর্মীয় আচার পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করবেন।'

তাদের আর্জি কংগ্রেস পার্লামেন্টে উঠলে সভাসদগণের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। একপক্ষ এই শিল্প পুনরায় চালু করার পক্ষে, অন্যপক্ষ এর বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়। সবশেষে সিদ্ধান্ত হয়, এই শিল্প কেবল ইহুদিদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এতে জ্যান্টাইলদের কোনো অংশগ্রহণ থাকবে না। তবে ইহুদিদের সবাই ইচ্ছেমতো হুইস্কি উৎপাদন করতে পারবে না। এই অনুমতি কেবল রাবাইদের জন্য প্রযোজ্য। তারা প্রত্যেকে সিনাগাগের জন্য বাৎসরিক ১০ গ্যালন হুইস্কি উৎপাদন করতে পারবে।

তৃতীয় ধাপ

বাৎসরিক ১০ গ্যালন পরিমাণে খুব বেশি নয়, কিন্তু ইহুদিদের জন্য ছোট্ট একটি ছিদ্রই যথেষ্ঠ। যেহেতু রাবাই ব্যতীত অন্য কেউ এই পানীয় উৎপাদন করতে পারবে না,

তাই তারা দলবেঁধে সরকারি দপ্তরগুলোতে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করতে শুরু করে। ফিলাডেলফিয়া, ফ্লেরিডা, নিয়ইয়র্কসহ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র সিনাগাগ গড়ে উঠা শুরু করে। সরকারি নিয়ম ছিল– অনন্ত ৫০ জন উপাসনাকারী না হলে নতুন কোনো সিনাগাগ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই একই ব্যক্তি নিজের নাম অসংখ্যবার পরিবর্তন করে একাধিক সিনাগাগের অধীনে তালিকাভুক্ত হতে শুরু করে। ধরুন, ফ্লোরিডা প্রদেশের অরল্যান্ড শহরে ৫০ জন ইহুদি বাস করে। কিন্তু তারা নিজেদের নাম একাধিবার পরিবর্তন করে সরকারের খাতায় ৩০০ জনের নাম দেখায় এবং ছয়টি সিনাগাগ খোলার অনুমোতি নেয়। একই সঙ্গে জন্ম নেয় ছয়জন রাবাই, যাদের কাছে ৬০ গ্যালন হুইস্কি উৎপাদনের অনুমতি থাকবে।

যদিও প্রত্যেককে ১০ গ্যালন উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাবাইদের বাড়িতে শত শত লিটার হুইস্কি পাওয়া যেত। Rabbi Cohen নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, বেশি উৎপাদন করা হচ্ছে যেন কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও শাস্ত্রীয় আচার পালনের দিনে কোনো ঘাটতি না পড়ে। নাম পরিবর্তন করে রাবাইদের সংখ্যা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা, তার মূল হোতাও এই ব্যক্তিই ছিলেন।

অপরদিকে, সাধারণ মানুষকে হুইস্কির প্রতি পুনরায় আবেগপ্রবণ করে তুলতে তারা থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করতে শুরু করে।

১৫ বা ২০ মিনিটের এমন কোনো নাটক পাওয়া যেত না, যেখানে হুইস্কিকে একবারের জন্যও উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে এর চাহিদা বাড়তে শুরু করে। কিন্তু বাজারে তো হুইস্কির অস্তিত্ব নেই, আছে কেবল ইহুদিদের বাড়িতে। জ্যান্টাইল যুবকরা অতি গোপনে সেসব বাড়িতে গিয়ে বোতলে বোতলে পানীয় নিয়ে আসত। ফলে তাদের কাঁচা অর্থ উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হলো না। এই গোপনীয়তা বেশি দিন চাপা থাকল না। আইন মন্ত্রণালয় তৎক্ষণাৎ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। যেমন : ১৯১৯-২০ সালে নিউইয়র্কের এক কোম্পানিতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ৪ মিলিয়ন ডলারের অবৈধ্য হুইস্কি জব্দ করে, যা শাস্ত্রীয় আচার পালনের নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছিল! দেশজুড়ে অসংখ্য রাবাই গ্রেফতার হয়। পরে দেখা যায়, সরকারি খাতায় তাদের প্রত্যেকেরই একাধিক নাম রয়েছে। রচেস্টার, ফ্লিন্ট, মিশিগান ও পোর্ট হিউরনের সে সময়কার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে এমন অসংখ্য তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ পত্রিকার শিরোনাম ছিল এমন– অবৈধ্য হুইস্কি রাখার অভিযোগে রাবাই আটক।

কিন্তু পক্ষপাতিত্বপূর্ণ মেরুদণ্ডহীন প্রশাসন থেকে যে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, তা কে না বোঝে? তারপরও কিছু রাবাইকে দীর্ঘ মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। কিছুদিন পর কংগ্রেস থেকে পুনরায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এত জনপ্রিয় একটি পানীয়কে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে বর্জন করা সম্ভব নয়। যারা অবৈধ্য প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করার, তারা ঠিকই চালিয়ে যাবে। তাই নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে এর মান নিয়ন্ত্রণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা উচিত।

Scanned with CamScanner

ফলে এই শিল্পের বাজার পুনরায় খুলে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়, কিন্তু তত দিনে তো জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া হয়ে বা হাত গুটিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। যাদের হাত ধরে একসময় গড়ে উঠেছিল বাজারের বিখ্যাত সব হুইস্কি ব্রান্ড, তাদের অনেকেই তখন এই ব্যবসায় পুনরায় ফিরে আসতে ইচ্ছুক নয়। ইহুদিদের যেহেতু কাঁচা পয়সার অভাব ছিল না, তাই এই ব্রান্ডগুলো তারা একে একে কিনে নিতে শুরু করে। এমন কিছু ব্রান্ডের নাম নিচে লেখা হলো–

> Old 66, Highland Rye, T.W. Samuel Old Style Sour Mash, Bridgewater Sour Mash and Rye Whiskes, T. J. Monarch, Davies County Sour Mash Whiskies, Louis Hunter 1870, Crystal Wedding, Gannymede 76, Jig-Saw Kentucky Corn Whisky, Lynndale Whisky, Brunswick Rye and Bourbon, Red Top Rye, White House Club, Green River, Sunnybrook, Mount Vernon, Belle of Nelson, James E. Pepper, Cedar Brook, Great Western Distillery, Old Grove Whisky, Old Ryan Whisky এবং Bucha Gin।

এমন আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম হলো : Bernheim, Rexinger & Company, Elias Bloch & Sons, J. & A. Freiberg, Freiberg & Workum, Helfferich & Sons, Hoffheimer Brothers Company, Elias Hyman & Sons, Kaufman, Bare & Company; Klein Brothers; A. Loeb & Co.; H. Rosenthal & Sons; Seligman Distilling Company; Straus, Pritz & Company; S. N. Weil & Company; F. Westheimer & Sons এবং আরও অনেক।

এত এত ব্রান্ড ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে খাঁটি হুইস্কি খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ নয়। মজার বিষয় হলো ক্রেতাসমাজ এখন অনেক কম মূল্যে বাজারে বিখ্যাত সব পানীয় পান করতে পারছে। তবে তারা বুঝতে পারেনি, এই পানীয়গুলো কারা তৈরি করছে। খুব অল্প সময়ে পুরো বাজার হুইস্কিতে সয়লাব হয়ে গেল। নোংরা-বিষাক্ত হুইস্কি আমাদের পুরো যুবসমাজকে মাতাল করে ছাড়ল, যার দরুন খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা এখন সমাজে নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর যে সংস্কৃতি, তার জন্ম মূলত এই হুইস্কি শিল্প থেকে; যা অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর দূরবর্তী বিভিন্ন প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। জাতি ভাবে– এই শিল্প বন্ধ করেও যখন পার পাওয়া যায়নি, তখন পারিবার ও সামাজ রক্ষায় নিজেদের সচেতন করে গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

অর্থ : ইহুদি ক্ষমতার মূল উৎস

যে কয়টি পরিবারের হাত ধরে ইহুদিরা আজ এতটা ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে রথচাইল্ড অন্যতম। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীটির যে আকস্মিক উত্থান, তার পেছনে এই পরিবারটির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তা ছাড়া ইজরাইল পুনঃপ্রতিষ্ঠা, লিগ অব নেশনস ও জাতিসংঘ গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাদের ছিল প্রভাবশালী ভূমিকা। ইউরোপের প্রতিটি যুদ্ধে উভয় পক্ষকেই তারা ঋণ দিত। যে দেশ বিজয়ী হতো, তাদের কাছ থেকে উচ্চহারে সুদের ভিত্তিতে ঋণের অর্থ ফেরত নিত। অন্যদিকে, পরাজিত দেশটির সকল সম্পদ তাদের দায় মেটানোর কাজে ব্যবহৃত হতো। এভাবে রথচাইল্ড ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী পরিবারে পরিণত হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় (১৭৭৫-১৭৮৩) আমেরিকার বিপক্ষশক্তি ব্রিটিশ সেন্যবাহিনীকে ২০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করে।

Mayer Amschel Rothschild হলেন বিখ্যাত এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৪৪ সালে তিনি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৬৩ সালে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার (Rare Coin) ব্যাবসা শুরু করেন। এর সাথে ছিল 'Money Exchange'-এর বাণিজ্য। সেখান থেকেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তার ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে Prince Wilhelm তাকে জার্মানির অর্থ বিভাগে নিয়োগ দেয়। যে অর্থ তিনি আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বিপক্ষশক্তিকে ঋণ দিয়েছিলেন, সেই অর্থই পরবর্তী সময়ে ফরাসি বিপ্লবে (১৭৮৯-১৭৭৯৯) বিনিয়োগ করেন।

তার ছিল পাঁচ ছেলে। এদের মধ্যে চারজনকে সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে চার দেশে প্রেরণ করেন। বড়ো ছেলে Amschel Mayer তার সাথে ফ্রাঙ্কফুটে থেকে যায়। বাকিরা–Solomon Mayer ভিয়েনাতে, Nathan Mayer লন্ডনে, Carl Mayer নেপোলিতে এবং James Mayer প্যারিসে পাড়ি জমায়। এবার পাঁচ ছেলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব দেশের একজন উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক কর্মকর্তার মেয়েকে বিয়ে করে, যা তাদের প্রতিটি দেশের প্রশাসনিক দপ্তরে প্রবেশের পথ সহজ করে দেয়।

তারপর পারিবারিক সম্পদ ব্যবহার করে তারা নিজ নিজ রাষ্ট্রকে উচ্চ সুদে ঋণ দিতে শুরু করে। যেমন : ওয়াটারলু যুদ্ধে ব্রিটেনকে ঋণ দেয় Nathan। এ ছাড়াও বিগত কয়েক শতকে ইউরোপে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই এই পরিবার প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে। তারা এত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে যে, একসময় প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও শেয়ার বাজারগুলো সম্পূর্ণ নিজেদের করে নেয়। তারা প্রতিষ্ঠা করে 'Red-Shield', যা ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী আর্থিক সংগঠন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তাদের ভয়ংকর ভূমিকা ছিল; এমনকী হিটলারের ইহুদি নিধনে প্রজেক্টেও তারা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে রথচাইল্ড পরিবারের সম্পদের সঠিক আঙ্কিক পরিমাণ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে অর্থের কল্যাণে তারা এতটা সম্পদশালী হয়েছে, তার অপর নাম 'ব্লাড মানি'। কারণ, অর্থের লোভে তারা গোটা ইউরোপকে অসংখ্যবার রক্তাক্ত করেছে। বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে অর্থ ব্যাবসার ধারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। যে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমকে কেন্দ্র করে আজ বিশ্বজুড়ে ডলারভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতেও রথচাইল্ড পরিবারের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

১৮৩৭ সালে তাদের প্রথম প্রতিনিধি August Belmont আমেরিকায় প্রবেশ করে। গৃহযুদ্ধ চলাকালে তিনি Democratic National Committe-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমান Morningside Heights চার্চে তার নামে একটি স্মৃতিসৌধ 'Belmont Memorial' সংরক্ষিত আছে।

১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ আরও আগেই শুরু হওয়ার কথা ছিল। শুধু তাদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর কল্যাণে যুদ্ধ কিছুটা বিলম্বে শুরু হয়। উল্লেখ্য, পূর্বনির্ধারিত সময়ে শুরু হলে অনেক দেশকে তারা এই যুদ্ধে সামিল পারত না; যাদের সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। যেমন : ১৯১১ সালে রথচাইল্ড পরিবারের ফাঁস হয়ে যাওয়া একটি চিঠি থেকে জানা যায়– তারা জার্মান সম্রাট Kaiser-কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়।

Jewish Encyclopedia অনুযায়ী–

> 'কৃষি কাজে ইহুদিরা স্বভাবত কম আগ্রহী, তবে মূল্যবান খনিজ শিল্পে তাদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। যেমন : Rothschild পারদ শিল্পকে, Barnato Brothers and Werner, Beit & Company হিরাশিল্পকে এবং Lewisohn Brothers and Guggenheim Sons তামা ও রূপাশিল্পকে বহু বছর যাবৎ নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে।'

Encyclopedia-তে আরও উল্লেখ আছে–

> 'ঋণের সুদ প্রতিটি রাষ্ট্রের ওপর এক ক্রমবর্ধনশীল জাতীয় দায় জন্ম দেয়। আর ধীরে ধীরে তা এতটা প্রকট আকার ধারণ করে, সেখান থেকে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বের হয়ে আসতে পারে না। ইহুদিরা আন্তর্জাতিক ঋণ-ব্যবসায়কে পুঁজি করে গড়ে তুলেছে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। এখন অনেক জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠান অধিক মুনাফার লোভে একই পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে; যা ইহুদিদের ক্ষমত আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

রথচাইল্ডের একটি বাণী আছে– এক পাত্রে সব ডিম রাখতে নেই। তারা সকল রাজনৈতিক দলের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করে; চাই তা ক্ষমতাসীন হোক কিংবা বিরোধী দল। ফলে যুদ্ধ কিংবা নির্বাচনে যে দল যেভাবেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, মূল ক্ষমতা তাদের হাতেই থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনুমান করা হচ্ছিল Kuhn, Loeb & Company খুব দ্রুতই ওয়ালস্ট্রিটকে নিজেদের করে নিতে যাচ্ছে। E. H. Harriman যখন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে রেলপথ নির্মাণের জন্য মূলধন সন্ধান করছিলেন, তখন Kuhn, Loeb & Company তাদের শেয়ারগুলো অবলেখন করে মূলধনের ব্যবস্থা করে দেয়। আমেরিকার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট রয়েছে, যেখানে তারা একই উপায়ে কাজ করে যাচ্ছে। পরে নিজেরাই সেই শেয়ারগুলোর মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে জ্যান্টাইলদের নিকট বিক্রি করে দেয়।

এই ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন Jacob Schiff। তিনি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন রথচাইল্ডের একজন ব্রোকার। তার প্রধান দুই সহকারী ছিলেন Otto Khan ও Felix Warburg। Otto Khan-এর জন্ম মেইনহামে। ছোটোকাল থেকে তিনি আরেক ইহুদি ব্যাংকিং পরিবার Speyers-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আর Felix Warburg পরিণত বয়সে Jacob Schiff পরিবারের একজন সদস্যকে বিয়ে করেন। এভাবে তারা নিজেদের মাঝে গড়ে তোলে এক শক্তিশালী পারিবারিক বন্ধন, যাতে তাদের সম্পদ কোনোভাবেই জ্যান্টাইলদের হাতে চলে না যায়। Amschel Rothschild তার যে পাঁচ ছেলেকে পাঁচ দেশে প্রেরণ করেন, তাদের সন্তানরাও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নিজেদের চাচাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে করে নেয়।

শুধু আমেরিকাতেই নয়; যে স্থানগুলো পরবর্তী সময়ে অর্থ-বাণিজ্যের কেন্দ্র বিন্দু হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তার প্রতিটি স্থানেই তারা নিজেদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছে। দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো, জাপান ও রাশিয়া হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তারা মেক্সিকোতে অর্থনৈতিক উপদেষ্টারূপে হাজির হয়। জাপান-রাশিয়া যুদ্ধে Jacob Schiff প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে জাপানকে সহযোগিতা করে, যেন এখান থেকেই রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বসিয়ে দেওয়া যায়। মূলত, জাপান-রাশিয়া যুদ্ধই ইহুদিদের জন্য

বলশেভিক আন্দোলনের পথ সহজ করে দেয়। জাপানের কারাগারগুলোতে যে সকল রাশিয়ান সৈন্যরা বন্দি ছিল, জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে দেওয়াই ছিল এই অর্থ বিনিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য। তারা এই সুযোগে জাপানকেও কবজা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজা সাহেব এই জাতিগোষ্ঠীটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি এই অর্থ সাহায্যের বিষয়টিকে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে নাক গলানো থেকে তাদের দূরে রাখেন। এ বিষয়টি তাদের ভীষণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে ইহুদিরা প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। আর এখান থেকেই জাপান-আমেরিকা দ্বন্দ্বের সূচনা।

তারা যেসব অন্ধকার পথ পাড়ি দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিজেদের করে নিয়েছে, তার বর্ণনা দিতে গেলে অনেক নোংরা গল্প বেড়িয়ে আসবে। Robins, Lamars ও Arnsteins-এর মতো ইহুদিদের অন্যান্য সদস্যরাও যেভাবে ওয়ালস্ট্রিটে থাবা বসিয়েছে, তা কখনো ভোলার মতো নয়। বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতিতে তারল্য ফিরিয়ে আনতে আমেরিকান সরকার লিবার্টি বন্ড ইস্যু করেন, কিন্তু তার দুই বছর না পেরোতেই ১২ মিলিয়ন ডলারের স্টক ও বন্ড আত্মসাৎ হয়। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও অনুসন্ধানি রিপোর্টে কারও নাম প্রকাশ পায়নি।

ওয়ালস্ট্রিটের শেয়ার কেনা-বেচার কাজে তখন এক শ্রেণির 'ম্যাসেঞ্জারবয়' কাজ করত। তারা স্টক ও বন্ডের দলিল এক হাউস থেকে অন্য হাউসে নিয়ে যেত এবং সঠিক ব্যক্তির নিকট মালিকানা বুঝিয়ে দিত। কোনো দলিল হারিয়ে গেলে তার মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া খুব কঠিন হতো। কারণ, জমির দলিলের মতো এসব কাগজেও হাতবদল ও জালিয়াতির সুযোগ ছিল। ফলে ম্যাসেঞ্জারবয়ের কাজটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৮ সাল। বসন্তের শুরু থেকে গ্রীষ্মের প্রথম পর্যন্ত অনেক ম্যাসেঞ্জারবয় ওয়ালস্ট্রিট বাজার থেকে গায়েব হওয়া শুরু করে। ওয়ালস্ট্রিট খুব ছোট্ট একটি জেলাশহর। এই ছোট্ট শহরের বিভিন্ন গলিতে স্টক ব্রোকাররা অফিস খুলে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করত। অনেক সময় একটি অফিস থেকে অন্য অফিসের দূরত্ব কোনো একটি ভবনের এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরের দূরত্বের সমান হতো। তাহলে এমন কী হলো, যার জন্য ছোট্ট একটি পথ পাড়ি দিতেই ম্যাসেঞ্জারবয়রা গায়েব হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা যেন এমন, মাটিই তাদের শুষে নিচ্ছে।

বিষয়টি তখনই ঘটা শুরু করে, যখন ওয়ালস্ট্রিটে প্রতি মাসে ২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন হচ্ছিল। সরকারের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ অল্প হলেও কিছু বন্ড ক্রয় করতে শুরু করে। এমনও হয়েছে, প্রতিদিন ২ মিলিয়নের বেশি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে। এমন সময় দায়িত্বশীল ম্যাসেঞ্জারবয়দের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যদি কোনো ব্যক্তি স্টক দলিল সময়মতো হাতে না পেত, তবে তার সব অর্থ জলে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো।

এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মানুষ প্রতিটি স্টকের বিমা করা শুরু করে। তবে সে সময় যে পরিমাণ স্টক ও বন্ড সিকিউরিটিজ চুরি হচ্ছিল, তাতে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এতটা ক্ষতি বহন করা সম্ভব ছিল না। ওয়ালস্ট্রিট কমিটি আইনি তৎপরতা শুরু করে। তারা গোয়েন্দাকর্মী নিয়োগ এবং হারিয়ে যাওয়া সিকিউরিটিজগুলো উদ্ধারের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করে। তবে ইতোমধ্যে শেয়ারবাজারের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা কোনো এক অজানা কারণে প্রকাশ করা হয়নি। কারণ, এতে হয়তো সাধারণ মানুষ আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে এবং স্টক ও বন্ড ক্রয়ে অনিচ্ছুক হয়ে পড়বে। কিন্তু নিউইয়র্কের এমন কোনো কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন ছিল না, যারা এই তথ্য জানত না।

১৯২০ সালের শুরুতে তাদের কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তি থেকে এমন কিছু তথ্য জানা যায়, যা আমেরিকার ইতিহাসে কখনোই ঘটেনি। একটি তরুণ সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের নিউইয়র্কের প্রভাশালী ইহুদিচক্র বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ দিয়ে ওয়ালস্ট্রিটে ম্যাসেঞ্জারবয় হিসেবে চাকরির জন্য পাঠাত। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে তারা খ্রিষ্টানদের নাম ব্যবহার করত। ফলে ব্রোকার হাউসগুলো তাদের চাকরি দিতে কোনো রকম দ্বিধাবোধ করত না।

আশা করি এখন আর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, কেন তারা সামান্য পথ পাড়ি দিতেই অদৃশ্য হয়ে যেত। ছদ্মবেশি ম্যাসেঞ্জারবয়রা শেয়ার দলিলগুলো তুলে দিত তাদের সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে, যার নাম 'Confidence Men'। এটির আরও একটি নাম ছিল 'Bank-roll Men'। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পরও তাদের কোনোরূপ শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ, অসংখ্য উকিল ও আইনজীবীদের দ্বারা এই সংগঠনটি সুরক্ষিত ছিল। চুরি হয়ে যাওয়া স্টক ও বন্ডগুলোকে নেওয়া হতো ক্লিভল্যান্ড, বোস্টন, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া ও কানাডায়। এর বিনিময়ে সংগঠন ও ম্যাসেঞ্জারবয়দের দেওয়া হতো মোটা অঙ্কের কমিশন।

একবার কোনো এক ম্যাসেঞ্জারবয় চুরি করা স্টক ও বন্ডগুলো সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়নি। সে দলিলগুলো নিয়ে পালিয়ে যায় এবং নতুন কোনো গোষ্ঠীর নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রির পরিকল্পনা করে। তাকে খুঁজে বের করতে গুপ্তঘাতক নিয়োগ করা হয়। অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে পাওয়া গেলেও দলিলগুলো আর উদ্ধার করা যায়নি। ফলে তাকে তৎক্ষণাত হত্যা না করে বাঁচিয়ে রাখা হয়। ছদ্মবেশে তার সাথে বন্ধুত্ব করে বেশ কিছুদিন মজা করা হয়, মদ ও সুন্দরী নারীর নেশায় ভুলিয়ে রাখা হয়। সবশেষে জানা যায়, দলিলগুলোর তার কোটের আস্তরণের নিচে সেলাই করা আছে। এর পরপরই তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহ উদ্ধারের পর ডজনখানেক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।

জ্যান্টাইল ম্যাসেঞ্জারবয়দেরও তারা বিভিন্ন প্রলোভনে নিজেদের সংগঠনে যুক্ত করার চেষ্টা করত। একবার যদি কেউ যুক্ত হয়েছে, তবে তার আর ফিরে আসার উপায় নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমনই এক জ্যান্টাইলের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, যখন সে এই সংগঠনটি থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলে, তখন তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। দলের সর্দার পরিষ্কার জানিয়ে দেয়–

> 'আমি বিশ্বাসঘাতকা একদমই পছন্দ করি না। যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো, তবে তোমাকে খুন করব। আর যদি আমি নিজে তোমাকে খুন না করি, তবে আমার দলের কেউ না কেউ অবশ্যই খুন করবে। কারণ, আমরা চাই না আমাদের পরিচয় প্রকাশিত হোক।'

এত সব প্রমাণ ও স্বীকারোক্তির পরও এই দলপতিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে যেসব ম্যাসেঞ্জারবয় সংগঠন থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইছে, উলটো তাদেরকেই শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। সামান্য সংখ্যক ইহুদি এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় ধরা পড়ে। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারাও জেল থেকে মুক্তি পায়। কারণ, বড়ো বড়ো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মাথার ওপর ছায়া হয়ে আছে।

এটাই হলো আমাদের বিচারব্যবস্থার বর্তমান রূপ। অর্থ-বিত্তের জোরে ইহুদিদের হাজারটা অপরাধও মাফ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে জ্যান্টাইলরা অভাবের তাড়নায় তাদের ফাঁদে পা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাদেরকেই ভোগ করতে হচ্ছে অনিশ্চিত কারাজীবন।

ওয়ালস্ট্রিট দখল করা নিয়ে ইহুদিদের পরিকল্পনা

আমেরিকায় ইহুদি বিতর্ক শুরু হয়েছে মূলত একটি শহরকে কেন্দ্র করে, তা হলো 'নিউইয়র্ক'। ইহুদিদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হলো– যখন তারা কোথাও যাবে, তখন একত্রে যাবে এবং সেখানে নিজেদের খুঁটি প্রতিষ্ঠিত করবে। গুটি কয়েক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই শহরের বাকি সব প্রতিষ্ঠান আজ তাদের দখলে। পুলিশ কমিশনার General Bingham-এর তথ্য অনুযায়ী– তৎকালীন নিউইয়র্কের প্রায় ৫০ ভাগ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ইহুদি জনগোষ্ঠীটিই দায়ী।

কার্যগত পার্থক্যের দিক দিয়ে ইহুদিরা যেখানে স্বল্পমেয়াদে ঋণ দেয়, সেখানে জ্যান্টাইলরা দেয় দীর্ঘমেয়াদে। ফলে অর্থের তারল্য ইহুদিদের নিকট সব সময়ই বেশি থাকে। তাই যেকোনো সংকটকালীন মুহূর্তে তারাই প্রথম অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা রাখে। এ জন্য দেখবেন, ইউরোপ-আমেরিকার বেশিরভাগ রাজপথ, রেলপথ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রথম ইহুদিরাই বিনিয়োগ করত। তাদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো অল্প পরিমাণ অবিহিত মূল্যে বিভিন্ন পাবলিক প্রকল্পের শেয়ার অবলিখন করে নিত। পরে কৃত্রিম উপায়ে (স্পেকুলেশান সৃষ্টির মাধ্যমে) শেয়ারগুলোর মূল্য বাড়িয়ে দিত এবং তা বর্ধিত মূল্যে ওয়ালস্ট্রিটে বিক্রি করত। ফলে কী হতো? প্রকল্পগুলোর সকল দায়দায়িত্ব

সাধারণ জনগণের কাঁধে চলে যেত। আর মাঝখান থেকে ইহুদিরা বিশাল অঙ্কের মুনাফা নিজেদের করে নিত। অন্যদিকে, জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগকৃত অর্থ আদৌ ব্যবহৃত হচ্ছে কি না বা সেই অর্থ ফেরত পাবে কি না, তা প্রায় সময়ই অনিশ্চিত থাকত। কারণ, ঋণ নিয়ে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে অর্থ ও সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার নজির বাজারে কম ছিল না।

ওয়াল স্ট্রিটের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যাংকটি হলো Kuhn, Loeb & Company, যার সদস্যগণ হলেন– Jacob Schiff, Mortimer, Otto H. Kahn, Paul M. ও M. Warburg। এ ছাড়াও ওয়ালস্ট্রিটের অন্যান্য প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো : Speyer & Company; J. and W. Seligman & Company; Lazard Freres; Ladenburg, Thalmann & Company; Hallgarten & Company; Knauth, Nachod & Kuhne; Goldman, Sachs & Company।

ইহুদিরা এতটাই ধূর্ত ও কৌশলী, বাজার যেন তাদের অন্ধকার অংশটুকু দেখতে না পারে, সে ব্যবস্থা পূর্বেই করে রেখেছে। শুধু ভোগ্য পণ্যের বাজার নয়; খনিজ পণ্যের ওপরও তারা একক আধিপত্য বিস্তার করেছে। যেমন : লোহা, ইস্পাত, সোনা, রুপা, তেল ইত্যাদি।

মজার বিষয় হলো– আজকের ওয়ালস্ট্রিট বাজারে যে বড়ো বড়ো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, তার কোনোটিরই ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে এখন আর ইহুদিদের দেখা যায় না। ছোটোখাটো কিছু প্রতিষ্ঠান বাদে সকল বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান এখন জ্যান্টাইলদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীটি কেন ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা থেকে সরে এলো? এমনকী ইহুদিরাও আজ জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থ-সম্পদ জমা করছে! হঠাৎ এমনটা হওয়ার কারণ কী?

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে যথেষ্ট দুর্নাম কামিয়েছে; Joseph G. Robin-এর ব্যাংকিং ব্যর্থতা অন্যতম উদাহরণ। তার আসল নাম হলো Robonovitch। তিনি জনগণের জমাকৃত অর্থ রাশিয়ার বিভিন্ন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতেন। একসময় সেই প্রতিষ্ঠানগুলো একে একে দেউলিয়া হওয়া শুরু করে, যা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল কি না জানা যায়নি। তবে তার এমন বিনিয়োগের জন্য অসংখ্য আমানতকারী সর্বহারা হয়ে যায়। আদালতও Dr. Robin-এর প্রতিষ্ঠানটিকে কিছু বলতে পারছে না। কারণ, দেউলিয়া তো হয়েছে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো!

এমন অসংখ্য ঘটনা তখন আমেরিকার আকাশে-বাতাসে উড়ছিল, তাই একসময় সাধারণ মানুষ ইহুদিদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থ জমানো বন্ধ করে দেয়। সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং শিল্পে ফিরিয়ে আনতে 'জ্যান্টাইল ফ্রন্ট' বিষয়টি আবারও কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। এ কারণে দেখা যায় ক্যাশিয়ার, ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, অপারেটর, মার্কেটার ইত্যাদি পদগুলোতে যারা বসে আছে, তারা হলো খ্রিষ্টান, হিন্দু বা মুসলমান। এসব দেখে সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে, এসব জ্যান্টাইলদের প্রতিষ্ঠান!

খুব ধীর গতিতে হলেও ওয়ালস্ট্রিট শেয়ারবাজার আজ ইহুদিদের দখলে চলে গেছে, যদিও এর শুরুটা সহজ ছিল না। Sereno S. Pratt-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৭ মে, ১৭৯২ সালে ওয়ালস্ট্রিটের ২২ নম্বর গলিতে একটি ছোট্ট অফিস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শেয়ার বাজারে তার যাত্রা শুরু। প্রতিদিন কাজের শেষে একদল ব্রোকার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ওয়ালস্ট্রিট-এর ৬৮ নাম্বার গলিতে Buttonwood গাছের নিচে জড়ো হতো। ৮ মার্চ, ১৮১৭ এরূপ ২৪ জন শেয়ার ব্রোকার নিজেদের মধ্যে আলোচনার সাপেক্ষে ওয়ালস্ট্রিট শেয়ার বাজারের একটি গঠতন্ত্র তৈরি করে; যা 'Buttonwood Agreement' নামে পরিচিত।

ওয়ালস্ট্রিট মূলত একটি প্রাইভেট স্টক মার্কেট। ব্রোকারগণ কমিশনের ভিত্তিতে এ বাজারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার কেনা-বেচা করত। এর সদস্যসংখ্যা ১১০০ জনে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এই ১১০০ জন সদস্যই কেবল ওয়ালস্ট্রিট বাজারের 'ফার্স্ট ফ্লোরে' প্রথম শ্রেণির ব্রোকার হিসেবে নিজেদের এবং মক্কেল প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার কেনা-বেচার কাজ করতে পারবে। ১৯২০ সালে এই প্রতিটি সদস্যপদের মূল্য ছিল প্রায় ১০০০০০ ডলার।

সদস্যপদ গ্রহণ ও হস্তান্তর নিয়ে ছিল যথেষ্ট কঠোরতা। মাত্র দুটি উপায়ে একজন বহিরাগত এ বাজারের সদস্যপদ লাভ করতে পারত।

এক. যদি কোনো সদস্য মারা যায়, তবে তার সদস্যপদ উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তরিত হতো।

দুই. যদি কোনো সদস্য দেউলিয়া হয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃত অবসর গ্রহণ করতে চায়, তবে তার সদস্যপদ ক্রয়ের মাধ্যমে।

৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক কমিটি দ্বারা এই বাজার পরিচালিত হতো। এই কমিটিতে বহু বছর কোনো ইহুদি জায়গা পায়নি।

১৯১৫-১৬ সালের দিকে প্রথমবারের মতো একজন ইহুদি ব্রোকার কমিটিতে জায়গা পায়। পরিচালক কমিটির ১৫ জন সদস্য নিয়ে আরেকটি ছোটো কমিটি ছিল, যারা শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত সদস্যদের দেখভাল করত। নতুন কোনো ব্যক্তি এই বাজারের সদস্য হতে চাইলে তাকে অবশ্যই এই কমিটির নিকট আবেদন করতে হতো। যেহেতু শেয়ার বাজারেরসদস্য সংখ্যা ১১০০ এবং এর সাথে নতুন কোনো পদ সংযোজন করা হবে না, তাই কেউ ইচ্ছা করলেই এর সদস্য হতে পারত না। যদি আবেদনের মাধ্যমে নতুন কেউ সদস্যপদ লাভ করতে চায়, তবে তাকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থন পেতে হবে। আর ইহুদিদের প্রতি তো বহু আগ থেকেই জ্যান্টাইলদের মনে ক্ষোভ জমে আছে, তাই কেউ চাইত না এই বাজারে ইহুদিদের আগমন ঘটুক।

মূলত ধৈর্য ও অধ্যবসায় তাদের চরিত্রের চরম দুটি গুণ, যার দরুন তারা যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। সেই শুরুর দিকে ওয়ালস্ট্রিটে তাদের সদস্য ছিল মাত্র পাঁচজন কী সাতজন। কিন্তু বিংশ শতাব্দী শুরু হতে না হতেই তা দুশো ছাড়িয়ে যায়। আর আজ তো এ বাজার তাদেরই দখলে। প্রশ্ন হলো– কীভাবে এত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে?

প্রথমত, ইহুদিরা তাদের সদস্যপদ কোনো জ্যান্টাইলের নিকট হস্তান্তর করত না। দ্বিতীয়ত, শেয়ারবাজারে যখন মন্দা দেখা দিত, তখন কিছু জ্যান্টাইল সদস্য দেউলিয়া হতো। ফলে তাদের পদটি নিলামে তোলা হতো। তারা এই সময়টির অপেক্ষায় ওত পতে থাকত। তারা যে অর্থে নিলাম ডাকত, তা দ্বারা দেউলিয়া হওয়া সদস্যটি সকল ঋণ ও দায় মিটিয়ে নিজের জন্য অতিরিক্ত কিছু জমা রাখতে পারত। এই অতিরিক্ত অর্থের লোভে জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠানগুলো বাধ্য হয়ে ইহুদিদের কাছে সদস্যপদ বিক্রি করত।

তৃতীয়ত, ইহুদিরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে খ্রিষ্টানদের নাম ব্যবহার করত, যা দেখে মনে হতো তারাও অ্যাংলো-সেক্সনের জাতিভুক্ত। নাম পরিবর্তন করা ইহুদিদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। যখন কোনো সম্প্রদায় ইহুদিদের বর্জন করে, সেখানে পুনরায় প্রবেশ করতে তারা সেই সম্প্রদায়দের নাম ব্যবহার করত।

১৯০৫ সালে যখন রাশিয়া থেকে ইহুদিদের বের করে দেওয়া হয়, তখন তারা রাশিয়ান নাম ব্যবহার করে পুনরায় প্রবেশ করে। শেয়ারবাজার তাদের বর্জন করলে খ্রিষ্টানদের নাম যেমন : Smith, Adam, Robin ইত্যাদি ব্যবহার করে সদস্যপদ লাভের আবেদন করতে শুরু করে। কেউ বুঝতেও পারে না, তার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে বা একটু আগে সে যার সাথে কথা বলল, সে একজন ইহুদি। সময়ের সাথে সাথে শেয়ারবাজারে তাদের সদস্যসংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, নিচে ছকটিতে দেখানো হলো।

বছর	শেয়ারবাজারের মোট সদস্য সংখ্যা	ইহুদিদের সদস্য সংখ্যা
১৮৭২	১,০০৯	৬০
১৮৭৩	১,০০৬	৪৯
১৮৯০	১,১০০	৮৭
১৮৯৩	১,১০০	১০৬
১৯১৯	১,১০০	২৭৬

লক্ষ করলে বুঝবেন, শেষের কয়েক বছরে তাদের সদস্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ, তাদের ছদ্মনাম কৌশল। স্পেকুলেশান ও গেম্বলিং মানে বোঝায়, অধিক ঝুঁকি আছে জেনেও অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আসায় ঝুঁকিযুক্ত শেয়ারগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করা। এই শেয়ারগুলোর বিক্রয়মূল্য অভিহিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম থাকে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়– ইহুদিরা যতবার এই ঝুঁকিযুক্ত শেয়ারগুলো ক্রয় করেছে, ততবারই লাভবান হয়েছে। এর কারণ, তাদের নিকট প্রচুর তথ্য থাকত, যা দ্বারা বুঝে যেত কখন কোন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাবে।

ওয়ালস্ট্রিটের ৩০ নাম্বার গলিতে গড়ে উঠেছে 'ক্লাব মার্কেট', যেখানে তাদের ব্রোকারগণ তেল, গ্যাস, লোহা ইত্যাদি খনিজ পদার্থের বাণিজ্য করে থাকে। এ ছাড়াও এমন আরও অনেক গলি আছে, যেখানে তারা ছোটো ছোটো ক্যাম্প করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সিকিউরিটিজ লেনদেন করে যাচ্ছে। মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রচারের মাধ্যমে ইহুদিরা সাধারণ মানুষকে এই বাজারের প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। সাধারণ মানুষও তাদের কথায় প্ররোচিত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উপার্জিত অর্থ এই বাজারে বিনিয়োগ করছে।

এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের বাড়ি, শস্যজমি ও কলকারখানা বন্ধ রেখে সামান্য কিছু মুনাফার আসায় ব্রোকারদের হাতে অর্থ তুলে দিয়েছে। তাদের তেমন কোনো ধারণাই নেই– এই বাজারে কী হচ্ছে; যে কোম্পানির শেয়ার কিনছে তার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু।

ইহুদি ব্রোকারগণ একদিকে কমিশন খাচ্ছে, আবার যদি কোনো প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়, তার শেয়ারগুলোও অনেক কম মূল্যে কিনে নিচ্ছে। সত্যি বলতে, এই বাজারে দয়া-মায়ার কোনো স্থান নেই। এটি শুধু চোর-ডাকাতদের বাজার। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা অফিসের এমন কেউ নেই, যে ওয়ালস্ট্রিটের কালো অধ্যায় সম্পর্কে অবহিত নয়। যেভাবে আজ এই বাজারের ওপর আক্রমণ এসেছে, একইভাবে পৃথিবীর আরও অনেক শেয়ারবাজারেও আক্রমণ আসবে, হয়তো ইহুদিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে; কোনো কিছুই নজরের বাইরে নয়।

ইহুদিদের হাজার বছরের ছদ্মনাম সংস্কৃতি

এ পর্যন্ত অনেকবার বলা হয়েছে– জ্যান্টাইলরা যখন ব্যাবসা-বাণিজ্যে ইহুদিদের অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত, তখন তারা নিজেদের পরিচয় খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ছদ্মনামের আড়ালে গোপন করত। তাদের এই নাম পরিবর্তনের সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়; এটা হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি।

সেমেটিক অঞ্চলগুলোতে আরবি নাম, ইউরোপের দেশগুলোতে অ্যাংলো-সেক্সনদের নাম ইহুদিদের হর-হামেশাই ব্যবহার করতে দেখা যেত। প্রাচীনকাল থেকে তাদের মনে একটি বিশ্বাস ছিল, নতুন নাম ভাগ্যে নতুন কিছু নিয়ে আসবে এবং হাজার অনিষ্ঠ থেকে মুক্তি দেবে। তারা এমনও বিশ্বাস করত, অসুস্থ্য ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলে সে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবে! পবিত্র বাইবেলেও এমন কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন : Abram হয়ে যায় Abraham এবং Jacob হয়ে যায় Israel।

Madansky ভাইয়েরা নিজেদের নাম Max, Benjamin, Solomon, Jacob-এর পর 'May' যোগ করে নতুন নাম রাখে। ফলে Max হয়ে যায় Max May এবং Benjamin হয়ে যায় Benjamin May। এই নামগুলো শুনে মনে হতে পারে Madansky ভাইয়েরা অ্যাংলো-সেক্সনের জাতভুক্ত; যদিও তাদের উৎপত্তি এশিয়া মহাদেশে।

এমনও হয়েছে, রাতারাতি এক ঘোষণার মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদিদের বিশেষ কিছু নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে, যা তারা নিজেরাও জানত না। যেমন : লস অ্যাঞ্জেলসের বিখ্যাত অভিনেতা Elmo Lincoln একবার আইনি কোনো কাজে তার স্ত্রীকে নিয়ে আদালতে যান। গিয়ে দেখেন তার নাম Otto Linknhelt হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে।

এভাবে Levy হয়ে গেলেন Lytton, যিনি ছিলেন আমেরিকার একটি বিখ্যাত বিপণি বিতানের মালিক। সেকালের একজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পীর গল্প শোনা যায়, যিনি বিয়ের আগে জানতেন তার স্ত্রী স্পেনিশ। কিন্তু বিয়ের পর জানলেন, তার স্ত্রী ইহুদি এবং তার নাম Bergenstein। মূলত তাদের প্রতিটি নামের পেছনে বেশ ভালো কিছু ইতিহাস লুকিয়ে থাকে, যা সবার পক্ষে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে Belmont নামটির ইতিহাস উপস্থাপন করা যাক।

যেমন : উনিশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত জার্মান ইহুদিরা নিজেদের পারিবারিক নাম ব্যবহার করত না। তারা বলত– 'Joseph ben Jacob' অর্থাৎ Jacob-এর পুত্র Joseph। বাবার নাম তারা উপাধি হিসেবে ব্যবহার করত। কিন্তু নেপোলিয়নের শাসনামলে সেনহাড্রিনের এক ঘোষণায় ইহুদিদের নাম নির্ধারণ সংস্কৃতিতে বড়ো পরিবর্তন আসে। তাদের জন্য কিছু উপনামের তালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়। মণিমুক্তা, পশু-পাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির নামগুলো ইহুদিরা উপাধি হিসেবে ব্যবহার করত। যেমন : Goldstein, Silberberg, Mandelbaum, Lilienthal, Ochs, Wolf ও Loewe।

কিছু জার্মান তাদের বাবার নামের সঙ্গে 'Son' যোগ করে নিজেদের নাম নির্ধারণ করত। যেমন : Jacobson, Isaacson। আবার অনেকে তাদের আশেপাশের শহর-বন্দর ও নদীর নাম অনুকরণে নিজেদের নাম নির্ধারণ করত। যেমন : বার্লিনের অধিবাসীরা তাদের নাম রাখে Berliner, সোহানবার্গের অধিবাসীরা রাখে Schoenberg। এর অর্থ 'সুন্দর পাহাড়'। এই নামটিকে ফরাসি ভাষায় পরিবর্তন করলে হয় Belmont। অর্থাৎ Schoenberg ও Belmont শব্দ দুটির অর্থ 'সুন্দর পাহাড়'।

এই Belmont পরবর্তী সময়ে Rothschilds-এর প্রতিনিধি হয়ে আমেরিকায় গমন করেন। তাহলে বিখ্যাত পরিবার Rothschilds নামের উৎস কী? সত্যি বলতে এই নামটির ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। যতদূর জানা যায়, ফ্রাঙ্কফুর্টের কোনো এক ইহুদি পরিবার তার ঘরের সামনে লাল রং-এর একটি ঢাল ঝুলিয়ে রাখত, সেখান থেকে Red Shield-কে তাদের পারিবারিক লোগো হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বলশেভিক বিপ্লবে তারা নিজেদের নামগুলো রাশিয়ান ভাষায় পালটে ফেলে। যেমন : Leo Bronstein হয়ে যায় Leo Trotsky; জার্মান শব্দ Apfelbaum হয়ে যায় Zinoviev; হিব্রু শব্দ Cohen হয়ে যায় Volodarsky; Goldman হয়ে যায় Izgoev এবং Feldman হয়ে যায় Vladimirov। সাধারণ একটি নামের পেছনেও যে এত ইতিহাস লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব?

যদি একজন পোলিশ ইহুদির নাম হয় Zuckermandle, সে কখনো হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করবে না। কারণ, উভয় দেশের পারস্পরিক বিরোধের দরুন এই নাম যেকোনো সময় তাকে বিপদে ফেলতে পারে। তাই নাম পালটে সে হয়ে যায় Zukors, যা হাঙ্গেরিয়ান শব্দ। কিন্তু যখন সে আমেরিকায় প্রবেশ করবে, তখন Mr. Zuckermandle নামটি অপরিবর্তিত রাখলে কোনো সমস্যা নেই।

মূলত তিনটি কারণে ইহুদিদের নাম পরিবর্তন করতে দেখা যায়। এক. তারা যে অন্য দেশের নাগরিক, তা বুঝতে না দেওয়া। দুই. ব্যবসায়িক কাজে যেন কোনো বাধা না আসে। তিন. সামাজিক কারণ। তাদের একটি নাম কীভাবে বহু নামে রূপ নিয়েছে, তার কিছু উদাহরণ *Jewish Encyclopedia* থেকে উপস্থাপন করা হলো–

- Asher থেকে হয়েছে Archer, Ansell, Asherson.
- Baruch থেকে হয়েছে Benedict, Beniton, Berthold.
- David থেকে হয়েছে Davis, Davison, Davies, Davidson.
- Isaac থেকে হয়েছে Sachs, Saxe, Sace, Seckel.
- Jacob থেকে হয়েছে Jackson, Jacobi, Jacobus, Jacof Kaplan, Kauffmann, Marchant, Merchant.
- Jonah থেকে হয়েছে Jones, Joseph, Jonas.
- Judah থেকে হয়েছে Jewell, Leo, Leon, Lionel, Lyon, Leoni, Judith.
- Levi থেকে হয়েছে Leopold, Levine, Lewis, Loewe, Low, Lowy.
- Moses থেকে হয়েছে Mortiz, Moss, Mortimer, Max, Mack, Moskin, Mosse.
- Solomon থেকে হয়েছে Salmon, Salome, Saloman, Salmuth.

আরও অনেক নাম Jewish Encyclopedia তে আছে, যা বিভিন্ন সময়ে তারা পরিবর্তন করেছে। যেমন : Barnett, Barnard, Beer, Hirschel, Mann, Mendel, Mandell, Mendlsohn ইত্যাদি। নতুন কোনো নাম গ্রহণের পর ইহুদিরা প্রচারণায় নেমে যেত, যেন তা সাধারণ মানুষের মনে দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। কাজ ও ব্যবসায়ের প্রকারভেদে তাদের রয়েছে পৃথক পৃথক নামের শ্রেণি।

সামরিক রসদ বাণিজ্যে Lucile, Mme ও Grande নামগুলো প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম নির্ধারণেও তারা কম কলাকৌশল জাহির করেনি। যেমন : Reuben Abraham Cohen যখন চাইল তার অস্ত্রগুলো যুদ্ধের প্রথমেই বিক্রি হয়ে যাক, তখন দোকানের নাম পালটে রাখলেন R. A. Le Can, যা অনেকটা ফরাসি ধাঁচের। একইভাবে Mr. Barondesky হয়ে গেল Barondes বা La Baron।

অনেক সময় তারা নিজেদের চামড়ার রং-এর ওপর ভিত্তি করে নাম নির্ধারণ করে। যেমন, সাদা বর্ণের ইহুদিরা নিজেদের নামে Millers শব্দটি ব্যবহার করে। Aarons হয়ে যায় Arnold ও Allingham। আবার Cohens থেকে হয় Druce, Freeman, Montagu, Rothbury ও Cooke।

Cohens নামটি তাদের মাঝে খুব প্রচলিত। দেখা যায়– যে রাস্তা থেকে পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করছে, তার নাম Cohen। যে পশু জবাই করছে, তার নাম Cohen। একজন আইনজীবী, তার নামও Cohens। এতসব Cohens-কে তারা নিজ পেশার নাম অনুযায়ী আলাদা করতে শুরু করে যেমন : Attorney Cohan। একই উপায়ে Kaplan হয়ে গেল Chaplin। ফলে, Charlie Kaplin হয়ে গেল Charlie Chaplin। তাদের নিকট সে একজন বড়ো অভিনেতা, কিন্তু জ্যান্টাইলদের নিকট 'গরিব ইংলিশ বালক'। এমনি আরেকজন বিখ্যাত অভিনেতা Rev. Stephen S. Wise। তার জন্ম হাঙ্গেরিতে হওয়ায় সেখানে তার পারিবারিক নাম ছিল Weisz। কখনো এই নামটিকে জার্মান ভাষায় বলা হতো Weiss। এই নামটি আমেরিকান ভাষায় রূপান্তর করলে হয় White। তবে White অপেক্ষা Wise অধিকতর ভালো বলে নামটি হয়ে গেল Rev. Stephen S. Wise।

চলচ্চিত্র জগতে Mr. Selwyn জনপ্রিয় আরেকটি নাম। তার প্রকৃত নাম Schlesinger। তবে এই নামে আরও অনেকে ছিল বলে অন্যরা তাদের নাম পরিবর্তন করে রেখেছে Sinclairs। আমেরিকান রাবাইদের অনেকে কমবেশি বিভিন্ন সময়ে নিজেদের নাম পরিবর্তন করেছে। যেমন : Rabbi Posnansky হয়ে গেলেন Rabbi Posner এবং Kalen হয়ে গেল Kalensky।

এমনও দেখা গেছে, টাকা ধার করার সময় তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করত, যেন টাকা নিয়ে ভেগে যাওয়া যায়। কোনো প্রতিষ্ঠানের চাকরি শেষে ইহুদিরা নতুন নাম গ্রহণ করত, যেন নতুন কর্মক্ষেত্রে পুরোনো কাজের অভিযোগ শুনতে না হয়।

আশা করি 'Kosher' শব্দটি মনে আছে। যে ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় ইহুদিরা পশু জবাই করে তাকে Kosher বলে। তবে এ প্রক্রিয়াটি সমাজে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্যা তাদের ধর্মীয় আইনে নয়; বরং কসাইখানাগুলোতে।

কারণ, অধিকাংশ কসাইখানায় মুনাফাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হতো। তাই পশু হত্যা বর্বর পর্যায়ে রূপ নিত। জ্যান্টাইলরা যখন Kosher সংস্কৃতি বন্ধ করতে আন্দোলন শুরু করে, তখন ইহুদিরা এই শব্দের পারিভাষা পালটে ফেলে। প্রচার করতে শুরু করে- Kosher হলো– 'শহরের সবচেয়ে ভালো খাবারের স্থান!'

ইহুদিরা যাই করুক না কেন, তাদের প্রতিটি কাজের মধ্যেই একটি শিল্প থাকে; এর জন্য সাধুবাদ জানানো উচিত। এ জাতীয় কূটকৌশল সাধারণত জ্যান্টাইলদের মাথায় কখনো আসে না। এ জন্য ইহুদিরা সব সময় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকে। ক্ষমতা, অর্থ-সম্পদ বা প্রতিপত্তি যাই বলি না কেন, সবকিছুতে ইহুদিরা জ্যান্টাইলদের চেয়ে উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু এভাবে বড়ো হয়ে লাভ কী? মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সম্পদ দখল করে নিজেরটা বাড়িয়ে লাভ কী?

সত্যি বলতে যদি জ্যান্টাইলরাও ইহুদিদের পথ অবলম্বন করত, তাহলে তারাও অনুরূপ সম্পদের মালিক হতে পারত। কিন্তু এতে তো সমাজের চতুর্দিকে নোংরামি, নগ্নতা, খুন-খারাপি, অত্যাচার-অনাচারে ভরে উঠত। তখন মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাইলে আমাদের মধ্যকার শয়তানদের অবশ্যই সনাক্ত করতে হবে।

প্রথমে তাদের ভালো হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যদি শত চেষ্টা করেও শোধরানো সম্ভব না হয়, তবে তাদের চূড়ান্ত ভাগাড়ে নিয়ে ফেলতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তবে এ জন্য প্রথমে নিজেদের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমানরূপে গড়ে তুলতে হবে। না হয় বছরের পর ইহুদিদের ধোঁকার স্বীকার হয়ে যেতে হবে।

জায়োনিস্টরাই কি আর্মাগেডনের জন্ম দেবে

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে 'আর্মাগেডন' সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়ে রাখা উচিত। হেনরি ফোর্ডের মূল আলোচনায় এ বিষয়গুলোর উল্লেখ ছিল না, কিন্তু আলোচনা পরিষ্কার করতে এসবের সমন্বয় প্রয়োজন।

আর্মাগেডন একটি হিব্রু শব্দ, যা দ্বারা পৃথিবীর শেষ সময়ে ভয়ংকর একটি যুদ্ধের কথা বোঝানো হয়েছে। এই যুদ্ধে সৃষ্টিকর্তার সৈন্য বাহিনী এবং শয়তানের বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হবে। অনেক পণ্ডিত ও গবেষকের ধারণা অনুযায়ী– এই যুদ্ধের সমাপ্তি হবে মেগিড্ডো পাহাড়ের কাছাকাছি কোনো স্থানে, যা বর্তমানে ইজরাইলের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর প্রতিটি বড়ো বড়ো ধর্মে এই যুদ্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় পণ্ডিতগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন।

খ্রিষ্টান ধর্মে নিউ টেস্টামেন্টের বুক অব রেভালেশনের (১৬ : ১৬)-এ বলা হয়েছে–

> 'অতঃপর তারা সবাই সে স্থানে একত্রিত হবে, যাকে হিব্রুতে বলা হয় আর্মাগেডন।'

কারা এই যুদ্ধে মুখোমুখি হবে, সে প্রসঙ্গে বুক অব রেভালেশনের ১৯ : ১১-১৬ ও ১৯২১-এ বলা আছে, সাদা ঘোড়ার বাহনে চড়ে স্বর্গ হতে কোনো ব্যক্তি নেমে আসবেন, যিনি তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে শয়তানের সৈন্য বাহিনীর মুখোমুখি হবেন এবং যুদ্ধে বিজয়ী হবেন। বাইবেলের লুক, মার্ক ও ম্যাথুর বিভিন্ন শ্লোকের পূর্বাভাষ থেকে বোঝা যায়– উল্লেখিত ব্যক্তিই হবেন যিশুখ্রিষ্ট।

ইসলাম ধর্মে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-কাহাফ ও বনি ইজরাইলসহ অসংখ্য হাদিসে পৃথিবীর শেষ সময় এবং আর্মাগেডনের কথা বলা হয়েছে। নবি ঈসা (আ.) সাদা দুই মেঘের (ফেরেস্তাদের কাঁধের) ওপর ভর করে ধরণিতে নেমে আসবেন। অতঃপর ইজরাইলে পৌছে দজ্জাল বাহিনীকে সমূলে পরাজিত করবেন।

কিন্তু ইহুদি ধর্মে এমন কোনো যুদ্ধের নাম বলা হয়নি, যা আর্মাগেডন হতে পারে। তবে তালমুদে মসিহের কথা বলা হয়েছে, যিনি নতুন জন্ম নেওয়া ইজরাইলের বাদশাহ হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন। তিনি আসার পর ইজরাইল সামরিক শক্তির শীর্ষবিন্দুতে পৌছে যাবে এবং পুরো পৃথিবী শাসন করবে। বাইবেলের ভাষায়– ইহুদিদের এই মসিকে বলা হয়েছে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট এবং ইসলামিক পরিভাষায় দাজ্জাল। এই যুদ্ধ কখন শুরু হবে, তা নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে পৃথিবীর শেষ সময়ে বহু নিদর্শনের কথা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই আর্মাগেডন এমনই এক যুদ্ধ, যাতে জলবায়ুর ওপর ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসবে। পুরো আকাশ দীর্ঘ সময়ের জন্য ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে। সূর্যালোক দেখা যাবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের কারণে প্রচুর মানুষ মারা পড়বে। ধরণির জনসংখ্যা গত দুশো বছরে যেভাবে বেড়েছে, ঠিক সেভাবেই তা হঠাৎ করে কমে যাবে। ইজরাইলের পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ এই যুদ্ধের সময়কাল ঘনিয়ে আসার এক বড়ো ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অনেকে হয়তো বিভ্রান্ত হতে পারেন যে, এখানে কোন ইজরাইলের কথা বলা হচ্ছে? কারণ, সেই যে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে তাদের ১০টি গোত্র অ্যাসিরিয়ানদের আক্রমণে হারিয়ে গেছে, তাদের তো কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। আর বর্তমান ইজরাইলে যারা বসবাস করছে, তারা তো জুদাহ রাজ্যের কেবল দুটি গোত্রের উত্তরসূরি। তাহলে বাকিরা এ ভূমিতে কবে ফিরে আসবে?

মূলত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জানে না বা তার খবরও রাখে না– বাকি গোত্রের অধিবাসীদের খুঁজে বের করার কাজ নব গঠিত ইজরাইল খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে নিরন্তরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। গত অর্ধ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে এমন কিছু গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা নিজেদের ইজরাইলের হারিয়ে যাওয়া গোত্রের অধিবাসী বলে দাবি করেছে।

Simcha Jacobovici হলেন এ বিষয়ের ওপর একজন বিশেষজ্ঞ। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপরও তার রয়েছে অসামান্য জ্ঞান। ২০০৩ সালে Quest for the Lost Tribes শিরোনামে তিনি একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করেন, সেখানে এ জাতীয় কিছু গোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন : তাদের পাওয়া গিয়েছে ইথিওপিয়ার সিমিয়েন পর্বতমালায়; ভারতের মনিপুর ও মুম্বাই; ইরানের ইস্ফাহান ও মাশহাদে; সমরকন্দে। তবে আদৌ তারা হারিয়ে যাওয়া গোত্রদের প্রকৃত উত্তরসূরি কি না, তা নিয়ে খোদ ইজরাইলি প্রশাসনের মনেও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কিন্তু তারপরও তাদের একেবারে ফেলে দিতে পারেনি। বিগত কয়েক দশকে এমন প্রচুরসংখ্যক অধিবাসীকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইজরাইলে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাদের কে কোন গোত্রের সদস্য, তা যেহেতু এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তাই ইজরাইলি প্রশাসন আপাতত তাদের সবাইকে ইহুদি বলে নথিভুক্ত করছে এবং তাদের বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য নিয়মিত প্যালেস্টানিদের ভূমি দখলের প্রচেষ্টা চলেছে।

বেলফোর ঘোষণা

জেরুজালেম দখল জায়োনিস্টদের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৭ ব্রিটিশ কমান্ডার Edmund Allenby যখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শহরটিতে প্রবেশ করেন, তখন পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিরা নিশ্চিত হয়ে যায়, তারা আবারও প্রাচীন ভূমিতে ফিরে যাচ্ছে। এই নব্য ইজরাইলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এক প্রতিশ্রুতি পত্রের মধ্য দিয়ে। ২ নভেম্বর, ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব Arthur Balfour আমেরিকায় অবস্থানরত Baron Rothschild-এর নিকট একটি প্রতিশ্রুতিপত্র লিখেন– গ্রেট ব্রিটেন যেকোনো মূল্যেই প্যালেস্টাইনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। এই চিঠি পেয়ে তাদের সদস্যগণ রাস্তায় নেমে নাচ-গান করতে শুরু করে।

২ নভেম্বর, ১৯১৭

প্রিয় লর্ড রথসচাইল্ড,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে মহামান্য সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত ঘোষণাটির কথা জানাচ্ছি। এটি ইহুদি ও জায়োনিস্টদের প্রত্যাশার সাথে সহানুভূতিস্বরূপ মন্ত্রিপরিষদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে।

মহামান্য সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য জাতীয় স্বদেশভূমি সৃষ্টির বিষয়টি সহানুভূতির সাথে দেখছে। তাই লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। স্পষ্টত এই ঘোষণা ফিলিস্তিনে বিদ্যমান অইহুদি সম্প্রদায়গুলোর নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাতিত্ব করছে না। অনুরূপভাবে এটি অন্যান্য দেশে ইহুদিরা যে আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থায় আছে, তার ওপরও কোনো প্রভাব ফেলবে না।

আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, যদি দয়া করে এই ঘোষণাটি জায়োনিস্ট ফেডারেশনকে জানিয়ে দেন।

Atlantic Monthly পত্রিকার সম্পাদক Professor Albert T. Clay আমাদের সতর্ক করে বলেন–

'প্যালেস্টাইন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকান পত্রিকাগুলোতে যে সংবাদ ছাপানো হচ্ছে, তার প্রায় সবই জায়োনিস্টদের বানানো সংবাদ। প্যালেস্টাইনিদের বিশাল এক জনগোষ্ঠী মুসলিম ও খ্রিষ্টান। তারা প্রায় ২,০০০ বছর ধরে

> সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। নিজ ভূমি রক্ষার্থে তারা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এ বিষয়টি তারা বিকৃত করে বলছে, সেখানে নাকি মুসলিমরা হাজার হাজার নিরীহ ইহুদিকে হত্যা করছে।'

এর আগে ১৯০২ সালে জায়োনিস্টরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে Anglo-Palestine Bank প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের হাজার বছরের পুরোনো 'সুদ-বাণিজ্য' শুরু করে। ৬.৫ শতাংশ সুদের বিনিময়ে পাঁচ বছর মেয়াদে তারা প্যালেস্টাইনি কৃষকদের ঋণ দিতে শুরু করে, কিন্তু অধিকাংশ কৃষক এই অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে তাদের আবাদি জমিগুলো জায়োনিস্ট ব্যাংকটির সম্পত্তি হয়ে যায়। ব্রিটিশ কমান্ডারের নেতৃত্বে তারা এই ভূমিগুলো দখল করতে শুরু করে। সে সময় অনেক ইহুদিও জেরুজালেমে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল; যদিও তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল।

১৮৪২ সালে Dr. Murray M'Cheyne জেরুজালেমে বসবাসরত ইহুদিদের ওপর এক অনুসন্ধান চালান। আন্তর্জাতিক ইহুদি সংগঠনগুলো জেরুজালেমে বসবাসরত এই জনগোষ্ঠীর জন্য বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করে। ফলে কাজ না করলেও তাদের জীবিকা ও রুজির অভাব ছিল না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিও তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে, মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে ছিল। তাই ইহুদিরা নিজেদের সন্তানদের খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে শুরু করে।

জায়োনিস্টরা এই শহর দখল করে নিলে শহরের পুরো রূপ রাতারাতি পালটে যায়। The Council of Jerusalem Jews একটি হিব্রু পত্রিকায় ইহুদি অভিভাবকদের সতর্ক করে কলাম প্রকাশ করে। কলামটিতে তাদের প্রতি কিছু আজ্ঞা প্রকাশ করা হয়–

- যদি কোনো অভিভাবক সন্তানদের খ্রিষ্টান-মুসলিম পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে না আনে, তবে তাদের বাৎসরিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
- তাদের চিকিৎসাসেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
- তাদের নাম ব্লাকলিস্টে রাখা হবে এবং মোজেসের অনুসারী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।
- সকল প্রকার ব্যবসায়িক মুনাফা ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।
- তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বয়কট করা হবে।
- সকল অফিস-আদালত থেকে ছাঁটাই করা হবে।
- যারা এসব নির্দেশ অমান্য করবে, তাদের নাম শহরের প্রধান ফটকের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হবে।
- বিশেষ এক ব্যাজ পরতে হবে, যেন সহজে তাদের সনাক্ত করা যায়।
- জাতীয় পর্যায়ে তাদের কলঙ্কিত করা হবে।
- যদি কোনো রাবাই এ নির্দেশ অমান্য করে, তবে তাকে দায়িত্বচ্যুত করা হবে।

ইহুদিদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো জাতীয়তাবাদ। তারা খুব ভালো করেই জানে, জেরুজালেমের অধিকার খ্রিষ্টানরাও ছাড়তে রাজি নয়। বিশ্বযুদ্ধের ফাঁদে পড়ে ব্রিটেন এই শহরকে ইহুদিদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তারা যে আজীবন জায়োনিস্টদের কথামতো কাজ করে না, তারা তা ভালো করে জানে। বেথেলহাম যিশুখ্রিষ্টের জন্মভূমি। ধর্ম প্রচার করতে তিনি জেরুজালেমে এসেছিলেন। প্যালেস্টাইন তাদের হাতে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে– খ্রিষ্টানরা শহরটির ওপর অধিকার হারাবে। বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদিরা যেভাবে রাশিয়ার গির্জাগুলো ধ্বংস করেছে, সেভাবে প্যালেস্টাইনের গির্জা ও মসজিদগুলোতেও আঘাত হানছে।

জেরুজালেম দখলের পরপরই Sir H. Samuel-এর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে এক ইহুদি সরকার গঠনের কাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে জায়োনিস্টরা সুয়েজ খাল দখলের এক ভয়ংকর খেলায় মেতে ওঠে। তিনি বলেন–

> ‘সামরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এত বড়ো প্রজেক্টে হাত দেওয়া উচিত নয়। এখন প্রয়োজন ইজরাইলের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন জোগানো। যেরূপ বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রের নবজন্ম ঘটেছে, খুব শীঘ্র তেমন আরেকটি যুদ্ধ ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের উচিত, এই যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে ইজরাইল রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বৈধ্যতা অর্জন করা।’

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনটি বিশেষ কারণে প্যালেস্টাইন ইস্যু আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

১. বলশেভিকদের প্যালেস্টাইন অভিমুখে যাত্রা।
২. খতরনাক জায়োনিস্টদের জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা।
৩. বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্যালেস্টাইনের আবির্ভাব।

১৯২০ সালে জেরুজালেমের বিশপ Dr. Mclnnis এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন–

> ‘যে আগন্তুকেরা আজ জেরুজালেম দখল করেছে– তাদের অধিকাংশই রাশিয়ান, পোলিশ ও রোমানিয়ান ইহুদি; কিছুদিন আগেও তাদের বলশেভিক বিপ্লব করতে দেখা গেছে। তারা এই ভূমি দখলের পর লিওন ট্রটস্কি সাহেবের প্রতি সম্মান জানাতে ভোলেনি। তিনিই তো তাদের ‘Kingdom of Heaven’ তথা এই স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।’

১৯২০ সালের হিসাব অনুযায়ী প্যালেস্টাইনের বর্তমান অধিবাসীরা প্রায় ২ হাজার বছর যাবৎ এই ভূমিতে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে ৫ লাখ মুসলিম, ১ লাখ খ্রিষ্টান ও ৬৫ হাজার ইহুদি। পুরো জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ মুসলিম, ১৫ ভাগ খ্রিষ্টান ও ১০ ইহুদি। তাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় কৃষিকাজ। তারা যে এই অঞ্চলের প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দা,

তা আশা করি খোদ ইউরোপিয়ান পর্যন্ত অস্বীকার করবে না। এই ভূমিকে জায়োনিস্টদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ হলো– বেলজিয়ামকে মেক্সিকোর হাতে তুলে দেওয়া।

General Allenby প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি স্থানীয়দের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করবেন। বেলফোর ঘোষণা, সান রেমিও সম্মেলন ও প্রেসিডেন্ট উইলসন সবাই এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু জায়োনিস্টরা বলল– 'তাদের বের করে দাও!'

Isreal Zangwill বললেন–

> 'তাদের বের করে দাও! আমরা খুব ভদ্রভাবে বলছি, তারা যেন এই ভূমি ছেড়ে চলে যায়! তাদের জন্য লাখ লাখ বর্গ মাইলের আরব ভূমি পড়ে আছে। ইজরাইলে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গাও যে এখন অবশিষ্ট নেই। তাঁবু গুটিয়ে বেদুইনদের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করা তো তাদের জন্মগত অভ্যাস। এবার তারা তা প্রমাণ করে দেখাক।
>
> ইহুদিরা ''আরব'' শব্দটিকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করে থাকে। আমাদের মগজে আরবদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়াতে ইহুদিরা যথেচ্ছা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে থাকে। আমেরিকা তো স্বাধীন হয়েছে মাত্র ১৭৭৬ সালে। সামান্য দেড়শো-দুশো বছরের ব্যবধানে আমরা যদি নিজেদের এই ভূমির স্থায়ী বাসিন্দা বলে দাবি করতে পারি, তাহলে যারা প্যালেস্টাইনে দুই হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসছে, তারা কেন নিজেদের স্থায়ী অধিবাসী বলে দাবি করতে পারবে না! বিশ্বের নিরপেক্ষ সকল পণ্ডিত আজ নব গঠিত ইজরাইল নিয়ে ভীষণ সঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কারণ, তাদের নব আবির্ভাব মানবজাতি তথা এই ধরণির ভবিষ্যতের প্রতি ভয়ংকর খারাপ কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে।'

ইহুদিরা যেভাবে জেরুজালেম দখল করে

১৯২১ সালের জুলাই মাসে ইউনির্ভার্সিটি অব দ্যা সাউথ 'Zionism and the Jewish Problem' শিরোনামে ২৯ পৃষ্ঠার একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করে। আর্টিক্যালটির লেখক Dr. John P. Peters দীর্ঘদিন সেন্ট জন দ্যা ডিভাইন ও সেন্ট মাইকেল চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন–

> 'যে জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করে জায়োনিজম গড়ে উঠেছে, তার সাথে ধর্মীয় গ্রন্থের তেমন কোনো সাদৃশ্য নেই। এই রাজনৈতিক দলটির মূল ক্ষমতাভার যাদের হাতে, তাদের কেউ মূল ধর্মে বিশ্বাসী নয়। ইহুদিদের জাতীয়তাবাদ আমেরিকাসহ পৃথিবীর যেসব অংশে প্রবেশ করেছে, সেখানে তারা আরও বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে।'

Dr. Peters জায়োনিস্টদের বিভিন্ন কার্যক্রমের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তার প্রকাশিত আর্টিক্যালের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ এখানে উপস্থান করা হলো–

জায়োনিস্টরা যে প্যালেস্টাইন দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তাদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯০২ সালে। সেবার আমি দ্বিতীয় মেয়াদে প্যালেস্টাইন সফরে যাই। ১৮৯০ সালে যখন প্রথম মেয়াদে প্যালেস্টাইন সফর করি, তখন সামান্য কিছু সেফার্ডিক ইহুদি জেরুজালেমে বসবাস করত। তখন অবধি তা প্রাচীন শহরের রূপেই ছিল। শহরটির মূল প্রাচীরের বাইরে তখনও কোনো ঘরবাড়ি গড়ে ওঠেনি। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। রাশিয়ার নিপীড়িত ইহুদিরা প্যালেস্টাইন উপকূলীয় শহর শ্যারনে নিজেদের কলনি প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ত ছিল বলে তারা কৃষিকাজ করতে পারত না। তাই সিরিয়ান শ্রমিকদের ভাড়া করে নিজেদের কাজ করিয়ে নিত। আর ইহুদিরা ছাতার নিচে বসে কাজ তদারকি করত এবং প্রখর রোদ থেকে নিজেদের চামড়া রক্ষা করত।

১৯০২ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে প্যালেস্টাইন গিয়ে দেখি, তাদের কলনিগুলো কৃষিকাজে ভীষণ মনোযোগী হয়ে উঠেছে। আরও লক্ষ করলাম, জেরুজালেমের বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় ইহুদিরা ঘড়বাড়ি গড়ে তুলতে শুরু করেছে। এই প্রথম শহরটির প্রধান প্রাচীরের বাইরে সাধারণ মানুষ ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। তারা নিজ উদ্যোগে কৃষিকাজ, কায়িক শ্রম এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলে। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেন নিজ চোখে সেসব কেন্দ্র একবার হলেও দেখে যাই। এটা দেখে আমি এতটাই অবাক হই যে, সেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদেই নেই। ইহুদি, মুসলিম ও খ্রিষ্টান সব গোত্রের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কৃষিকাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, এটা আমার দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম দৃশ্যগুলোর একটি। সেখানে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ছিল তাদের সকল কাজের মূল উদ্দীপনা। সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর এক সমাজব্যবস্থা।

দেশে ফিরে আসার পর ওপর থেকে আমাকে চাপ দেওয়া হয়, যেন এ বিষয়টি কোনো পত্রিকায় প্রকাশ না করি। খুব দুঃখ নিয়ে বলতে চাই, এই বল প্রয়োগ আসে আমেরিকার বিশেষ একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে। ইহুদি, মুসলিম ও খ্রিষ্টান শান্তিতে বসবাস করুক, তা তারা মেনে নিতে পারে না। তাদের অভিযোগ, মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে ইহুদি সম্প্রদায় সংক্রমিত হয়ে পড়েছে। তারা চায়– ইহুদিদের জন্য পৃথক একটি সমাজব্যবস্থা থাকবে। ভূমি দখলের প্রতিযোগিতায় তাদের দ্বিতীয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে যখন পুনরায় প্যালেস্টাইন সফরে যাই, তখন দেখি ইহুদিরা ভীষণ সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। তাদের মাথায় ভূমি দখলের ভূত আগাগোড়া চেপে বসেছে।

দেখলাম, কৃষিকাজে তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ফল, ফসল ও শরাব উৎপাদন তাদের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। উৎপাদন কাজ ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন প্রযুক্তির সংযোজন করেছে। কিন্তু যেসব ভূমি অধিগ্রহণ করে ইহুদিরা কৃষিকাজ করছে, তা কখনোই তাদের ভূমি ছিল না। শ্যারন প্লেইন, এসড্রাইলোন প্লেন ও জর্ডান ভ্যালি হলো প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে উর্বর ভূ-অঞ্চল; বর্তমানে যা জায়োনিস্টদের দখলে। এই ভূমিগুলো তাদের শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। তত দিনে জেরুজালেমে ইহুদিদের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের একদল পরজীবী ছত্রাকের ন্যায় অন্যের ঘাড়ে চেপে বসেছে, আর সামান্য কিছু বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত আছে।

শহরটি এখন সাম্প্রদায়িক জায়োনিস্টদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। বোলশেভিজমের চেতনা পুরো প্যালেস্টাইনকে পেয়ে বসেছে। হিব্রু প্রতিষ্ঠানগুলো গির্জা ও মসজিদ নিয়ে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইচ্ছা করে খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মগজে সাম্প্রদায়িকতার আগুন প্রজ্বলিত করছে। আমার সৌভাগ্য যে, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের বিভিন্ন ক্যাম্প সফর করার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু ভাষাগত জটিলতার দরুন তাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারিনি। আরব-ইজরাইল সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল বলে আরও অনেক জায়গায় যেতে পারিনি। পরে না জানি আরবরা আমাকে জায়োনিস্ট গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে!

এটা বহু আগে থেকেই জানা ছিল যে, জায়োনিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করত। তারা যেন খ্রিষ্টান বা মুসলিমদের কোনো সহযোগিতা ছাড়াই নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে, সে জন্যই মূলত এই ভাতার ব্যবস্থা। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক খ্রিষ্টান তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জায়োনিস্টদের পক্ষে কলাম ছাপতে শুরু করেছে। এই বিশ্বাসঘাতকতাই সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

তারা যেন জেরুজালেমসহ প্রতিটি পবিত্র শহরে (যেমন : হেবরন, টাইবেরিয়াস, সাফেদ ইত্যাদি) ফিরে যাওয়ার পথে বিশ্ববাসীর সমর্থন পায়, সে জন্য খ্রিষ্টান সংগঠনগুলোকে বড়ো অঙ্কের উপঢৌকন প্রদান করে যাচ্ছে। খ্রিষ্টান গির্জাগুলো তাদের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সাফাই গেয়ে প্রার্থনায় রত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে অধিকাংশ ক্যাথলিক গির্জা এই পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে। জায়োনিস্ট কমিটি প্যালেস্টাইনের গির্জাগুলোতে আন্তর্জাতিক মহলের বাৎসরিক চাঁদা পাঠানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

কিছুদিন আগে জায়োনিস্ট প্রতিষ্ঠান Hebrew Edition একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'Malignant Leprosy'। আর্টিক্যালটি ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ায় সেখানে কী প্রকাশ করা হয় তা জানা যায় : ইহুদি অভিভাবকরা যেন অতি সত্বর তাদের সন্তানদের জ্যান্টাইল পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে আনে, সে বিষয়ে আদেশ-নিষেধ জারি করা হয়। যদিও সেসব প্রতিষ্ঠানে খ্রিষ্টান বা ইসলাম ধর্মের কোনো কিছু শেখানো হয় না, তারপরও ইহুদিরা চায় তাদের সন্তানরা বিধর্মীয় সংস্কৃতির সকল সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকুক। যদি কোনো অভিভাবক এই নির্দেশ অমান্য করে, তবে তাদের ওপর যে শাস্তি নেমে আসবে, তার ফল শেষ প্রজন্মকে পর্যন্ত ভোগ করতে হবে।

একমাস পর Hebrew Edition দ্বিতীয় আর্টিক্যালটি প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'Fight and Win'। যেসব অভিভাবক তাদের সন্তানদের জ্যান্টাইল পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে আনেনি, তাদের সকল সুযোগ শেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। নিচে লক্ষ করুন–

> 'সতর্কবাণী পাওয়ার পরও যে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের জ্যান্টাইল পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সরিয়ে আনেননি, তাদের প্রত্যেকের নাম রাস্তার মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি পত্রিকায় বড়ো বড়ো করে ছাপানো হবে। রাস্তায় রাস্তায় প্লাকার্ড করে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্বাসঘাতক এবং সীমালঙ্ঘনকারী বলে তাদের অভিহিত করা হবে। তাদের নাম প্রতিটি হাসপাতাল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইহুদি ডাক্তারদের কাছে তারা আর সেবা পাবে না। তাদের নাম ব্লাক লিস্ট করে American Jewish Relief Fund-এর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাদের জন্য ভবিষ্যতে আর কোনো ভাতার ব্যবস্থা করা হবে না। আমরা সবাই তাদের এড়িয়ে চলব। তাদের সন্তানদের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের বিয়ে হবে না। তাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। জাতিগতভাবে আমরা তাদের বর্জন করছি। তাদের জন্য দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। সকল দয়া-মায়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সম্প্রদায়ের একটা শিক্ষা হওয়া উচিত। যদি আমাদের কেউ তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও প্রদর্শন করে, তবে তাকেও এই কাতারে ফেলা হবে। আগামী দিনগুলোতে আমাদের মধ্য হতে কেউ যদি এমন কাজ করে, তবে তার ওপরও একই শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হবে।'

১৯২০ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেরুজালেমে তখন ২৮ হাজার ইহুদি, ১৬ হাজার খ্রিষ্টান এবং ১৫ হাজার মুসলিম বসবাস করত। ইংলিশ সরকারের পাহারায় ইহুদিরা নিরাপদে এই শহরে আসতে থাকে। এতে তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে ইস্টার সানডে এবং ইহুদিদের পাসওভার একই দিনে পড়ে।

তার সঙ্গে যোগ হয় মুসলমানদের নবি মুসা উৎসব, যা সাত দিন পর্যন্ত পালিত হয়। প্রথমে তারা এক ধর্মীয় বক্তব্য শোনার জন্য হারাম-আস-শরিফে জড়ো হয়। দ্বিতীয় অংশে, মৃত সাগরের পাশে নবি দাউদ (আ.)-এর কাল্পনিক কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে তারা সাত দিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করে। অটোমানরা যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন প্রতিটি সম্প্রদায় যেন নিজেদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হতো, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এখানে ব্যর্থ হয়েছে।

যেহেতু ইহুদিরা এখন জেরুজালেমের রাজা, তাই তারা অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজেদের উৎসব পালনে ঘৃণ্য উপায়ে বাধা দিতে শুরু করে। এ কারণে উৎসবের দিন দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টানদের অনেকেই সেদিন ঘরে বসে ছিল, কিছু লোক গির্জায় উপস্থিত ছিল। তারা রাস্তায় নেমে উৎসব করার সাহস পাচ্ছিল না। কারণ, জায়োনিস্টরা তত দিনে সামরিক শক্তিতে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে প্রচুর অস্ত্র ছিল।

কিন্তু মুসলিমরা ঘরে বসে ছিল না। হেবরন থেকে একদল মুসলিম প্লাকার্ড হাতে জাফা শহরের প্রধান ফটকের সামনে হাজির হতে শুরু করে। প্লাকার্ডগুলোতে ধর্মীয় অসিহষ্ণুতার বিরুদ্ধে স্লোগান লেখা ছিল। ব্রিটিশ সৈনিকের অনেকে সেদিন সামনে এগিয়ে আসেনি। কারণ, তাদের সবাই ছিল খ্রিষ্টান। কিছুদিন আগেই তারা দেখেছে– ইহুদিরা কীভাবে অকথ্য ভাষায় যিশুকে অপমান করেছে। তা ছাড়া তাদের অনেকে গির্জায় প্রার্থনা করছিল। এমতাবস্থায় ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদিদের কাছে আধুনিক অস্ত্র থাকলেও তারা যুদ্ধ করতে জানত না। অপর দিকে মুসলিমরা ছিল সংখ্যায় অল্প। তাদের হাতে ছুড়ি-তরবারি ছাড়া কিছুই ছিল না। তারপরও মুসলিমরা যুদ্ধে অসম্ভব পারদর্শী ছিল।

কারণ, আরব জাতটাই এমন। শহরের ভেতরে প্রাচীন সেফার্ডিক বস্তিগুলোতে কিছু স্থানীয় ইহুদি বসবাস করত। শেষে তারাই বলির পাঠা হলো। জায়োনিস্ট ইহুদিরা আলিশান বাড়ি করে একই শহরে থাকত। মুসলিমরা শহরের ঢোকা মাত্রই ওপর থেকে গুলি ছোড়া শুরু হয়। নিরীহ সেফার্ডিকরা আতঙ্কে এদিক-সেদিক দৌড়াতে শুরু করে। অফিসিয়াল তথ্য অনুযায়ী– এই দাঙ্গায় দুজন মারা যায়। ইংলিশ বিচারবিভাগ মুসলিম ও ইহুদিদের সমানভাবে অভিযুক্ত করে শাস্তি ভাগ করে দেয়, যদিও তদন্ত প্রতিবেদনে ইহুদিরাই ছিল মূল খলনায়ক। এই পারস্পরিক সংঘাত আদৌ কখনো বন্ধ হবে কি না বলা অসম্ভব।

জায়োনিস্ট কমিটি Sir H. Samuel-কে প্যালেস্টাইনের গভর্নর করে পাঠায়। তার এই আগমন পুরো প্যালেস্টাইনে নতুন সংঘাতের জন্ম দেয়। তিনি জেরুজালেমে প্রবেশের আগেই তার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং মুসলমানদের শহর নেবলাসে কোনো ইহুদিকে ঢুকতে দেওয়া হবে না মর্মে কিছু হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। তাই H. Samuel পূর্ণ সামরিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে জাফায় প্রথম প্রবেশ করে। আমি নিজে দেখেছি,

তার সামনে-পিছে মেশিনগান হাতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। একই পদ্ধতিতে তিনি নেবলাস হয়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। শহরে প্রবেশ করেই তিনি নতুন আজ্ঞা জারি করেন। যদিও সেই দাঙ্গায় খ্রিষ্টানরা জড়িত ছিল না, কিন্তু তারপরও মুসলিমদের প্রতি তাদের মৌন সমর্থন ছিল। তাই উভয়কেই একই অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। তা ছাড়া ব্রিটিশ বাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকায় তাদের এই শহর দেখা-শোনায় অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এতটুকু দেখার পর আমি প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে আমেরিকায় চলে আসি। যতদিন সেখানে ছিলাম, চেষ্টা করেছি সঠিক তথ্যটি সংগ্রহ করতে; যদিও তা সহজ ছিল না।

প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ কী হতে যাচ্ছে, তা এত শীঘ্রই বলা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকার যে কতদিন তাদের নিরাপত্তা দিয়ে রাখবে, তাও বিতর্কের বিষয়। সত্যি-ই যদি ব্রিটিশ সরকার সাম্য, সৌহার্দ্য ও অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্যালেস্টাইন শাসন করতে শুরু করে, তবে এই দেশ এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। কিন্তু জায়োনিস্টরা এটা মেনে নেবে না। জায়োনিস্টদের অত্যাচারে পুরো প্যালেস্টাইন এখন একটি করদরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। হয়তো জায়োনিস্টদের চাপে ব্রিটিশ সরকার একদিন তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তখন নতুন এক পরিস্থিতির জন্ম হবে। ইরাক, সিরিয়া ও মিশর থেকে দলে দলে মুসলিম বাহিনী এই ভূমি স্বাধীন করতে এগিয়ে আসবে। ব্রিটিশ সরকার ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছে, বিশ্বব্যাপী তার উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ভিত কেঁপে উঠছে। মিশরে ইতোমধ্যে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জোরদার হয়েছে। ভারত থেকে যে মুসলিম সৈন্যদের তিনি ইহুদিদের নিরাপত্তার তাগিদে নিয়ে এসেছেন, তারাও কিছুদিন পর বেঁকে বসবে। কারণ, নিজ মুসলমান ভাইদের ওপর তারা কখনো বুলেট চালাবে না। এখন এটা সময়ের ব্যাপার যে, সামনে কী হতে যাচ্ছে।’

দাঙ্গাবাজ ইহুদিদের অপকর্ম চিত্র

১৮৯৭ সালের জায়োনিস্ট সম্মেলনে Theodor Herzl যে খসড়ালিপি উপস্থাপন করেন, তার দেড় যুগ পার না হতেই পৃথিবীতে একটি বিশ্বযুদ্ধ আঘাত হানে।

১৯০৩ সালে কিশিনেভে বসবাসরত ইহুদিদের সঙ্গে জ্যান্টাইলদের দাঙ্গা বাধে। ফলে সেখানে বহু ইহুদি নিহত হয়। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার উগান্ডায় তাদের একটি উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। Dr. Herzl এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

কেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো, তা নিয়ে তাদের মহলে প্রচণ্ড হইচই পড়ে যায়। কারণ, তাদের লক্ষ্য জেরুজালেম। অন্য কোনো ভূমির কথা তারা ভাবতেই পারে না। ইতঃপূর্বে তাদের আর্জেন্টিনায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেখানেও তারা একই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তাহলে উগান্ডা প্রস্তাবে Dr. Herzl রাজি হলেন কেন? এর কিছুদিন পর শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি এই রক্তাক্ত যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি! তবে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, তাদের আর উগান্ডায় যেতে হয়নি; বরং তারা জেরুজালেমকেই চূড়ান্ত ভূমিরূপে ফিরে পেয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, তারা কি এই যুদ্ধের কথা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর তাদেরই একটি উৎস থেকে উপস্থাপন করা হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ *American Jewish News*-এর প্রধান মুখপাত্র, *Litman Rosenthal* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'When Prophet Speak' শিরোনামে একটি কলাম প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি বহু বছর আগেই বেলফোর ঘোষণার পূর্ববাণী করেছিলেন। তিনি হলেন Max Nordau। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাবশালী এক জায়োনিস্ট আন্দোলনকারী। Litman ছিলেন Nordau-এর ঘনিষ্ঠ সহচর। কলামটিতে ষষ্ঠ জায়োনিস্ট সম্মেলনে Nordau সাহেবের দেওয়া একটি বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়, যেখানে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ইজরাইল পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কলামটি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

'WHEN PROPHET SPEAK

By Litman Rosenthal

দিনটি ছিল শনিবার। ষষ্ঠ জায়োনিস্ট সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পরদিন। সম্মেলনটি ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে বাসেলে অনুষ্ঠিত হয়। Dr. Herzl টেলিফোনে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেন।

হোটেলে প্রবেশ মাত্রই তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি রাশিয়ায় জায়োনিস্ট আন্দোলনের খবর জানতে চাইলেন।

প্রশ্ন করলাম– 'আপনি কেবল রাশিয়ার খবর জানতে চাচ্ছেন কেন?'

জবাবে তিনি বললেন– 'কারণ, আমার ছেলের কাছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এর ওপর ইহুদিদের অনেক স্বার্থ নির্ভর করছে।'

সম্মেলনে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত পশ্চিম আফ্রিকার উগান্ডাকে তাদের উপনিবেশ তৈরি করা নিয়ে আলোচনা হয়। (Herzl ও তার প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাবনায় রাজি হন– *Jewish Encyclopedia*, Vol. 12, Page 678)। তবে প্যালেস্টাইনকে বিসর্জন দিয়ে নয়; বরং প্যালেস্টাইনকে ফিরে পাওয়ার ধাপ হিসেবেই একে গ্রহণ করা হয়। এটি ছিল Herzl ও Rosenthal-এর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। Herzl বলেন– 'আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা অর্জনের পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।'

এবার সম্মেলনে Dr. Nordau কী বলেছেন এবং কোন সৌভাগ্যবশত তাতে যোগ দিয়েছিলাম, সেই গল্প নিচে উল্লেখ করা হলো :

'সেবার এক ব্যবসায়িক সফরে ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। লিওনস যাওয়ার পথে কিছু সময়ের জন্য প্যারিসে যাত্রা বিরতি করি। প্রতিবারের মতো সেবারও জায়োনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। এক বন্ধু বলল, আজ সন্ধ্যায় Dr. Nordau ষষ্ঠ জায়োনিস্ট সম্মেলনে বক্তৃতা দেবেন। তার বক্তৃতা শুনতে ব্যবসায়িক সফরটি দীর্ঘায়িত করলাম। সন্ধ্যার মধ্যেই সম্মেলন কক্ষে হাজির হলাম। কক্ষটি ততক্ষণে জনসমাগমে গিজগিজ করছিল। তিনি সম্মেলন কক্ষে পৌঁছা মাত্রই সবাই দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানাল। কোনো রকম দৃষ্টিপাত না করে তিনি সরাসরি বক্তৃতা মঞ্চে চলে গেলেন। এরপর বলা শুরু করলেন–

"জানি, আপনারা সবাই একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ব্যাকুল হয়ে আছেন। প্রশ্নটি হলো- কীভাবে আমি ও Herzl ব্রিটেনের প্রস্তাবিত উগান্ডা প্রস্তাবনায় রাজি হলাম?

কেনই-বা প্যালেস্টাইন ইস্যু থেকে সরে এলাম এবং আমাদের সহস্র বছরের পরিকল্পনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম? এর জবাবে আপনাদের বলতে চাই, উগান্ডা প্রস্তাবনায় রাজি হওয়ার পেছনে অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে। আসলে Herzl সাহেবকে এই প্রস্তাবনায় রাজি হওয়ার জন্য আমিই অনুরোধ করি। কেন এমনটা করেছি তা বলার আগে আপনাদের একটি গল্প শোনাতে চাই।

আমি এমন একটি সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি, যা আপনাদের অনেকেই জানেন না। তখন ইউরোপের ক্ষমতাধর শক্তিগুলো সেভাস্টোপল দুর্গ দখল করতে নৌ-বহর পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল। তখনও স্বাধীন ইতালির জন্ম হয়নি। সার্ডিনিয়ার একটি ছোটো শাসনাঞ্চল হিসেবে এটি পরিচিত ছিল, কিন্তু তখন এর ওপর অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। সার্ডিনিয়াবাসী স্বাধীন ইতালি প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এর পেছনে যে কয়জন মহান নেতার পরিচয় পাওয়া যায়, তারা হলেন– Garibaldi, Mazzini ও Cavour।

ইউরোপের শক্তিধর দেশগুলো সার্ডিনিয়াকে সেভাস্টোপল আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমাবস্থায় সেভাস্টোপল ইস্যুতে সার্ডিনিয়া অস্বীকৃতি জানায়। বিশেষ করে Garibaldi ও Mazzini এই যুদ্ধে জাহাজ পাঠাতে রাজি হয়নি। তারা বলে– "আমাদের পরিকল্পনা ইতালি প্রতিষ্ঠা নিয়ে। সেভাস্টোপলে গিয়ে আমরা কী করব? সেখানে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। আমাদের সব শক্তি ও ক্ষমতা শুধু ইতালি প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয় করা উচিত।"

কিন্তু Cavour ছিলেন ব্যতিক্রমী ও দূরদর্শী একজন নেতা। তিনি বলেন– "আমাদের উচিত ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেভাস্টোপল আক্রমণ করা।" আসলে Hartam নামে তার একজন ব্যক্তিগত সচিব ছিল, যিনি জাতিতে ইহুদি। তিনি কেবল তার ব্যক্তিগত সচিবই ছিলেন না; খুব কাছের বন্ধুও ছিলেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে Cavour সাহেবকে পরামর্শ দিতেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সার্ডিনিয়ার অনেকেই Cavour-কে বিশ্বাসঘাতক বলে ডাকতে শুরু করে। অনেকে তার ব্যক্তিগত সচিবকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় নিয়ে আসে। প্রশ্ন করা হয়– বিশ্বাসঘাতকের মতো এমন বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কী?

তিনি বলেন– "যে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের এত যুদ্ধ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, তার মূলে রয়েছে স্বাধীন ইতালি প্রতিষ্ঠার দৃঢ় বাসনা। এ জন্য আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। মায়েরা তাদের সন্তানদের বিসর্জন দিয়েছে। আমাদের সব আত্মত্যাগ তখনই পবিত্র বলে গণ্য হবে, যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব।"

তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, সেভাস্টোপল যুদ্ধের পর একটি শান্তি আলোচনা হবে। সেখানে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি দেশ আসন গ্রহণ করবে। সার্ডিনিয়ার হয়তো সেভাস্টোপল নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শান্তি আলোচনার অংশীদার হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। যখন সবাই যুদ্ধের মুনাফা ভাগ-বটোয়ারা নিয়ে দাবি তুলবে, তখন আমরা স্বাধীন ইতালির দাবি করব। এভাবে Cavour উপস্থিত নীতি-নির্ধারকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন সেভাস্টোপল আক্রমণ করা হবে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ।

পুরো কক্ষ এতক্ষণ Nordau সাহেবের বাণী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামলে সবাই হাততালি দিতে শুরু করে। সবাইকে থামার নির্দেশ দিয়ে তিনি আবারও বলতে শুরু করলেন–

"বর্তমান বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি ব্রিটেন কিশিনেভ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহমর্মিতাস্বরূপ আমাদের উগান্ডা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা জানি উগান্ডা আফ্রিকাতে, আর জায়োনিজমও কখনো আফ্রিকার জন্য তৈরি হয়নি। Herzl সাহেব খুব ভালো করেই জানেন, রাজনৈতিক পরাশক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কোনো বিকল্প হতে পারে না। এমতাবস্থায় ব্রিটেনকে হাতছাড়া করা উচিত হবে না। আমরা একটি মহাবিপ্লবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। খুব দ্রুত এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যার দরুন আবারও একটি শান্তি আলোচনার আয়োজন করা হবে। সেখানে পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশের প্রতিনিধিরা হাজির হবে। আমরা পুনরায় ষষ্ঠ জায়োনিস্ট সম্মেলনের বিষয়াবলি উপস্থাপন করব। ব্রিটেন পূর্বের ন্যায় আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এখন উগান্ডাবিষয়ক প্রশ্নে সার্ডিনিয়াকে অনুকরণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাজাতে পারি। আর তা হচ্ছে– Herzl, জায়োনিস্ট সম্মেলন, ইংল্যান্ডের উগান্ডা প্রস্তাবনা, ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ), যুদ্ধপরবর্তী শান্তি আলোচনা এবং সবশেষে ব্রিটেনের সহায়তায় প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

শেষ কিছু শব্দ আমাদের কানে বর্জের ন্যায় আঘাত করে। আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনি, একজন মানুষ কীভাবে ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তার এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধার বিষয়ে জায়োনিস্টদের সকল সংশয় মুহূর্তেই উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। সবার আবেগ-উৎকণ্ঠাকে তিনি আরও কিছু সময়ের জন্য ধৈর্যে পরিণত করতে সক্ষম হন। এরপর আমরা সবাই তার ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সেই কাঙ্ক্ষিত সময়টির জন্য দিনক্ষণ গণনা শুরু করলাম।'

পাঠকদের অবাক লাগতে পারে, Litman Rosenthal-কে কীভাবে এমন একটি কলাম লেখার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো! আসলে বেলফোর ঘোষণার পূর্বে এই কলামটি প্রকাশিত হয়নি। ইহুদিদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়

জনসম্মুখে আসতে দেবে না, যতক্ষণ না তার উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়। এ বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে বেলফোর ঘোষণার অনেক পরে। ১৯০৩ সালের কর্মসূচিতে স্থান পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো–

১. ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ
২. শান্তি আলোচনা
৩. নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন।

একই উদাহরণ পাওয়া যায় জার সাম্রাজ্যের পতনের সময়ও। প্রথমে বলা হয় Nicholas Romanovitch-সহ তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েদের যারা হত্যা করে, তারা ছিল সোভিয়েত ডেপুটি, কিন্তু অনুসন্ধানের পর পরিষ্কার হয়– হত্যাকারী পাঁচজনই ছিল ইহুদি। তারা সোভিয়েত ডেপুটি ছদ্মবেশে Nicholas পরিবারকে হত্যা করে। এর পেছনে ছিল আমেরিকান জায়োনিস্টদের বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ।

অবশেষে সেই দিনটি চলে আসে, যখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজপরিবারের সদস্য Archduke Franz Ferdinand সস্ত্রীক আততায়ীর হাতে নিহত হন। দিনটি ছিল ২৮ জুন, ১৯১৪। সেদিন তিনি সস্ত্রীক বসনিয়ার রাজধানী সারাজেভো ভ্রমণ করছিলেন। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়, সার্ব-বসনিয়ার জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'ব্লাক হ্যান্ডসদের' দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে।

২৩ জুলাই এই জাতীয়তাবাদ সন্ত্রাসী সদস্যদের আটক করার জন্য অস্ট্রিয়া সরকার সার্বদের ওপর সামরিক চাপ বৃদ্ধি করে। ঠিক তার পরদিন সার্বরা রাশিয়ানদের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। রাশিয়া বিনা বাক্যে সেই আবেদনে সাড়া দেয়। ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে, যা এক অর্থে রাশিয়ানদের ওপরেও যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। এরপর অস্ট্রিয়ার সমর্থনে পাশে এসে দাঁড়ায় জার্মানি ও অটোমান। অন্যদিকে রাশিয়ার পক্ষে দাঁড়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

Nordau সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুদ্ধ ঠিক সময়ই শুরু হয়। আর যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা তারা ভালো করেই জানত। কারণ, কার ভান্ডারে কতটুকু রসদ মজুত আছে সে হিসাব তারা আগেই কষে রেখেছিল। প্রতিটি দেশের প্রশাসনিক বিভাগে তাদের যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি ছিল। তাদের অতি প্রাচীন একটি সংস্কৃতি হচ্ছে– তারা নিরপেক্ষতার ছুতো ধরে যুদ্ধের উভয় পক্ষকে ঋণ ও রসদ সরবরাহ করত এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত একটি পক্ষের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিত। এতে তাদের ভান্ডারে যেমন মুনাফা আসত, তেমনি কাঙ্ক্ষিত পক্ষটিও যুদ্ধে জয়লাভ করত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর তারা অপেক্ষা করতে লাগল, কখন মিত্রশক্তির রসদ ফুরিয়ে যাবে। ব্রিটেনের জাহাজগুলো জার্মানির বিরুদ্ধে এমনিতেই প্রতিরোধ গড়তে পারছিল না।

তার ওপর রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ায় তারা মাঝপথে যুদ্ধ থেকে সরে পরে। অসহায় হয়ে যায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

তাদের অসহায়ত্বের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়ে, যখন ইহুদি ব্যাংকাররা ১৯১৬ সাল থেকে সকল প্রকার ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়। কিছুদিন পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সামরিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। এর দরুন তারাও যুদ্ধ থেকে সরে পড়ে। বাকি থাকে শুধু ব্রিটেন। তারা যে একাকী এই যুদ্ধে কখনো জিততে পারবে না, তা জায়োনিস্টরা বেশ ভালো করেই জানত। সেই মুহূর্তে ব্রিটেনের জন্য সামরিক শক্তিতে পুষ্ট কোনো মিত্রশক্তির আবশ্যকতা দেখা দেয়। আর এই সুযোগ যে ইহুদিদের সামনে আসবে, তা তারা যুদ্ধের আগ থেকেই আচ করতে পেরেছিল। তাই তারা এতদিন ওত পেতে অতি গোপনে নতুন একটি সামরিক বাহিনী তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। আর তা-ই হলো আজকের আমেরিকা।

এই কাজের পুরো দায়িত্ব অর্পিত হয় Bernard M. Baruch-এর ওপর। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ দেশটিকে রণ শক্তিতে এতটা পারদর্শী করে তোলেন যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মাথায় তারা জার্মানিকে সমূলে পরাজিত করে। ব্রিটেনের হাতে তুলে দেয় বিজয় মুকুট। এরপর ব্রিটেনও তাদের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ, যুদ্ধ জয়ের বিনিময় হিসেবে জায়োনিস্টদের হাতে তুলে দেয় প্যালেস্টাইনের চাবি।

Mr. Baruch ১৮৭০ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম Simon Baruch। যুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার ৩৫১-৩৫৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। সে সময় তার মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তি আমেরিকায় দ্বিতীয় কেউ ছিল না; এমনকী খোদ প্রেসিডেন্ট সাহেবও নন। যে কোম্পানির ওপর একবার তার চোখ পড়ত, তা দখল করেই ছাড়তেন। যেমন : Liggett & Meyers Tobacco Company, Selby Smelter, Tacoma Smelter ইত্যাদি। তিনি মেক্সিকোতে বিশাল রাবার বাগান গড়ে তোলেন, যেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো। আয়রন, ইস্পাত ও কপার শিল্পের বাজারগুলোও তার দখলে ছিল।

১৯১২ সালে Woodrow Wilson-এর নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন। তখন থেকে তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সত্যিকারার্থে এটা কোনো সম্পর্ক ছিল না। বলা চলে, প্রেসিডেন্ট সাহেব তার হাতে বন্দি হয়ে পড়েন। মূলত এ দেশে যারা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়, তাদের সবাই জায়োনিস্টদের পুতুলে পরিণত হয়। এ কথা কেন বলছি, তা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে পরিষ্কার করব। যাহোক, এই সুযোগে Mr. Baruch সে সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি বনে যান। তিনি যা বলেতেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব তা-ই করতেন। অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কাঁচামাল, রসদ, সেনাবাহিনী ও শ্রমবাজারের মতো পাঁচটি বড়ো বড়ো প্রশাসনিক দপ্তর তিনি একাই চালাতেন।

যেহেতু আমেরিকা যুদ্ধে অংশ নেবে, তাই একটি সু-সংগঠিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই যুদ্ধকে ভয় পায় বলে এত দ্রুত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। Mr. Baruch প্রভোস্ট মার্শালকে কিছু উপায় বাতলে দেন। প্রথমে নির্ধারণ করেন, এই বাহিনীতে কোন কোন শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে নেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমেরিকার বেশ কিছু শিল্প সংগঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলমের এক খোঁচায় তাদের অবৈধ বলে আইন জারি করা হয়। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা কাজ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ রাতারাতি বেকার হয়ে পড়ে। এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে একজন বেকারকে যে কাজেরই সুযোগ দেওয়া হবে, তাতেই সে রাজি হবে। অন্তত নিজ পরিবারের জন্য হলেও রাজি হবে; ঠিক তাই ঘটল। এরপর যখন সেনাবাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, বেকাররা দলে দলে সেখানে প্রবেশ করতে শুরু করে। এভাবেই তৈরি হয় যুদ্ধকালীন আমেরিকার সেনাবাহিনী।

বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ Mr. Baruch প্রেসিডেন্ট সাহেবের থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলারের একটি বাজেট পাশ করান, যার পুরোটাই ছিল সাধারণ জনগণের ট্যাক্স ও বন্ড ক্রয়ের অর্থ। এত অর্থের বাজেট করেও যুদ্ধ শেষে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের বোনাস দেওয়া তো দূরের কথা, প্রাপ্য মজুরিটুকুও সামরিক বিভাগ মেটাতে পারেনি। তাহলে এত অর্থ গেল কোথায়? যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই দেখা যায়– নিউইয়র্কের ইহুদিদের আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে। সে সময় এই শহরের ৭০ শতাংশ মিলিয়নিয়ার ছিল এই জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা।

সাধারণ মানুষ তাদের দুঃখ-দুর্দশার দরুন প্রেসিডেন্টকে দোষারোপ করতে শুরু করে। কারণ, তার নির্দেশেই সেই শিল্প সংগঠনলো বন্ধ এবং সাধারণ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, অথচ তারা প্রাপ্য মজুরি পায়নি। ফলে চারদিকে ডেমোক্রেটবিরোধী আন্দোল ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, Woodrow Wilson ছিলেন এই দলের সদস্য। বোঝাই যাচ্ছিল এরপর যিনি ক্ষমতায় আসবেন, তিনি অবশ্যই রিপাবলিকান কোনো প্রার্থী হবেন। এবার ইহুদিরা তাদের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রিপাবলিকানদের পিছে অর্থ বিনিয়োগ শুরু করে। বিনিয়োগ সফলও হয়। ১৯২১ সালে ক্ষমতায় আসে রিপাবলিকান প্রার্থী Warren G. Harding। এদিকে সৈনিকদের বকেয়া মজুরির ফলাফল হিসেবে আমেরিকায় শুরু হয় ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ধ্বস, যা Great Depression ১৯২৯-১৯৩৯ নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ইহুদিদের নানা অপকর্মের চিত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বলকান দেশগুলোতে সাধারণ মানুষ যখন ক্ষুধা-দরিদ্রতায় হাহাকার করছিল, তখন আমেরিকা থেকে বেশ কয়েকটি ত্রাণবাহী জাহাজ সেখানে পাঠানো হয়। ত্রাণ বিতরণকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে জাহাজকর্মীদের মুখ হতে পাওয়া একটি অভিজ্ঞতার গল্প নিচে তুলে ধরা হলো–

'যুদ্ধপরবর্তী শান্তি মিশনের অংশ হিসেবে আমাদের জাহাজগুলো প্রয়োজনীয় ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে লিবাও বন্দরে হাজির হয়। চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের জাহাজটি ছোটো একটি স্রোতধারার সামনে নোঙর ফেলে ত্রাণ হস্তান্তর শুরু করে। এত এত মানুষ খাবারের জন্য হাহাকার করছিল যে, সুষ্ঠভাবে ত্রাণ বিলি করা অসম্ভব হয়। যখনই তাদের সামনে নতুন একটি আটার ব্যাগ খোলা হচ্ছিল, মানুষ যেন তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পরছিল। যেটুকু আটা মাটিতে পড়ছিল, সেটুকুর জন্যও মানুষের কাকুতি-মিনতির শেষ ছিল না। ক্ষুধার্ত মানুষরা ধুলো-ময়লা মাখা আটাগুলো পর্যন্ত তাদের পাত্রে ভর্তি করে রাখছিল। আলু বিতরণ শুরু হলে তো মারামারি বেধে যায়। আলুর খোসা পানিতে ছুড়ে মারলে ক্ষুধার্ত মানুষরা তাদের ধাতব পাত্র দড়িতে বেঁধে সেগুলো তুলে আনতে শুরু করে। সাদা বর্ণের শুকনো মানুষগুলো খাবারের জন্য সারা দিন উন্মাদের মতো বড়ো বড়ো চোখ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

'এর মধ্যে দেখা যায় ডজনখানেক ইহুদির কিছু কুৎসিত দৃশ্য। সবাই যখন খাবারের জন্য লাফালাফি করছে, তখন ভালো কাপড় পরা তাদের একদল সদস্যকে দেখা যায়, যাদের মাথায় ছিল সদ্য ক্রয় করা চকচকে টুপি, হাতে ছিল দামি ঘড়ি এবং পায়ে ছিল দামি জুতা; যেমনটা শহরের সম্পদশালী মানুষদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়, এই জাহজটি যেন তাদের জন্য সিগারেট নিয়ে এসছে! তারা আমাদের পাঁচ পাউন্ডের নোট দেখিয়ে বলছে, এক কাটুন সিগারেট হবে অথবা একটি স্বর্ণের ঘড়ির বিনিময়ে নতুন কিছু সাবান হবে? দেখে মনেই হয় না, তারা রাশিয়াতে কোনো রকম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে।'

খ্রিষ্ট যুগের সূচনা হতে আজ পর্যন্ত যত ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে, তার প্রধান কারণ হিসেবে কেন যেন শুধু খ্রিষ্টানদেরই অভিযুক্ত করা হয়। সর্বত্র প্রমাণ করার জোড় প্রচেষ্টা চলছে– খ্রিষ্টবাদ ঐতিহাসিকভাবেই সন্ত্রাসী চেতনায় বিশ্বাসী এবং তারাই পৃথিবীর অধিকাংশ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মূল হোতা! এ প্রসঙ্গে Rev. M. Malbert, 1921 সালের এপ্রিলে Hebrew Christian Alliance Quarterly থেকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল 'Persecution Is Not the Monopoly of Christian and Is Contrary to Its Principles।' প্রবন্ধটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো–

'অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাদের সব অপবাদের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করতে হবে। গত কয়েক হাজার বছরের সকল দাঙ্গা-সংঘাতের দায়ী হিসেবে পৃথিবীবাসী শুধু আমাদেরকেই অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম ধর্মীয় যুদ্ধের সূত্রপাত, ইহুদিদের হাতেই হলেও তারা এই বিষয়টি কখনোই স্বীকার করতে রাজি নয়। সময়ের পরিক্রমায় তারাই নিজেদের যুদ্ধবাজ জাতিতে পরিণত করেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১২০ সালে Simon-এর পুত্র John Hyrcanus ছিলেন মাক্কাবিয়ান পরিবারের শেষ ভাই। নিজেদের ধর্ম রক্ষার্থে তিনি সিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি জেরিজিন পর্বতের ওপর নির্মিত সামারিটান টেম্পল একেবারে ধ্বংস করে দেন। পরে ইডুমিয়ান রাজ্য দখল করেন এবং বন্দিদের ওপর দুটি পথ চাপিয়ে দেন। যথা : হয় ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করো, নয়তো দেশ ছেড়ে চলে যাও। তিনি জোড়পূর্বক একদল যুদ্ধবন্দির ওপর এই ধর্ম চাপিয়ে দেন।'

...John Hyrcanus-এর তৃতীয় পুত্র King Alexander ছিলেন মাক্কাবিয়ান রাজা। একজন পুরহিত হওয়ার পরও তিনি পরকালে বিশ্বাস করতেন না। এ জন্য ফেরাসিস গোত্র তাকে কখনো সহ্য করত না। খ্রিষ্টপূর্ব ৯৫ সালে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুক্কাতে তিনি প্রতিবারের মতো নিজের পৌরহিত্য জাহির করছিলেন (ইহুদি ক্যালেন্ডারে ৭ম মাসের ১৫তম দিনকে শুক্কাত বলা হয়)। পূজার বেদিতে পানি না ঢেলে তিনি নিজ পায়ে ঢালতে শুরু করেন। বুঝতে পারলেন, এই কাজে সবাই চটে গেছে এবং তার জীবন হুমকির মুখে। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন, আর তারা সেখানে উপস্থিত থাকা ৬০০০ মানুষকে হত্যা করে।

তবে ফেরাসিসদের প্রতিশোধ ছিল আরও ভয়ংকর। পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে তিনি তাদের দলনেতাকে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কেউ এই শান্তি আলোচনায় বসেনি; বরং সবাই তার মৃত্যুদণ্ডের দাবি তোলে। তারা নিজ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সিরিয়ান রাজা Eucaerus-কে প্যালেস্টাইন দখলের জন্য উসকে দেয় এবং তাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে। রাজা Eucaerus প্রায় ৪৩০০০ সৈন্য নিয়ে মাক্কাবিয়ান সাম্রাজ্য জিহিদিয়া আক্রমণ করে। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় Alexander পরাজিত হয় এবং ইফ্রয়িম পর্বতে আশ্রয় নেয়। পরে সিরিয়ান রাজাও ফেরাসিসদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। তাদের একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করা হয়নি। বিবেকের তাড়নায় দংশিত হয়ে তাদের প্রায় ৬০০০ সদস্য আবারও Alexander-এর কাছে ফিরে যায় এবং সাম্রাজ্য ফিরে পেতে আবারও যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে তারা সিরিয়ানরা পরাজিত হয়। এরপরও রাজা সাহেবের বিরুদ্ধে তাদের অনেকের পূর্ব অসন্তোষের রেশ থেকে যায়।'

...ইহুদিরা অধার্মিকতা বা নাস্তিকতা একদম সহ্য করতে পারে না। তাদের চোখে অন্য ধর্মের প্রত্যেকেই নাস্তিক। একমাত্র তারাই আস্তিকতার ধর্মে বিশ্বাসী। তারা আশেপাশের প্রতিটি শহরকে এই ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। যে শহরগুলো ইহুদি ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। তৎকালীন সেনহাড্রিনের সদস্য Simon ben Shetach তার শাসনামলে ৮০ জন নারীকে জাদুচর্চার অভিযোগে ডাইনি বলে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

...হিল্লেল ও শাম্মাই হলো খ্রিষ্টপূর্ব বছরগুলোতে তাদের বড়ো দুটি বিদ্যাপীঠ। ধর্মীয় নিয়মনীতিতে মত-পার্থক্যের দরুন তাদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ প্রায় লেগেই থাকত। যিশুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করাও ছিল তাদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ। তারা বিশ্বাস করে– ঈশ্বরের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো খ্রিষ্টান হত্যা!

রাবাই Tarpon একবার বলেছিলেন, গস্পেল এবং এপোস্টলের প্রতিটি বাক্য সৃষ্টিকর্তার নাম উল্লেখপূর্বক পুড়িয়ে ফেলা উচিত। তিনি আরও বলেন, খ্রিষ্টধর্ম পেগানিজমের চেয়েও বিপজ্জনক। প্রয়োজনে তিনি পেগানদের টেম্পলে আশ্রয় নেবেন, কিন্তু ক্যাথলিকদের সংস্পর্শে যাবেন না। Bar-Kosibah তাদের এক ভণ্ড পয়গম্বর, যিনি তার শাসনামলে প্রচুর খ্রিষ্টানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। রাজা Justinian-এর শাসনামলে তারা কৈসেরিয়ার আশেপাশে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের হত্যা এবং তাদের গির্জাগুলো ধ্বংস করে। গভর্নর Stephanus যখন দাঙ্গা হামলার শিকার খ্রিষ্টানদের রক্ষার প্রচেষ্টা করেন, তখন ইহুদিরা তাকেও হত্যা করে। ৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা অ্যান্টিও আক্রমণ এবং সেখানে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের ধারাল তলোয়ার দিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে। রাজা Sinaite-এর শরীর দড়িতে বেঁধে অ্যান্টিওকের রাস্তায় টেনেহিচড়ে হত্যা করে।

৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের রাজা ইহুদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করে এবং সেখানে থাকা খ্রিষ্টানদের গণহত্যায় মেতে ওঠে। তখন প্রায় নব্বই হাজার অধিবাসী জেরুজালেম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাইজ্যান্টাইন রাজা Heraclius পুনরায় প্যালেস্টাইন দখল করেন। যখন তার সৈন্যবাহিনী রোমান সাম্রাজ্য পাড়ি দিয়ে জেরুজালেম যাচ্ছিল, তখন এক সম্পদশালী ইহুদি তাকে নৈশ্যভোজের আমন্ত্রণ করে, যার নাম ছিল Benjamin।

তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পারস্যের রাজাকে জেরুজালেম দখলের জন্য উসকে দেন। রাজা Heraclius জিজ্ঞেস করেন– 'কেন তুমি নিজ ভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জেরুজালেমকে পারস্যের হাতে তুলে দিলে?' জবাবে তিনি বলেন– 'কারণ, সেখানে থাকা খ্রিষ্টানদের আমরা সহ্য করতে পারি না। এমনকী তারা মুসলিমদের নবি মুহাম্মাদের ওপরও কম অত্যাচার করেনি। তারা আরব নেতাদের মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর অনুসারীদের ছত্রভঙ্গ করার বহু প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এর মাধ্যমে যিশুর একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা পায়– তিনি নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু সত্য বাণী প্রচারে পিছপা হননি।'

এই প্রবন্ধ এখানেই শেষ নয়। কেউ যদি নিজ দায়িত্বে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ পাঠ করেন, তবে রক্তচোষা ইহুদি জাতির আরও অনেক ইতিহাস জানতে পারবেন। যখন তাদের ধর্ম পুনর্গঠন নিয়ে বিভিন্ন রাবাইদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল, তখন রাবাই Isaac M. Wise-কে হুমকি দিয়ে রাবাই Lilienthal বলেন– 'আপনি যদি নিজেকে খ্রিষ্টান বলে মনে করেন, তবে ক্রুশবিদ্ধ হতে প্রস্তুত হোন।' (Isaac Meyer Wise, p. 92)

যারা Gibbson-এর লেখা *Rise and Fall of the Roman Empire* বইটি পড়েছেন, তারা ১ম খণ্ডের ১৬তম অধ্যায়ে তাদের নির্মমতার আরও অনেক প্রমাণ পাবেন। ইতিহাস প্রমাণ করে– যারা আজ অবধি ধর্মকে ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তারা হলো ইহুদি। বইটির বিশেষ একটি অনুচ্ছেদ নিচে তুলে ধরা হলো–

> 'সম্রাট Nero Claudius-এর রাজত্ব থেকে Antonius Pius-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত রোমানদের কর্তৃত্ব ইহুদিদের অস্থির করে তোলে। যার দরুন তাদের সাথে প্রতিনিয়ত ছোটোখাটো দাঙ্গা লেগেই থাকত। মিশর, সাইপ্রাস ও সাইরিনের শহরগুলোতে তারা যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের জন্ম দিয়েছে, তা মানব ইতিহাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যে রাজ্য তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সেই রাজ্যের সাথেও ইহুদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত মনোভাবের দরুন তারা কেবল রোমান সাম্রাজ্যেরই নয়; বরং গোটা মানবজাতির শত্রুতে পরিণত হয়েছে।
>
> ইহুদিরা তাদের সেই অন্ধ বিশ্বাস আজ অবধি জিয়িয়ে রেখেছে, একদিন মহা প্রতিক্ষিত মশিহ হাজির হবেন। তিনি বিশ্ব সাম্রাজ্য তাদের হাতে তুলে দিয়ে এবং চারদিকে স্বর্গীয় আবহ তৈরি করবেন।'

তাদের উদ্দেশ্য প্যালেস্টাইন। বিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হয়ে উঠে 'বেলফোর ঘোষণা'। যে দশ সদস্যের বোর্ড থেকে এই ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়, তাদের সাতজনই ছিল এভানজেলিক খ্রিষ্টান; যাদের সঙ্গে বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্যালেস্টাইনে আরব উৎখাত বহু আগেই শুরু হয়েছে, কিন্তু ইহুদিদের জন্য এখনও তা নিরাপদ ভূমিতে পরিণত হয়নি। তাদের কৌশল ও চাপের মুখে ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফেঁসে গিয়েছিল। শুধু কি প্যালেস্টাইন? আরব, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে ২৫০-৩০০ বছরের যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন, তা নিয়েও ইহুদিদের কম পরিকল্পনা ছিল না।

রণক্ষেত্র ইহুদিদের অর্থ উপার্জনের আদর্শ শস্যক্ষেত্র

পূর্বের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যুদ্ধ ইহুদিদের নিকট অমিত সম্পদ উপার্জনের আদর্শ শস্যক্ষেত্র। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে যতগুলো যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, প্রতিটির পেছনেই এই জাতিগোষ্ঠীটির বড়ো অঙ্কের বিনিয়োগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের উভয় পক্ষকেই প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রসদ (খাদ্যশস্য, জামা-কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি) সরবরাহ করে ইহুদিরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে।

বিষয়টি নিয়ে ১৯১৩ সালে Werner Sombart একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার নাম *The Jews and Modern Capitalism*। বইটির ৫০ থেকে ৫৩ নম্বর পৃষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ বিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো–

'ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার প্রতিটি সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও রসদ সরবরাহের মূল কাজটি করত ইহুদিরা। এই বাণিজ্য যেন তাদের একচেটিয়া সম্পদে পরিণত হয়। ইহুদিরা ছিল যেকোনো রাজার নিকট ঋণ লাভের প্রধানতম উৎস। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যার সব এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে একটি পথ দেখিয়ে দিতে পারি, যা অনুসরণ করে যেকোনো উৎসাহী পাঠক নিজেদের গবেষণা চালিয়ে নিতে পারবেন।

১৪৯২ সালের আগ পর্যন্ত ইহুদিদের বড়ো একটি অংশ স্পেনে বাস করত। তখন স্পেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীগুলোতে ইহুদিরা প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের কাজ করত। সে গল্প এখানে আনতে চাচ্ছি না; বরং সেখান থেকে গল্প শুরু করব, যেখান থেকে ইংল্যান্ড-ইহুদি সম্পর্ক জোরদার হতে শুরু করেছে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর প্রধানতম রসদ সরবরাহকারী গোষ্ঠী হিসেবে চারদিকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। Antonio Fernandez Carvajal হলেন এমন একজন ইহুদি, যিনি কমনওয়েলথ সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ সরবরাহের বিশেষ দায়িত্ব পান। তিনি ১৬৩০ থেকে ১৬৩৫ এর মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে বসবাস শুরু করেন এবং খুব অল্প সময়ে মাঝেই নিজেকে সম্পদশালী বণিকে পরিণত করেন।

১৬৪৯ সালে তাকে ইংল্যান্ড সামরিক বাহিনীর প্রধান খাদ্য-রসদ সরবরাহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এ কাজে তার সহকারী হিসেবে একই জাতিগোষ্ঠীর আরও চারজন সদস্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সে সময় তিনি বাৎসরিক ১,০০,০০০ পাউন্ড সমমূল্যের রৌপ্য বাহিরের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতেন। ১৬৮৯ সালে William III রাজা হিসেবে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তার সামরিক বাহিনীর জন্য প্রধান রসদ সরবরাহকারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন Sir Solomon Medina। তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে একজন আরব ইহুদি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের সাথে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ফ্রান্সের সাথে নতুনভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের রাজা Louis XIV-এর সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের কাজ করত স্ট্রসবার্গের (Strasbourg) ইহুদিরা। Jacob Worms ছিলেন রাজা Louis XIV-এর ডান হাত, যার পরামর্শ ছাড়া তিনি এক কদমও চলতেন না। যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি Maurice বলেন, ইহুদি রসদ সরবরাহকারীদের দক্ষতার দরুন তিনি সামরিক বাহিনীকে যে রূপে সুসজ্জিত করেছেন, ইতঃপূর্বে কখনো তা করা সম্ভব হয়নি। Louis বংশের শেষ দুই রাজার আমলে প্রধান রসদ সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করেছেন Cerf Beer। ১৭২৭ সালে মেটজ (Metz) শহরের ইহুদিরা মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেখানকার সামরিক বাহিনীর জন্য ৫,০০০ হাজার নতুন ঘোড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে Abraham Gardis নির্মাণ করেন তার বিখ্যাত কোষাগার 'House of Gardis'। তা ছাড়া কুইবেক প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি নির্মাণ করেন আরও অনেক কোষাগার; যেখান থেকে ফরাসি বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সময়ে রসদ সরবরাহ করা হতো।

নেপোলিয়নের প্রতিটি যুদ্ধের ইতিহাস যদি ভালোভাবে অধ্যয়ন করা হয়, তবে সেখানেও উভয় দলে একই রসদ সরবরাহকারীর উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে।

দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চালিয়ে যাওয়ার দরুন, উক্ত শতাব্দীতে পুরো ফ্রান্সজুড়ে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। প্যারিস শহরের নগরপাল ইহুদিদের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছিল, যেন এই দুর্ভিক্ষ থেকে তাদের রক্ষা করা হয়। সেখানকার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত, একমাত্র ইহুদিদের পক্ষেই এই মহামারি সময়ে খাদ্যাভাব মেটানো সম্ভব। একইভাবে, ১৭২০ সালে ড্রেসডেন শহরে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে Jonas Meyer প্রায় ৪০ হাজার বুসেল সমপরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করে শহরটিকে রক্ষা করে। (১ বুসেল = ১৫.৪২ কেজি প্রায়।)'

জার্মানির ইতিহাস খুব ভালো করে অধ্যয়ন করলে সেখানেও অনেক ইহুদির পরিচয় পাওয়া যাবে, যারা বিভিন্ন সময়ে একচেটিয়াভাবে সেখানকার সামরিক বাহিনীতে রসদ সরবরাহের কাজ করত। যেমন: ১৫৩৭ সালে হেলবারস্টেড শহরের জার্মান সেনা ক্যাম্পে এই কাজের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন Isacc Meyer। খাদ্য-অস্ত্রসহ শত্রু পক্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি সেখানকার সেনা অফিসারদের নিকট সরবরাহ করতেন।

এরপর আসে Joselman von Rosheim-এর নাম, যিনি জার্মান সরকারকে খাদ্য, অস্ত্র ও তথ্য রসদের পাশাপাশি অর্থ ঋণ দিয়ে সাহায্য করতেন। তার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫৫৮ সালে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৫৫৬ সালে বোহেমিয়ান প্রদেশের ইহুদিরা স্থানীয় সেনা-ক্যাম্পগুলোতে সামরিক পোশাক ও কম্বল সরবরাহের বিষয়টি এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। ষোড়শ শতাব্দীতে Lazarus নামে আরও এক বিখ্যাত বোহেমিয়ান ইহুদির নাম শোনা যায়, যে নিজ দায়িত্বে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জার্মান সেনাবাহিনীর নিকট সরবরাহ করত। এর দরুন তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নানান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, যা কাজে লাগিয়ে সেও রসদ সরবরাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

সেক্সনি রাজ্যে এই কাজটি করত Samuel Julius। তা ছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধে কামান ও গান পাউডার সরবরাহের কাজ করত Leimann Gompertz ও Solomon Elias।

অস্ট্রিয়ার সামরিক বাহিনীতেও প্রধান রসদ সরবরাহকারী হিসেবে এমন অসংখ্য ইহুদির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। রাজা Leopold-এর শাসনামলে ইহুদিরা ভিয়েনাতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাতারাতি সেখানকার সামরিক বাহিনীতে রসদ সরবরাহের কাজটি নিজেদের করে নেয়। এমন কিছু বিখ্যাত ইহুদির নাম হলো- Oppenheimers, Wertheimers ও Mayer Herschel।

মধ্যযুগীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে এমন একটি উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীটির অংশগ্রহণ ছিল না। যুদ্ধে তো বহু রাষ্ট্রই অংশগ্রহণ করে। মিত্ররাষ্ট্রকে বাঁচাতে বহু দেশের সামরিক বাহিনী রণক্ষেত্রে যোগদান করে। তারা সম্মুখ সমরে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে এবং দেশ ও জাতীয়তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে নিজেদের সবটুকু উজার করে দেয়। কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপট অনেকটাই ভিন্ন। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ঠিকই, তবে রণক্ষেত্রে নয়। তারা প্রতিটি যুদ্ধকে অর্থ উপার্জনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ওপরন্তু অর্থের প্রতি নিজেদের লোলুপ বাসনা চরিতার্থ করতে ইহুদিরা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পারস্পরিক যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বাধীনতাপরবর্তী আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তাতেও ছিল ইহুদিদের বর্ণণাতীত কূটবুদ্ধি ও ষড়যন্ত্রের দৌড়াত্ম্য।

বহু শতাব্দী পূর্বে, ক্যাথলিক ও অর্থডক্সদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজি করে ইউরোপ জুড়ে যে রক্তাক্ষয়ী ধর্মীয় সংঘাতের সূত্রপাত, তার পরিসমাপ্তি আজও ঘটেনি। রক্তের সমুদ্র শুকিয়ে তাতে নতুন রক্ত ঝড়েছে, কিন্তু পরিবর্তন আসেনি সাধারণ মানুষের জীবন প্রবাহে। পরিবর্তন এসেছে শুধু ইহুদিদের সম্পদ ও প্রাচুর্যতায়। কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের রিপোর্টগুলো ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে এমন অনেক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যাবে, যেখানে বিভিন্ন সামরিক বাহিনীতে রসদ সরবরাহ করে ইহুদিরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। তেলের ড্রাম, কম্বল, রাইফেল, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি খুব পরিচিত কিছু রসদের নাম, যা তারা নিয়মিত সরবরাহ করত। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের সাথে আমেরিকানদের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলেছিল, সেখানেও ছিল এই রসদ ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য অধিপত্য।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে যে ব্যক্তির নাম চলে আসে, তিনি হলেন Moses Franks। একসময় তিনি ইংল্যান্ডে থাকতেন এবং ব্রিটিশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর আগ পর্যন্ত তিনি আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটিশ সেনা-ক্যাম্পগুলোতে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের সিংহভাগ আঞ্জাম দিতেন। তা ছাড়া কুইবেক, মন্ট্রেল, মেসাচ্যুসেট, নিউইয়র্ক ও ইলয়নসের ক্যাম্পগুলোতে তিনি ছিলেন প্রধান রসদ সরবরাহকারী।

Jacob Franks তখন নিউইয়র্কে বাস করতেন। মূলত Moses Franks-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে তার আমেরিকায় আগমন। তিনিও ব্রিটিশ সেনা-ক্যাম্পগুলোতে রসদ সরবরাহের কাজ করতেন। বলে রাখা উচিত, স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর পূর্ব হতে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সাথে ফ্রাঙ্ক পরিবারের ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই এই যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তারা ব্রিটিশ সেনা-ক্যাম্পগুলোতে রসদ সরবরাহ করত। যেহেতু ইহুদিরা কখনো এক পাত্রে সব ডিম রাখতে রাজি নয়, তাই কিছুদিন পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে শুরু করলে তাদেরই আরেকটি অংশ আমেরিকানদের জন্য রসদ সরবরাহ করতে শুরু করে।

David Franks হলেন তাদের একজন। তিনি ছিলেন Jacob Franks-এর পুত্র। শুরুর দিকে তিনি পেনসিলভানিয়ার ব্রিটিশসেনা-ক্যাম্পগুলোতে রসদ সরবরাহের কাজ করতেন। পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে অর্থ ও রসদ সরবরাহের কাজ শুরু করেন। অসম্ভব ধনী হওয়ার দরুন তিনি আমেরিকার রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদবিরুধী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। এই স্বাধীনতাযুদ্ধে মহান যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হয়, তাদের অনেকেই ছিল বিশেষ এই ব্যক্তির সাগরেদ।

মন্ট্রেল শহরে এই পরিবারের এমন আরেকজন সদস্যের নাম জানা যায়, যিনি আমেরিকানদের পক্ষে রসদ সরবরাহ করেতন, তিনি হলেন- David Solesbury Franks। তিনি ছিলেন Moses Franks-এর পৌত্র। রসদ বাণিজ্যে তিনি এতটা দক্ষ ছিলেন যে, কীভাবে সামরিক শক্তিতে দুর্বল একটি জাতির ভাগ্য রাতারাতি পালটে দেওয়া যায়, তা তিনি ভালো করে জানতেন। এ জন্য তাকে একটি উপাধি দেওয়া হয় 'A Blooded Buck'।

এ ছাড়াও ফ্রাঙ্কস পরিবারের আরও অনেক সদস্যের নাম এই স্বাধীনতাযুদ্ধে জাড়িয়ে আছে, যা উল্লেখ করে এই আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। পরবর্তী সময়ে আমেরিকা হয়ে উঠে ইহুদিদের আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্য বিস্তারের দুর্গক্ষেত্র। তবে Bernard M. Baruch প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ আমেরিকান সেনাবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে এই দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে এই বাহিনী কেবল ইহুদিদেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পথে কাজ করে যাচ্ছে।

আমেরিকার অর্থব্যবস্থায় ইহুদি দৌরাত্ম্য

ইহুদিদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল শক্তিঘর প্রতিষ্ঠিত হয় রথসচাইল্ড পরিবারের হাত ধরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে। এটি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও পরবর্তী সময়ে তা ইংল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে এর সাথে যুক্ত হয় আরও কিছু পরিবার। তাদের আধিপত্যও কোনো অংশে কম নয়।

মূলত অর্থ-সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে উঠে অর্থনীতি। আর তারই প্রাচুর্যতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে একটি দেশের রাজনৈতিক দল। তাই অর্থনীতির সাথে রাজনীতির সম্পর্ক খুবই গভীর। ইহুদি ব্যাংকাররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শাখা খোলার পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর অদৃশ্য আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। এর ফলে তারা প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে কলকাঠি নাড়ার অনুমতি পেয়ে যায়। রথসচাইল্ড ছাড়া আরও যে চারটি পরিবার এই শিল্পে একচ্ছত্র ক্ষমতাবান, তাদের নাম হলো : Belmont (বেল্টমন্ট), Schiff (স্কিফ), Warburg (ওয়াবার্গ) এবং Kahn (খান)।

১৮৩৭ সালে আমেরিকায় রথসচাইল্ড পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতে হাজির হন August Belmont। তার জন্ম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরে। পরবর্তী সময়ে তার হাত ধরে জন্ম নেয় বেল্টমন্ট ব্যাংকিং পরিবার। ১৮৬০ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ন্যাশনাল ডেমোক্রেট কমিটির প্রধান সভাপতি।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন Jacob Schiff। তার জন্মও ফ্রাঙ্কফুট শহরে। জার্মানিতে বাবার ব্যাংকে দীর্ঘকাল শিক্ষানবিশ হয়ে কাজ করার পর ১৮৬৫ সালে তিনি আমেরিকায় প্রবেশ করেন। তার বাবাও ছিলেন রথসচাইল্ড পরিবারের বিশেষ একটি শাখার প্রতিনিধি। তার সংগঠনের হাত ধরে প্রচুর জার্মান মূলধন আমেরিকায় প্রবেশ করে। তার অর্থে তৈরি হয় অনেক নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট, সেতু, মহাসড়ক, রেলপথ, উঁচু ভবন, বিমা প্রতিষ্ঠান ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠান।

১৮৭৫ সালে Theresa Loeb-কে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে তিনি Kuhn, Loeb & Company-এর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। জাপান-রাশিয়া যুদ্ধেও তিনি প্রচুর অর্থ জাপানের পক্ষে বিনিয়োগ করেন। ভেবেছিলেন এই বিনিয়োগের ছুতোতে হয়তো জাপানের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবেন, কিন্তু জাপান রাজা সতর্ক ব্যক্তি হওয়ায় ইহুদিদের ভাবগতি ভালো করেই জানতেন। তাই নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলিতে অন্যদের হস্তক্ষেপের ন্যূনতম সুযোগ দেননি।

Kuhn, Loeb & Company-এর সঙ্গে জড়িত আরেকজন ব্যক্তি হলেন Otto Herman Kahn। অন্যদের মতো তারও জন্ম ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম' তৈরির পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে তিনি আমেরিকায় আগমন করেন। তখন থেকেই আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাকে আমেরিকায় নিয়ে আসার পেছনে গোপনে কাজ করেন Paul Warburg।

এরপর চলে আসে ওয়াবার্গ পরিবারের নাম। ১৯০২ সালে পরিবারটির অন্যতম সদস্য Paul Warburg আমেরিকায় আগমন করেন।

তিনি ১৮৬৮ সালে জার্মানির হাম্বার্গ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই রপ্ত করেন 'কীভাবে অর্থ (Money) তৈরি করতে হয়।' একটু চিন্তা করে দেখুন, যেখানে প্রাপ্ত বয়সেও অনেকে জানে না কীভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয়, সেখানে তিনি কিশোর বয়সেই শিখে ফেলেছেন কীভাবে অর্থ তৈরি করতে হয়!

The Banking House of Warburg ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই ছিল তার কিশোরকালীন বিদ্যালয়।

ব্যাংকিং শিল্পে তিনি যেভাবে পারদর্শী হয়ে উঠেন, তা ৫ আগস্ট, ১৯১৪ সালে Banking and Currency Committee-তে নিজ মুখে স্বীকার করেন। তার পুরো বক্তব্য একজন শর্টহ্যান্ড লেখক লিপিবদ্ধ করেন। ১২ আগস্ট, ১৯১৪ তার পুরো বক্তব্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। তার বক্তব্যেরে গুরত্বপূর্ণ অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো-

> 'হাম্বার্গ থেকে আমি ইংল্যান্ড চলে আসি। সেখানে Samuel Montague & Co-তে দুই বছর কাজ করি। এরপর দুই মাসের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে শেয়ার অবলেখকের কাজ করি। শেখার চেষ্টা করি, কীভাবে শেয়ারবাজারকে পুরো দেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা যায় এবং তার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম সংযুক্ত করা যায়।
>
> এরপর যাই ফ্রান্সে। সেখানে একটি রাশিয়ান ব্যাংকের শাখায় কিছুদিন কাজ করি। কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সংযুক্ত করা যায়, তা শিখি।

এরপর হাম্বার্গে ফিরে স্থানীয় একটি ব্যাংকে কিছুদিন কাজ করি। পাশাপাশি ভারত, চীন ও জাপানের একাধিক ব্যাংক পরিদর্শন করি।

১৮৯৩ সালে প্রথমবারের মতো আমেরিকায় আসি। কিছুদিন থেকে হাম্বার্গে ফিরে যাই এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করি। ১৯০২ সালে পুনরায় আমেরিকায় আসি এবং Kuhn, Loeb & Co-এর শেয়ারহোল্ডার হই।

এই হলো আমার পুরো ব্যাংকিং শিক্ষাজীবনের ইতিহাস। ১৮৯৫ সালে Solomon Loeb-এর কন্যা Nina Loeb-কে বিয়ে করে তাদের সাথে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হই। এর মাধ্যমে আমি তাদের পরিবারিক প্রতিষ্ঠান Kuhn, Loeb & Co.-এর শেয়ারহোল্ডার হই।'

Mr. Loeb-এর অপর কন্যাকে বিয়ে করেন Jacob H. Schiff। এটা ইহুদিদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য যে, ব্যবসায় জোট মজবুত করতে তারা পারিবারিক সম্পর্ককে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এরপর Mr. Schiff তার কন্যা Frieda Schiff-কে বিয়ে দেন Felix Warburg-এর সাথে, যিনি Paul Warburg-এর আপন ভাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রাস্ট কোম্পানি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল– মানুষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ নিজেদের নিকট জমা রাখা এবং ওয়ারিশবিধি অনুযায়ী তা উত্তরাধিকারীদের নিকট বণ্টন করা। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোও মানুষকে ঋণ দেওয়ার কাজ শুরু করে। কিন্তু ১৯০৬ সালে ট্রাষ্ট কোম্পানিগুলো জনগণের আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলে। প্রচুর মানুষ জমাকৃত সম্পদ হারিয়ে পথে বসে। ঘটনা শুরু হয় যখন Knickerbocker Trust Co. তাদের 'রিজার্ভ' হারিয়ে ফেলে। এ থেকে পুরো আমেরিকায় শুরু হয় অর্থনৈতিক বিক্ষোভ।

এই বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মি. ওয়ারবার্গ Defects and Needs of Our Banking System শিরোনামে একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করেন। তিনি আর্টিক্যালটি আরও আগেই লিখেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেন ১৯০৭ সালে, যখন পুরো আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি জানতেন, ট্রাস্ট কোম্পানিগুলো খুব দ্রুত পথে বসবে। মূলত তারাই এই প্রতিষ্ঠানটির পতন ঘটিয়েছে, পুরো বিষয়টাই ছিল সাজানো নাটক!

তার আর্টিক্যালটি Senator Aldrich-এর চোখে পড়ে। তিনি তখন আমেরিকান সরকাররের অর্থ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পেশাদার জীবনে ছিলেন খুবই কর্মঠ। বিশ্বাস করতেন আমেরিকান জাতির উন্নয়নে। তবে তিনি ভাবতেন, এই উন্নয়ন কেবল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমেই করা সম্ভব। তার সাথে রকেফেলার পরিবারেরও বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। তার মেয়ে Abby Aldrich-কে সেই রকেফেলার পরিবারের সদস্য John D. Rockefeller এর সঙ্গে বিয়ে দেন।

১৯০৬ সালে অর্থনৈতিক সংকট চরমে পৌছালে– Nelson Aldrich-কে এর সমাধান খোঁজার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি পরামর্শের জন্য Mr. Warburg-এর স্মরণাপন্ন হন। উভয়ে একটি গুপ্ত আলোচনার আয়োজন করেন, যার জন্য জর্জিয়ার নিকটবর্তী নির্জন দ্বীপ জ্যাকল আইল্যান্ডকে (Jekyl Island) বাছাই করা হয়। দ্বীপটি ছিল সম্পদশালী ইহুদিদের অবসর সময় কাটানোর জায়গা। এই গুপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল, তা আজ অবধি জানা সম্ভব হয়নি। ১৯১৬ সালে Forbes Magazine-এর লেখক B.C. Forbes এই গুপ্ত আলোচনাটি নিয়ে একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করেন, যার অংশবিশেষ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

'কল্পনা করুন আমেরিকার প্রতাপশালী ব্যাংকারদের কথা, যারা বিশ্বস্ত কিছু সহকর্মীকে সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে করে নিউইয়র্ক থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে কোনো একটি স্থানে নেমে যায় এবং সেখান থেকে এক সপ্তাহের জন্য একটি রহস্যেঘেরা দ্বীপে গমন করে। প্রথমবার মিলিত হয়ে তারা কেবল একবারের জন্য নিজেদের পরিচয় বিনিময় করেছে। পাছে ভয় হয়, যদি সাথে থাকা চাকরগুলো সবার পরিচয় জেনে যায়!

সবাই শপথ করে, জ্যাকল আইল্যান্ডে তাদের মাঝে যে আলোচনা হবে, তার উচ্ছিষ্ট অংশটুকু পর্যন্ত সাধারণ মানুষ জানতে পারবে না। Nelson Aldrich-এর নির্দেশে সবাই আলাদা আলাদা গাড়িতে উঠে যায়। তাদের জন্য আগে থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল। গাড়িগুলো এমন একটি নির্জন প্লাটফর্মে রাখা হয়েছিল, যেন সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তারা সাউদার্ন কান্ট্রিতে হাজির হয়। অন্ধকার থাকাতে সেই দৃশ্য নিউইয়র্কের কোনো সাংবাদিকের চোখে পড়েনি।

গাড়ি থেকে বের হয়ে তারা ছোটো ছোটো কিছু নৌকায় উঠে পড়ে। তাদের আচরণ এমন ছিল, যেন নৌকার মাঝিরা পর্যন্ত বুঝতে না পারে– তারা আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিভাজন!

সঠিক সময়ে তারা জ্যাকল আইল্যান্ডে এসে পৌছায়। দ্বীপটি ছিল জনশূন্য, সেখানে অর্ধডজন চাকর-বাকর ছাড়া আর কেউ-ই ছিল না।

একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, কীভাবে চাকরদের কাছ হতে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব? একজন বলল– "চলুন, আমরা সবাই আমাদের নামের প্রথম শব্দটি দ্বারা একে অপরকে সম্বোধন করি।" সবাই এতে রাজি হলো।

ফলে আমেরিকার অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সৈনিকের নাম হয়ে যায় Nelson; আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার গুরু এবং Kuhn, Loeb & Co.-এর অন্যতম শেয়ার হোল্ডারের নাম হয়ে যায় Paul।

Nelson গোপনীয়তা রক্ষা করতে Harry, Frank, Paul ও Piatt-কে বলেন, যতদিন না তারা এমন একটি নকশা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে– যা দ্বারা পুরো আমেরিকাকে একত্রিত করা সম্ভব– ততদিন এই দ্বীপে অবস্থান করবে। তিনি এমন একটি অর্থ ব্যবস্থার কথা জানতে চান, যা শুধু আমেরিকায় নয়; পুরো ইউরোপে গ্রহণ যোগ্যতা পাবে।'

সাত দিনে এই আলোচনা অনেক দূর গড়ায়। তবে যেসব বিষয়ের ওপর আলোচনা ও চুক্তি হয়, তার কোনো কিছুই আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গুপ্ত আলোচনায় বিশেষ চারটি পরিবারের সদস্যগণ ছাড়া আরও যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন : Bernard Baruch, Eugene Meyer, Felix Frankfurter, Benjamin Strong, Julius Rosenwald, Henry Davison, Arthur Shelton ও Frank Vanderlip।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর E.R.A. Seligman নতুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ১৯১৯ সালে একটি কলাম প্রকাশ করেন। নিচে এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো–

'আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনে Mr. Warburg-এর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। শুরুতে যদিও তার পরিকল্পনা কিছুটা দৃষ্টিকটু ছিল, তারপরও সময়ের সাথে সাথে তা আমেরিকার অর্থনীতির মূল গঠনতন্ত্রে পরিণত হয়। খুব দ্রুত তা প্রতিটি প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এর দরুন দীর্ঘকালীন অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও বাণিজ্যিক জটিলতা থেকে আমেরিকার মানুষ মুক্তি পায়।

১৮৪০ সালে Mr. Samuel Jones কর্তৃক উপস্থাপিত Peel's Bank Act-এর কল্যাণে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড যেমন নোট ইস্যুর অনুমতি পায়, তেমনি Mr. Warburg কর্তৃক উপস্থাপিত Federal Reserve Act আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ইস্যুর অনুমতি প্রদান করে।

Senator Aldrich চেয়েছিলেন– ১২টি আঞ্চলিক শাখা অফিস নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত হবে এবং তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে, কিন্তু Warburg চেয়েছেন– ব্যাংকটি সম্পূর্ণ বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হবে। তিনি বলেন– "সরকারি বা রাজনৈতিক থাবার ভেতর থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কখনো প্রত্যাশিত ফলাফল উপহার দিতে পারে না। তাই এই ব্যাংক পরিচালনায় যে দক্ষ পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হবে, তা সরকারি আজ্ঞার বাহিরে থাকবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের বিনিময়ে ব্যাংক তার সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।" যেহেতু Aldrich-এর নিকট অপেক্ষাকৃত ভালো কোনো পরিকল্পনা ছিল না, তাই তিনি উপস্থাপিত দাবি দুটি মেনে নেন।

এটাই হয়তো শেষ প্রজন্ম, যারা বার্টার ট্রেডকে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে। এরপর এই সংস্কৃতি বাজার থেকে হারিয়ে যাবে। এর স্থলাভিষিক্ত হবে কাগজি নোটভিত্তিক বিনিময়ব্যবস্থা।' (pp. 387-390, Vol. 4, No. 4, Proceedings of the Academy of Political Science, Columbia University)

এটাই প্রথম ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়; ইউরোপে এমন আরও অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে, যেগুলো ইহুদিদের ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। এ নিয়ে Mr. Warburg একটি প্রবন্ধ লিখেন– *American and European Banking Methods and Bank Legislation Compared*। সেখানে উল্লেখ করেন–

> 'শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ইউরোপের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে রাষ্ট্র বা সরকারের কোনো শেয়ার নেই। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড তো পুরোটাই ব্যক্তি মালিকানাধীন। ফ্রান্স ও জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুটিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সামান্য অধিকার চর্চার সুযোগ পেলেও এর পুরো লভ্যাংশ বণ্টিত হয় ব্যক্তি মালিকদের মাঝেই।'

সেখানে তিনি বেশ কিছু ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে, তা Federal Reserve Act-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর দাবি তোলেন। বৈশিষ্ট্যগুলো পয়েন্ট আকারে দেখানো হলো–

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না।
- রাষ্ট্রীয় নোট ছাপানোর অধিকার কেবল তাদের হাতেই থাকবে।
- জাতীয় সম্পদ (স্বর্ণ-রৌপ্য) সংরক্ষণের অধিকার থাকবে।
- অর্থ বাজারের পরিচালনায় সরকার-প্রশাসন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করবে।

বলে রাখা ভালো, ১৮৩৩ হতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসে কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না। ১০ জুলাই, ১৮৩২ প্রেসিডেন্ট Andrew Jackson একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন–

> 'সাধারণ মানুষ যদি ব্যাংকিং ও অর্থ ব্যবস্থার কারচুপি সামান্য হলেও বুঝতে পারত, তাহলে পরদিন ভোরেই মহাবিপ্লবের জন্ম হতো। ব্যাংক নামক বিষধর সাপটি যতই বিষাক্ত হোক না কেন, মহান ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে আমি তার বিষদাঁত তুলে ছাড়ব। আমি জানি, তারা আমাকে দংশনের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে, কিন্তু আমিই তাদের দংশন করব।'

১০ সেপ্টেম্বার, ১৮৩৩ তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক অব আমেরিকাকে বন্ধ ঘোষণা করেন। ব্যাংকটির আরও একটি নাম ছিল 'ফার্স্ট ব্যাংক অব আমেরিকা'। এরপর দীর্ঘ ৮০ বছর আমেরিকায় কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না; তবে ইহুদিদের পরিকল্পনার অন্ত ছিল না।

আশা করি, Mr. Taft-এর কথা আপনাদের মনে আছে। তিনি শুধু রাশিয়ানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাই নয়; অবান্তর কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠারও অনুমোদন দেননি।

তাই পরবর্তী নির্বাচনকাল পর্যন্ত ইহুদিদের অপেক্ষা করতে হয়। ১৯১২ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেন Roosevelt, Taft ও Wilson। যেহেতু এক ঝুড়িতে তারা সব ডিম রাখে না, তাই সকল প্রার্থীর পেছনেই তারা বিনিয়োগ করে। Wilson সাহেবের পেছনে বিনিয়োগ করে Schiff; Taft সাহেবের পেছনে Felix Warburg; Roosevelt-এর পেছনে Mr. Kahn। সবশেষে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন Woodrow Wilson।

ক্ষমতায় এসে Wilson সরকার ইহুদিদের বিনিয়োগ ও প্রচারণা কাজের পুরস্কারস্বরূপ ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্টকে অনুমোদন করে এবং উত্থাপিত সকল শর্ত মঞ্জুর করে। ব্যাংকটি যেহেতু ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালত হবে, তাই এর প্রারম্ভিক রিজার্ভ যে শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগকৃত সম্পদেই গঠিত হবে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই রিজার্ভ কী দিয়ে তৈরি হবে? এ সম্পর্কে সিনেটের একটি আলোচনায় Pomerene ও Bristow যৌথভাবে Mr. Warburg-কে প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন : 'ফেডারেল ব্যাংকের রিজার্ভ কী দিয়ে তৈরি হবে?'

উত্তর : 'এই ব্যাংকের রিজার্ভ স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তৈরি হবে।'

কিন্তু যে স্বর্ণ-রৌপ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা তো ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাংকগুলোতে পড়ে আছে। সেখান থেকে সেগুলোকে জাহাজে করে আমেরিকায় নিয়ে আসতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন একটি যুদ্ধ। কয়েক মাস পর ১ আগস্ট, ১৯১৪। Senator Owen ঘোষণা করেন– 'আমরা একটি বড়ো ইউরোপিয়ান যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি'। বহিঃরাষ্ট্রের সম্পদ গ্রাসের নিমিত্তে এটা ছিল প্রথম যুদ্ধের ইঙ্গিত।

শুরুতে তিনি চেয়েছিলেন– ব্যাংকটির একটিমাত্র অফিস থাকবে এবং তা নিউইয়র্কে। প্রফেসর Seligman তাকে পরামর্শ দেন–

> 'নিউইয়র্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাধারণ জনগণ এমনিতেই ক্ষেপে আছে। তার ওপর এখানে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পায়, তবে তা রাজনৈতিক জনরোষে রূপ নিতে পারে। এমতাবস্থায় ব্যাংকটির শাখা বৃদ্ধি করা উচিত।'

তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাংকটিকে ২টি, ৪টি ও ৮টি করে মোট ১২টি শাখায় বৃদ্ধি করা হয়।

সিনেট সদস্যদের আলোচনায় তিনি বলেন– 'ব্যাংকটির এতগুলো শাখা থাকায় ব্যবস্থাপনা কাজ জটিল হয়ে পড়বে। তাই এর একটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদ থাকা উচিত, যা নিউইয়র্কে স্থাপিত হবে এবং সেখান থেকেই সকল শাখা পরিচালিত হবে।' Nelson Aldrich পুরো দেশকে একই অর্থ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার প্রস্তাব করেন, যেন সর্বত্র সুদের হার সমান হয়। কিন্তু Mr. Warbur বলেন– 'অবস্থান ও প্রয়োজনের আলোকে ব্যাংকের প্রতিটি শাখা পৃথক পৃথক সুদ-কাঠামো অনুসরণ করতে পারে।'

এ কারণে দেখা যায়– থিয়েটার, সিনেমা হল ও সংগীত বিপণি তৈরিতে প্রডিউসাররা স্বল্প সুদে ঋণ পেলেও কৃষক-রাখলদের উচ্চসুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। যেখানে সমাজের সংখ্যালঘু একটি দল অর্থের পাহাড় বানিয়েই যাচ্ছে, সেখানে জনসংখ্যার বৃহৎ একটি অংশ নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসছে। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখবেন, কেবল উৎপাদনমুখী খাতগুলোর ওপর উচ্চ সুদের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যেগুলো অনুৎপাদনশীল এবং নোংরা সংস্কৃতির জন্ম দেয়, সেগুলোতেই সুদের হার নগণ্য। কেন এই বৈষম্য? এই বৈষম্যের পেছনে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আশা করি, Protocol of the Learned Elder Zion-এর একটি ধারা আপনাদের মনে আছে,

> 'জ্যান্টাইলদের ভূমিশূন্য করতে হবে; নতুবা তাদের ওপর চির দারিদ্র্যতা চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ে ইহুদিদের পরিকল্পনা

'ইহুদিরা ব্যাংকিংশিল্পে খুবই দক্ষ। তাদের মতো আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং জোট গোটা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এই জোট এতটা ভয়ংকর যে, ইহুদিরা একদিন গোটা বিশ্ব অর্থনীতির লাগাম টেনে ধরবে।'-Aurther Brisbane

ইহুদিদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে তারা পুরো পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমানে তাদের পুরো ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দু জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত, তবে তা খুব দ্রুতই অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে।

যে স্বর্ণ (Gold) ইহুদিদের কাছে ঈশ্বরের সমতুল্য, যাকে তারা God of the living বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকে, আজ তারা সেই স্বর্ণ জাহাজে বোঝাই করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসছে। ইহুদিরা এটা ভেবে খুব ভীত যে, ইউরোপে হয়তো খুব দ্রুতই আরও একটি ভয়ংকর রক্তাক্ত যুদ্ধ সংগঠিত হবে। তাই সময় থাকতে ইহুদিরা অন্যত্র সরে পড়তে শুরু করেছে এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে আমেরিকাকে বেছে নিয়েছে।

প্রতিটি দেশেই ইহুদিদের একটি করে ব্যাংক থাকতেই হবে, এ ধরনের কোনো বাধ্যবোধকতা নেই। এর বিপরীতে ইহুদিরা এমন একটি প্রক্রিয়া তারা চালু করবে, যার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সেই প্রক্রিয়ার নাম হবে– 'World Banking Chain'।

যদি আপনি Warburg, Furstenbergs, Sonnenscheins, Sassoons, Samuels ও Belichroeders-এর মতো ইহুদিদের জীবন ইতিহাস ভালো করে অধ্যয়ন করেন,

তবে এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। যুদ্ধপূর্ববর্তী সময়ে অর্থ জালিয়াতি নিয়ে তাদের আধিপত্যের কোনো কমতি ছিল না। এ সকল কর্মকাণ্ড নিয়ে এই মস্তিষ্ক বিকৃত পাগলদের আবার গর্বেরও কোনো শেষ নেই। তারা বলে– 'আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিধি কতটা ব্যাপক, আশা করি তা আজ পুরো পৃথিবী উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হয়েছে, আমাদের বাদ দিয়ে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।'

Protocols of the Learned Elder Zion-এর ষষ্ঠ তম প্রটোকলে বলা আছে–

> 'খুব দ্রুতই আমরা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করব। সেখান থেকে তৈরি করব বিশাল সম্পদের আধার। জ্যান্টাইলদের প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মূল ভিত্তি হবে আমাদের অর্থ-সম্পদ। প্রতিটি রাষ্ট্র ও তার রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা ঋণের বেড়াজালে বেঁধে ফেলব। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো পতনের সাথে সাথে পুরো ঋণের বোঝা দেশের সাধারণ জনগণের কাঁধে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে নেমে আসবে এক ভয়ংকর অর্থনৈতিক বিপর্যয়।'

একই প্রটোকলের অপর একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

> 'একই সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে আমরা জ্যান্টাইলদের আগ্রহী করে তুলব। তবে সবকিছুর পেছনে থাকবে আমাদের ফটকা পরিকল্পনা, যেন তারা ইচ্ছেমতো উৎপাদন করতে না পারে। আমরা তাদের ঋণের পৃথক পৃথক খাত এবং ফসল উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবো। ফলে তারা চাইলেও অধিক উৎপাদন করতে পারবে না এবং ঋণের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না...। এভাবে একটা সময় তাদের ভূমিগুলো আমাদের মালিকানায় চলে আসবে।
>
> সমাজে ক্ষুধা-দরিদ্রতা ছড়িয়ে দিতে জ্যান্টাইলদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল জীবনব্যবস্থায় উৎসাহী করে তুলব, যা তাদের মস্তিষ্ক থেকে বুদ্ধিবৃত্তি নামক বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মুছে দেবে।
>
> আমরা শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন-মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে উৎসাহিত করব, কিন্তু এতে শ্রমিকদের ন্যূনতম কোনো উপকার হবে না। কারণ, একই সময়ে আমরা বাজারে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেবো এবং বলব– এ বছর ফসল কম উৎপাদন হয়েছে। আমরা উৎপাদনমুখী কৃষকদের দক্ষতা ধ্বংস করার জন্য তাদের অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন শিল্প কার্যক্রমের প্রতি উৎসাহিত করব এবং অ্যালকোহলের প্রতি নেশাগ্রস্ত করে রাখব।'

২০ নম্বর প্রটোকলে বলা হয়েছে–

'আজ তোমাদের এমন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা বলতে যাচ্ছি, যা প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর এটাই আমরা জ্যান্টাইলদের ওপর চাপিয়ে দেবো। তোমরা সবাই জানো, স্বর্ণ-রৌপ্যই পৃথিবীর প্রকৃত অর্থ, যা হাজার হাজার বছর পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যখনই কেউ এই অর্থব্যবস্থার বাইরে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করেছে, ধীরে ধীরে তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাজার হতে স্বর্ণ-রৌপ্য সরিয়ে দিয়ে মানুষের হাতে নকল অর্থ ধরিয়ে দেবো।'

'প্রতিটি ঋণ একজন সরকারের অদক্ষতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে, যা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এমতাবস্থায় সরকার জাতীয় দায় থেকে বেরিয়ে আসতে জনগণের ওপর একের পর এক করের বোঝা চাপিয়ে দিতে শুরু করবে। বৈদেশিক ঋণ হলো রক্তচোষা জোঁকের মতো। এটা একবার যদি কোনো রাষ্ট্রের ওপর আঁকড়ে বসে, তবে সমস্ত রক্ত খেয়ে তবেই ছাড়বে। তারপরও জ্যান্টাইল রাষ্ট্রগুলো বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করবে এবং একে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় বলে বিবেচনা করবে।'

২০ নম্বর প্রটোকলে আরও বলা আছে–

'বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের পরবর্তী প্রভাব কী? বন্ডের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর তা সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হবে। যদি পাঁচ শতাংশ সুদের বিনিময়ে কোনো রাষ্ট্র ঋণ নেয়, তবে বিশ বছরে সুদের পরিমাণ হবে আসল অর্থের সমান; চল্লিশ বছরে হবে আসল অঙ্কের দ্বিগুণ, আর ষাট বছরে হবে তিনগুণ! ফলে ক্রমবর্ধমান সুদের দায় থেকে কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

আফসোসের বিষয় হলো– অধিকাংশ মানুষ এই নিগূঢ় সত্যগুলো একেবারেই জানে না। প্রতিবছর এত এত কর পরিশোধের পরও জাতীয় দায় থেকে আমরা মুক্তি পাই না। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ডলার ছাপানো হয়েছে, তার সব যদি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তারপরও পুরো পৃথিবীর দায় মেটানো সম্ভব নয়।

Protocols of the Learned Elder Zion মূলত রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যকে উপড়ে ফেলার জন্য তৈরি করা হয়। কিন্তু তাদের এই নীলনকশা কেবল রাশিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি; ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পৃথিবীতে। করব্যবস্থাকে (Tax) কেন্দ্র করে ইহুদিদের যে পরিকল্পনা, তা সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১. 'শাসকশ্রেণিতে পরিণত হওয়ার পর আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে সাধারণ জনগণের ওপর আমরা করের বোঝা চাপিয়ে দেবো। এতে সীমিত আয়ের মানুষ প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তুলতে পারবে না। আর এই কাজটা আমাদের করতে হবে না; বরং প্রতিটি দেশের সরকারই নিজ দায়িত্বে এই কাজ করে দেবে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক খরচ বহনের নামে তারা নিয়মিত জনগণের থেকে কর আদায় করবে, যার দরুন সাধারণ মানুষ চিরকাল গরিব থেকে যাবে।

২. বিভিন্ন উপায়ে কর আরোপ করা যেতে পারে। যেমন :

ক. Progressive Tax : এ প্রক্রিয়ায় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

খ. পৈতৃক সম্পদের ওপর কর : পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পদ ব্যবহার করে কেউ যদি উপার্জন করে, তবে তার ওপর কর আরোপ করা হবে। যেমন : মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে বাড়ির মালিকগণ বাসা ভাড়ার ওপর কর প্রদান করবে।

গ. মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরের ওপর কর : সম্পদ হস্তান্তরের সময় খরচ (Fee) প্রদান করতে হবে।

ঘ. Luxury Tax : সৌখিন পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের সময় শুল্ক প্রদান করতে হবে। যেমন : গাড়ি, বিমান, জাহাজ ইত্যাদি।'

আপনাদের প্রশ্ন জাগতে পারে, এত সব তথ্য আমরা কেন জানি না? কেন আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থব্যবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সব বিষয় শেখানো হচ্ছে? এ প্রসঙ্গে Elder Zion-এর ৮ নম্বর প্রটোকল দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি–

> 'আমরা বিশ্বজুড়ে একগাদা অর্থনীতিবিদের জন্ম দেবো, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকার প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবে। অর্থবিজ্ঞান আমাদের প্রধানতম অস্ত্র।'

আদর্শ অর্থের বৈশিষ্ট্য

মানুষ আমৃত্যু যে জিনিসটির পেছনে অধিকাংশ সময় ব্যয় করে তা হলো– অর্থ। অর্থ থেকে জন্ম নেয় অর্থনীতি। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, অর্থের সংজ্ঞা কী? দেখা যাবে অনেকে এর সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। ডলার, টাকা, রুপি, রিয়াল ইত্যাদি বহুকাল আমাদের চোখে অর্থ বলে পরিচিত হয়ে আসছে; যদিও এগুলো হলো 'কারেন্সি', যা তৈরি হয় বাতাস থেকে।

আমাদের অবচেতন মন 'অর্থ ও কারেন্সি' বিষয় দুটি এক করে ফেলেছে, কিন্তু তা এক নয়। এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, যা দ্বারা বিষয় দুটির মাঝে পার্থক্য গড়ে তোলা সম্ভব। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে তিন ধরনের উপকরণ পাওয়া যাবে, যেগুলো বিভিন্ন যুগে অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা : স্বর্ণ-রৌপ্য, কাগজি নোট এবং ভোগ্য পণ্য।

হেনরি ফোর্ডের মূল বইয়ে এই অধ্যায়টি ছিল না। পূর্বের দুটি অধ্যায়ের উপস্থাপিত বিষয়গুলো আরও পরিষ্কার করার স্বার্থে এই অধ্যায়টি সংযোজন করা হয়েছে। সম্প্রতি অর্থ ব্যবস্থার ওপর Michael Maloney-এর লেখা *Gold & Silver* বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ইতোমধ্যে তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অতিরিক্ত অংশটুকু এই জনপ্রিয় বইয়ের সারাংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

তিনি বইটিতে আদর্শ অর্থের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন :

১. গ্রহণযোগ্য বিনিময়মাধ্যম : বিনিময় মাধ্যম বলতে একটি তৃতীয় মাধ্যমকে বোঝানো হয়, যা দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতারা তাদের লেনদেন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারে। একসময় মানুষ বার্টার ট্রেড পদ্ধতিতে পণ্যের বিপরীতে পণ্য বিনিময় করত, যেমন : দুধের বিপরীতে ডিম, আটার বিপরীতে চাল ইত্যাদি। সেখানে তৃতীয় কোনো মাধ্যম ছিল না। এরপর এক যুগ আসে যখন মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান ধাতব পদার্থকে তৃতীয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা ব্যবহার করছি কাগজি নোট ও মুদ্রা। এভাবে গড়ে উঠে গ্রহণযোগ্য বিনিময় মাধ্যম এবং অবসান ঘটে বার্টার ট্রেড পদ্ধতির।

২. মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা : বার্টার ট্রেডের একটি বড়ো সমস্যা হলো মূল্য নির্ধারণে অপারগতা। এ কারণে সে যুগের বাণিজ্য একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর আসে স্বর্ণ-রৌপ্য ভিত্তিক বিনিময় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় স্বর্ণ-রৌপ্যকে ওজনের মানদণ্ডে হিসাব করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হতো। তবে প্রতিবারের লেনদেনে স্বর্ণ-রৌপ্য ওজন করা ছিল এক বিরক্তিকর বিষয়। তাই খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে লিডিয়ার রাজা আলিয়াত (Alyatte) প্রথমবারের মতো ধাতব কয়েন (Coin) তৈরি করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং আরও কিছু ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি হতো সে মুদ্রা। বলা হয় এ মুদ্রাই ছিল ইতিহাসে প্রথম জন্ম নেওয়া অর্থ (Money)। বর্তমানে আমরা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাগজি নোট ব্যবহার করছি। এগুলো দিয়েও পণ্যের মূল্য সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব।

৩. হিসাবের একক : হিসাবের একক দ্বারা পরিমাপককে বোঝানো হয়। যেমন : দূরত্ব পরিমাপের একক মিটার, কিলোমিটার, ইঞ্চি বা মাইল। ওজন পরিমাপের একক আউন্স, গ্রাম বা কিলোগ্রাম। পৃথিবীর সর্বত্র এই পরিমাপকগুলো সর্বজনীন স্বীকৃত। কিন্তু টাকা, ডলার, রুপির ক্ষেত্রে সর্বজনীন স্বীকৃত কোনো পরিমাপক নেই। যেমন : এক টাকা বা এক রুপি কখনো এক ডলারের সমান হতে পারে না। কারণ, এগুলোর মূল্য সর্বদা পরিবর্তনশীল। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য পরিমাপে এ জাতীয় কোনো সমস্যা হয় না।

কারণ, ১০০ গ্রাম স্বর্ণ বা রৌপ্যের ওজন পৃথিবীর সর্বত্রই সমান। ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমন। যেমন : এক কেজি আটার ওজন পৃথিবীর সব স্থানে একই হবে। এ ক্ষেত্রে ভোগ্য পণ্যকেও অর্থের সংজ্ঞা নির্ধারণে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪. **বিভাজনযোগ্য (খুচরা যোগ্যতা) :** ১,০০০ টাকার একটি নোটকে ৫০০, ৩০০, ২৫০, ৫০ ইত্যাদি আকারে খুচরা করা সম্ভব। একইভাবে এক কেজি স্বর্ণ বা রৌপ্যকে ৫০০, ১০০, ৫০ বা ২০ গ্রামে বিভক্ত করা সম্ভব। ভোগ্য পণ্যের বেলাও ওজন দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। বিভাজনযোগ্যতার বড়ো সুবিধা হলো, এর মাধ্যমে পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব। এটি লেনদেন ও বিনিময় কাজে দারুণ গতীশীলতা নিয়ে আসে।

৫. **মূল্যের স্থিতীশীলতা :** এটি দ্বারা বোঝানো হয় অর্থের ক্রয় ক্ষমতা সহজে পরিবর্তিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ : আপনি ৪০ হাজার টাকা দিয়ে আজ যে পরিমাণ চাল ক্রয় করতে পারছেন, আগামী ১০ বছর পর সে পরিমাণ চাল আর ক্রয় করতে পারবেন না। কারণ, নিয়মিত মুদ্রাস্ফিতির দরুন বাজারের প্রতিটি মুদ্রা হারাচ্ছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর প্রতিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর এবং বিশেষ সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে বড়ো পরিমাণে নতুন নোট ইস্যু করে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় *Quantitative Easing (QE)*। এটি বাজারে নতুন মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করে চলমান মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পণ্যমূল্য স্থীতিশীল বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অপরদিকে, স্বর্ণ-রৌপ্য যেহেতু চাইলেই উৎপাদন করা যায় না, সেহেতু এ বাজারে স্বর্ণস্ফিতি বা রৌপ্যস্ফিতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া বিভিন্ন খনি থেকে প্রতি বছর নতুন যে পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্থবাজারে যুক্ত হয়, তার পরিমাণে এতটাই নগণ্য যে তা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড়ো রকমের কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। বলে রাখা উচিত বর্তমান বাজারে স্বণ-রৌপ্য মূল্যের প্রতিনিয়ত যে উঠানামা, এর মূল কারণ তাদের কাগজি নোটের বিপরীতে মূল্যায়িত করা হচ্ছে। যেহেতু কাগজি নোটগুলো প্রতিনিয়ত তাদের ক্রয় ক্ষমতা হারাচ্ছে, সেহেতু ভোগ্যপণ্যের ন্যায় স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্যও উঠানামা করছে।

পচনশীল বৈশিষ্ট্যের দরুণ অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যকে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তবে কিছু পণ্য আছে যাদের তুলনামূলক বেশি দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। যেমন : লবণ, চিনি, মধু ইত্যাদি। এ কারণে রোমান ও গ্রিক সম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীতে প্রতি মাসের বেতনের সাথে কিছু পরিমাণ ভোগ্যপণ্যও প্রদান করা হতো, যা রেশন নামে পারিচিত; বিষয়টি আজও অনেক রাষ্ট্রে চলমান ।

৬. স্থিতিশীল বিনিময় হার : বিনিময় হারের উঠানামা মুদ্রা বাজারের একটি নিয়মিত চিত্র। বিনিময় হারের এই উঠানামা কতটা হুমকিস্বরূপ, তা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুব ভালো করে জানে। ১৯৭১ সালে ব্রিটন উড্স চুক্তিনামা রহিত হলে বিনিময় হার নির্ধারণের স্থিতিশীল প্রক্রিয়া একেবারে ভেঙে পরে। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্যভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় এমনটা ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। লিডিয়ার পর গ্রিক, রোমান, জেরুজালেমসহ আরও অনেক অঞ্চলে ধাতব মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। সে সকল মুদ্রায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকত বলে তাদের বিনিময় নির্ধারণে কোনো জটিলতা হতো না। যেমন ধরুন, গ্রিকরা তাদের ধাতব মুদ্রায় ব্যবহার করছে ৫০% স্বর্ণ এবং রোমানরা সেখানে ব্যবহার করছে ৭৫% স্বর্ণ। এমতাবস্থায় ৩টি গ্রিক মুদ্রার সমান হবে ২টি রোমান মুদ্রা। বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা ছিল বলে আজকের মতো অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা না থাকলেও সে যুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্বময় পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল।

৭. নিজস্ব উপযোগ : যেকোন ভোগ্য পণ্যের প্রধান উপযোগ হলো ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা। এমন নয় যে এই উপযোগিতা কৃত্রিম বা সরকারি অধ্যাদেশে তৈরি হয়েছে। কিন্তু কাগজি নোটভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় প্রতিটি মুদ্রার উপযোগ সরকারি অধ্যাদেশে তৈরি হয়। যতদিন এগুলো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে, ততদিন কাগজি নোটগুলোর জীবন থাকবে।

মনে করুন, আপনার একাউন্টে পাঁচ লাখ রুপি আছে। কিছুদিন পর চীন এসে ভারত দখল করল এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রুপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। যদি না নতুন সরকার পুরাতন রুপিগুলোকে নতুন ইস্যু করা মুদ্রার সাথে পালটে নেওয়ার সুযোগ দেয়, তবে সে রুপির আর কোনো মূল্য থাকবে না। যেমন : সাদ্দাম সরকার পতনের সেখানে নতুন দিনারের নোট প্রিন্ট করা শুরু হয়। ফলে পূর্বের বিপুল পরিমাণ ইরাকি দিনারের আর কোনো মূল্য ছিল না। সাধারণ মানুষ কিছু পরিমাণ পুরোনো নোট ব্যাংকে গিয়ে পালটে আনার সুযোগ পেলেও বড়ো একটি অংশ রাস্তায় ফেলে দেয়। আরেকটি উদাহরণ হলো, মোদি সরকার যখন ৫০০ ও ১০০০ রুপির নোট মাসখানেকের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করে, তখন নোট দুটিও সাময়িক সময়ের জন্যে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কেউ আধিপত্য বিস্তার করুক বা সরকারি অধ্যাদেশে যে পরিবর্তনই আসুক না কেন, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং ভোগ্যপণ্যের উপযোগিতায় কোনো পরিবর্তন আসবে না।

৮. সহজ পরিবহনযোগ্যতা : কাগজি নোট বা স্বর্ণ-রৌপ্যকে আপনি চাইলে এক স্থান থেকে অন্যত্র বহন করতে পারেন। যেহেতু স্বর্ণ-রৌপ্য কাগজি নোটের চেয়ে অধিক মূল্য ধরে রাখতে পারে, সেহেতু স্বর্ণ-রৌপ্যই বেশি কার্যকর। তবে ইলেক্ট্রনিক কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে আজ অনেকেই কাগজি নোট পরিবহনের ঝামেলা কাটিয়ে উঠেছে। এ পদ্ধতি স্বর্ণ-রৌপ্যভিত্তিক অর্থব্যবস্থায়ও প্রয়োগ করা সম্ভব।

এই হলো আদর্শ অর্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এখানে অর্থ হিসেবে তিনটি উপকরণকে বিবেচনায় আনা হয়েছে : স্বর্ণ-রৌপ্য, কাগজি নোট ও ভোগ্যপণ্য । লক্ষ করুন, এমন কোনো উপকরণটি আছে, যার মধ্যে আদর্শ অর্থের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? অবশ্যই তা স্বর্ণ-রৌপ্য। ঠিক এ কারণে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্রাজ্যে এটিই ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিনিময়ের মাধ্যম। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনালগ্নেও স্বর্ণ-রৌপ্যকে কাগজি নোট ছাপানোর মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের আধিপত্য বিস্তারের গল্প

মাত্র ১০০ বছর আগেও পৃথিবীর বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল স্বর্ণ-রৌপ্য ভিত্তিক বিনিময় ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন। যেমন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সম্রাজ্যের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করত। তা ছাড়া ১৮৮০-১৯১৪ এবং ১৯৪৬-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ স্বর্ণ-রৌপ্যকে বাণিজ্যিক কাজে অর্থের মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করত। অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে পরিমাণ ধাতব মুদ্রা বা কাগজি নোট ছাপাক না কেন, তার বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য মজুত করত এবং তা দ্বারা আন্তর্জাতিক বিনিময় হার নির্ধারণ করত। যেমন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকা যথাক্রমে প্রতি ৪.২৫ পাউন্ড এবং ২০.৬৭ ডলার ইস্যুর বিপরীতে মজুত রাখত ১ আউন্স পরিমাণ স্বর্ণ। ফলে ১ পাউন্ড সমপরিমাণ ছিল ৪.৮৬ ডলার। এই পুরো সময়টিকে বল হতো ক্লাসিকাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের (Classical Gold Standard) যুগ। এ সময় মুদ্রাস্ফিতির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য।

প্রকৃতির প্রতিটি গঠন উপাদানের যেমন নিজস্ব একটি চক্র রয়েছে, অর্থ ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই চক্রের মূল নিয়ামক হলো স্বর্ণ-রৌপ্য। শুনে বিস্মিত হবেন, বর্তমান কাগজি নোটভিত্তিক অর্থব্যবস্থা তার জীবনের শেষ যুগে এসে পৌঁছেছে। খুব দ্রুত শুরু হতে যাচ্ছে ইলেক্ট্রনিক কারেন্সির যুগ। এই চক্র শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসবে স্বর্ণ-রৌপ্যের যুগ।

কিছু বিষয় ছোটোকাল থেকে আমাদের মনে গেথে আছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে কাজ করে, তাই এটি সরকারি ব্যাংক। এই ব্যাংক নিজ ইচ্ছায় নোট ছাপাতে পারে না। এ জন্য তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য মজুদ করতে হয় এবং বিশ্বব্যাংক থেকে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু আগের দুটি অধ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে, পৃথিবীতে বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে, যা ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে সরকার বা সাধারণ মানুষের অধিকার চর্চার কোনো সুযোগ নেই।

২৩ ডিসেম্বার ১৯১৩, প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের মন্ত্রিসভা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমকে (সংক্ষেপে ফেড) আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে অনুমোদন দেয়।

সেই সঙ্গে ব্যাংকটিকে ডলার ছাপানো এবং আমেরিকার অর্থনীতি পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকারও প্রদান করা হয়। কিছুদিন পর সরকারি অধ্যাদেশে ডলার ব্যতীত অন্য সব বিনিময়মাধ্যম নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু নতুন এই কারেন্সির ওপর আমেরিকার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিল না। কারণ, মাত্র কয়েক বছর আগে ট্রাস্ট কোম্পানি কেলেঙ্কারির দরুন হাজারো মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছিল। ফলে শুরু থেকেই সবাই ডলারকে এড়িয়ে চলতে লাগল এবং স্বর্ণ-রৌপ্যকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে অধিক প্রাধান্য দিতে থাকল।

বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে, ফেড ডলারের মূল্য ঘোষণা করে- ১ আউন্স স্বর্ণ = ২০ ডলার। অর্থাৎ প্রতি ১ আউন্স স্বর্ণের বিপরীতে ফেড ২০ ডলার ইস্যু করবে। সাধারণ মানুষকে আহ্বান করা হয়, তারা যেন নিজেদের স্বর্ণগুলো ফেডের নিকট জমা রেখে সমপরিমাণ ডলার নিয়ে আসে।

ফেড মানুষকে বুঝায়, প্রতিটি ডলার হলো এক-একটি চেক নোট। মানুষ যদি ২০ ডলারের প্রতিটি নোট পুনরায় ফেডকে জমা দেয়, তবে সে তার জমাকৃত সম্পদ ফেরত পাবে। JM 043829043-এ ধরনের যে সংখ্যাটি নোটগুলোর ওপর ছাপানো থাকে, তা দ্বারা বোঝায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই হিসাবটিতে ইস্যুকৃত নোটটির বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ (স্বর্ণ/রৌপ্য) মজুদ করা আছে। চেক নোট (ডলার) ফেরত আসা মাত্রই ব্যাংক গ্রাহককে সে পরিমাণ সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক নোটের দরুন ইতঃপূর্বে আন্তঃপ্রাদেশিক লেনদেনগুলোতে যে জটিলতা তৈরি হতো, তা এখন ডলার ব্যবহারের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব হবে। কারণ, এখন থেকে পুরো দেশে একটিমাত্র কারেন্সি ব্যবহৃত হবে। কিন্তু ফেড তার কথা রাখেনি। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ডলারের বিপরীতে সাধারণ মানুষের যে সম্পদগুলো সে আত্মসাৎ করেছে, তা আর কখনো ফিরিয়ে দেয়নি।

ইতিহাসের অন্যতম এক গোপন আলোচনার মধ্য দিয়ে ফেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯১০ সালে জর্জিয়ার উপকূলবর্তী জ্যাকল দ্বীপে এই আলোচনার আয়োজন করা হয়। তবে সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল এবং উপস্থিত সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কী কী চুক্তি করেছিল, তার কোনো তথ্যই আজ পর্যন্ত জনসম্মুখে প্রকাশ পায়নি। *The Federal Reserve System: Its Origin and Growth* বইয়ের লেখক Paul Warbug হলেন সেই গোপন সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের একজন। তিনি বইটিতে উল্লেখ করেন-

'আমাদের প্রত্যেক সদস্য এতটাই প্রতিজ্ঞাবধ্য যে, আজ পর্যন্ত সে আলোচনার চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ তথ্যও জনসম্মুখে প্রকাশ পায়নি।' তবে ব্যাংকটির পরবর্তী কার্যক্রম দেখে সাধারণ মানুষ অনুমান করে নিয়েছে, গোপন আলোচনায় নির্ধারিত হয়েছে ব্যাংকটির শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা, গঠনতন্ত্র ও লভ্যাংশ বন্টন প্রক্রিয়া।

কী পরিমাণ স্বর্ণের মজুদ নিয়ে ফেড তার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করে, সে তথ্য জানা সম্ভব না হলেও কিছু কাল্পনিক তথ্যকে পুঁজি করে এগোনো যাক। ধরে যাক, গোপন আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেডের শেয়ারহোল্ডারগণ সে সময় ২ হাজার টন স্বর্ণ মজুত করল এবং এর বিপরীতে ১০ বিলিয়ন ডলার প্রিন্ট করল। এখন তা বাজারে সরবরাহ হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

১৯১৪ সালের জানুয়ারিতে প্রশাসনিক ও বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি খরচ মেটাতে প্রেসিডেন্ট উইলসন প্রশাসনের ১০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু তার রাজস্ব ভান্ডারে এত পরিমাণ অর্থ ছিল না। ফলে তিনি ফেডের নিকট এই পরিমাণ ডলারের জন্য আবেদন করলেন। ফেড ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় প্রেসিডেন্ট প্রশাসনকে ১০ বিলিয়ন ডলার ঋণ হিসেবে প্রদান করল।

ধরুন, তারা প্রেসিডেন্ট প্রশাসনকে ২% সুদে ১০ বছর মেয়াদে ১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ দিলো। তাহলে ১০ বছর পর সুদে-আসলে কী পরিমাণ ডলার পরিশোধ করতে হবে? কম করে হলেও ১২ বিলিয়ন ডলার! সমস্যা হলো তিনি এত ডলার পাবেন কোথায়? বাজারে তো মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলারের অস্তিত্ব আছে। সুদের দরুন যে অতিরিক্ত দায়ের জন্ম হয়েছে, তার বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিজেরও কোনো প্রিন্টার নেই। সুতরাং, তিনি সর্বোচ্চ ১০ বিলিয়ন ডলারই পরিশোধ করতে পারবেন। বাকিগুলো পরিশোধ করতে পারবেন না। কারণ, পকেটে ৫০ ডলার থাকলে ৫১ ডলার সমমূল্যের পণ্য ক্রয় করা সম্ভব নয়।

সুদের কাছে এখানে সবাই আটকে যায়। কারণ, সুদ থেকে যে অদৃশ্য দায়ের জন্ম হয়, তা সামষ্টিক উপায়ে কখনো পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এরপর শুরু হলো যুদ্ধ। প্রেসিডেন্ট সাহেবের খরচ বেড়ে গেল কয়েকগুণে। তিনি আবারও ঋণ নিলেন এবং নিতেই থাকলেন। একই সঙ্গে আমেরিকায় আরও অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক গড়ে উঠল। তারাও ফেড থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল তৈরি করল। তাদের কাছ থেকে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা ঋণ নিল। চারদিক ঋণে ঋণে সয়লাব হয়ে উঠল। প্রতিটি ঋণের ওপর সুদ চেপে বসল। এই সুদ থেকে তৈরি হলো জাতীয় দায়, যার পরিমাণ দিনে দিনে বাড়তেই থাকল। আদৌ কি এই জাতীয় দায় থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব?

ফেডের দিকে তাকানো যাক। ১৯১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বার ফেডের নিকট ২ হাজার টন স্বর্ণ ছিল। এর বিপরীতে জানুয়ারি মাসে তারা ১০ বিলিয়ন ডলার প্রিন্ট করে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে ঋণ দেয়। প্রথম ঋণের পর প্রেসিডেন্ট সাহেব যখন পুনরায় ঋণের আবেদন করলেন, তখন ফেডের সিন্দুক ফাঁকা! অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আবারও ডলার প্রিন্ট করল এবং তা প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট পৌঁছে দিলো। এই যে দ্বিতীয়বার ডলার প্রিন্ট করল, তার বিপরীতে কি সমপরিমাণ স্বর্ণ মজুত করেছে? তা ছাড়া প্রতিটি ঋণের ওপর যে সুদ চাপিয়ে দিচ্ছে, তারও বিপরীতে কি স্বর্ণ মজুত করছে?

আবার লক্ষ করুন, সাধারণ মানুষ সরকারের হুকুম মানতে নিজেদের স্বর্ণগুলো ফেডের নিকট জমা দিচ্ছে, আর ফেড প্রিন্টিং মেশিনে ডলার ছাপিয়ে তা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে। তারা ডলার তৈরি করছে বাতাস থেকে, আবার তার ওপর সুদ চাপিয়ে ঋণ দিচ্ছে! যখন কেউ সুদ-সমেত ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না, তখন তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে। এভাবে বিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেয় আধুনিক মহাজন বৃত্তি।

১৯৩৩ সালে ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রীয় ঘোষণা জাড়ি করে, সবাই যেন এ বছরের মধ্যে তাদের সকল স্বর্ণ ফেডের নিকট জমা রেখে সমপরিমাণ ডলার সংগ্রহ করে; নতুবা তাদের সম্পদ জব্দ করা হবে। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ ফেডের কাছে স্বর্ণ জমা রাখতে বাধ্য হয় এবং এর বিনিময়ে সমপরিমাণ ডলার নিয়ে আসে।

৩১ জানুয়ারি ১৯৩৪, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছ হতে নতুন ঘোষণা আসে। এখন থেকে ১ আউন্স স্বর্ণ সমান ৩৫ ডলার। অর্থাৎ ডলারের মূল্য রাতারাতি ৪০% হ্রাস পেল! কেনই-বা এমনটা হলো! ১৯১৩ সালের পর থেকে ফেড নতুন স্বর্ণ মজুত না করে প্রচুর নোট ইস্যু করেছে। এই মূল্যহীন নোটগুলোকে বলা হয় 'Fiat Money'। তাই নতুন ইস্যুকৃত নোটের সাথে রিজার্ভে থাকা স্বর্ণগুলো পুনর্মূল্যায়ন করতে ডলারের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে এবং স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঠিক এ কারণে মুদ্রাস্ফীতি বাজারের একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাজারে এর সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, তখনই মুদ্রাস্ফিতি ঘটে। এর নেতিবাচক প্রভাবগুলোর সাথে কমবেশি আমরা সবাই পরিচিত। যেমন : দ্রব্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়া, সঞ্চয় হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত নতুন নতুন নোট ইস্যু করা এবং বাজারে এর সরবরাহ বৃদ্ধি করা মুদ্রাস্ফীতির প্রধানতম কারণ।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র ছয় মাস আগে আয়োজন করা হয় Bretton Woods সম্মেলন। বলার অপেক্ষা রাখে না ইহুদিরা ছিল এই সম্মেলনের মধ্যমণি। এতদিন পর্যন্ত ডলার ছিল কেবল আমেরিকার কারেন্সি। এই সম্মেলনে তারা প্রস্তাব করে, ডলার হবে পুরো পৃথিবীর একমাত্র বিনিময়যোগ্য কারেন্সি। বেশিরভাগ রাষ্ট্র এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সবার এক কথা : ফেড তো চাইলেই ইচ্ছে মতো ডলার প্রিন্ট করতে পারে, সেখানে মনিটরিং-এর কোনো সুযোগ নেই।

বিতর্ক চলতে থাকল। ইহুদি প্রতিনিধিরা বলল, প্রতিটি দেশের পৃথক পৃথক কারেন্সি থাকার দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থবির হয়ে আছে। সবাই যদি একই কারেন্সি ব্যবহারে সম্মত হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গতীশীল হয়ে উঠবে। তা ছাড়া যুদ্ধের আঘাত পুরো ইউরোপকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এমতাবস্থায় ঘুরে দাঁড়াতে যে সম্পদ প্রয়োজন, তা তাদের নেই।

হিটলারের সাবমেরিনের আঘাতে ইউরোপীয় অনেক স্বর্ণবাহী জাহাজ মেডিটেরিয়ান ও আটলান্টিকে হারিয়ে গেছে। সবাই এখন অর্থ সংকটে। এমতাবস্থায় ডলার হতে পারে সকল সমস্যার সমাধান। ফেড ডলার প্রিন্ট করে ঠিক, তবে নতুন কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি করা হবে, যেখানে সকল দেশের অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের মান হবে ১ আউন্স স্বর্ণ = ৩৫ ডলার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধিকাংশ রাষ্ট্র এই প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয় ।

আলোচনায় বলা হয়, যেহেতু এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলোর নিকট প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডলার নেই, তাই উচিত হবে রাষ্ট্রীয় রিজার্ভে থাকা নিজেদের স্বর্ণগুলো ফেডের নিকট জমা রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডলার নিয়ে যায়। আর যাদের স্বর্ণ নেই, তারা বন্ড জমা রেখে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ নিতে পারবে। প্রতিটি রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ লেনদেনে নিজস্ব কারেন্সি ব্যবহার করতে পারবে। তবে অবশ্যই স্বর্ণ-রৌপ্য বা ডলারে পরিমাপযোগ্য মূল্য থাকতে হবে। অর্থাৎ কোন দেশ চাইলে স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে ডলারকে রিজার্ভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রতিটি দেশের বিনিময় হার নিরূপণ এবং মনিটরিং-এর দায়িত্বে থাকবে আই.এম.এফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।

যদি কোনো দেশ ডলারগুলো ফেডের নিকট ফিরিয়ে দেয়, তবে প্রতি ৩৫ ডলার অনুপাতে সমপরিমাণ স্বর্ণ ফেরত দেওয়া হবে। এরপর থেকে অনেক রাষ্ট্র তাদের রিজার্ভে থাকা স্বর্ণগুলোর একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডের নিকট জমা রেখে ডলার নিতে শুরু করে। ব্রেটন উডস সম্মেলনের পর ১৯৪৫ সালে ফেডের রিজার্ভে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ১৭৮৪৮ মেট্রিক টন। ১৯৫০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২০২৭৯ মেট্রেক টন। কিন্তু আমেরিকানদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা এই যে শুরু হলো, আর থামল না।

এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় নিমজ্জিত থাকার দরুন তাদের ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। নতুন-নতুন অস্ত্র নির্মাণ, সৈনিকদের বেতন প্রদান, বিভিন্ন রসদ আমদানি ইত্যাদি নানা কাজেও তাদের প্রচুর ডলার অন্যান্য দেশগুলোতে চলে যেতে শুরু করে। ফলে সে সকল ডলারের বিপরীতে যখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো স্বর্ণ দাবি করে বসছিল, তখন আমেরিকা হারাতে শুরু করে তাদের স্বর্ণের মজুদ। কারণ, নতুন ডলার প্রিন্ট করলেও ১ আউন্স স্বর্ণ = ৩৫ ডলার হারে তখনও কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

৬০'র দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পরা আমেরিকার জন্যে ছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বড়ো কারণ। তারা ভাবতেও পারেনি এই যুদ্ধ এতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাদের ঘাটতি বাজেট বাড়তে শুরু করলে নতুন ডলার প্রিন্ট প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ১৯৬৩ সালে জন এফ কেনেডি নিহত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পদে আসেন লিন্ডন বি. জনসন। তিনি স্বর্ণের বিপরীতে ডলারকে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের বিরুদ্ধে বৈরী আচরণ শুরু করে দেয় কি না, তা নিয়ে তার মনে ছিল যথেষ্ট সংশয়। তাই তিনি কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চালাতে শুরু করেন, যেন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো আপাতত তাদের নিকট স্বর্ণ দাবি না করে।

১৯৬৮ সালের দিকে তাদের রিজার্ভে স্বর্ণের পরিমাণ ৯৬৭৯ মেট্রিকটনে নেমে আসে। এমতাবস্থায় ডলার পুনর্মূল্যায়ন না করলে বাকি স্বর্ণগুলো আটকে রাখা যাবে না। ১৯৭১ সালে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসেন রিচার্ড নিক্সন। ততদিনে তাদের রিজার্ভে স্বর্ণের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৯০৭০ মেট্রিকটন । ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশের অব্যাহত স্বর্ণের দাবিকে কূটকৌশলের মাধ্যমে কয়েক বছর দমিয়ে রাখলেও এ বছর আর সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষ করে ফ্রান্সে চাপ ছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি।

ফলে ১৫ আগস্ট ১৯৭১, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ব্রেটন উডস অঙ্গিকারনামা রহিত করেন। অর্থাৎ ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ পরিশোধের প্রক্রিয়া রহিত করেন। এরপর কয়েকদফা ডলারকে পুনর্মূল্যায়িত করা হয়, ১ আউন্স স্বর্ণ = ৩৮/৪০/৪২। কিন্তু ডলারের ওপর আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা পুনস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালে চূড়ান্তভাবে ব্রেটন উডস অঙ্গিকারনামাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এরপর হতে স্বর্ণের বিপরীতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এখন যে প্রক্রিয়ায় বিনিময় হার নির্ধারিত হয়, তা হলো– Floating Exchange Rate System।

পেট্রো ডলার :

William Clark-এর লেখা *Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar* বইটি হতে :

ফেড বুঝতে পারে, আন্তর্জাতিক মহল ডলারের ওপর পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তারা যদি নতুন কোনো অর্থ ব্যবস্থার ফন্দি করে, তবে তা ডলারের শেষকৃত্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকা জ্বালানি তেলকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, যার জন্য ডলার আজও টিকে আছে।

৭০ দশকের প্রথম থেকে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়তে শুরু করে। আমেরিকা সৈন্য বাহিনী নিয়ে আরব দেশের তেলক্ষেত্রগুলো একে একে দখল করতে শুরু করে। যাদের সাথে সমঝোতা হয়েছে, তাদের সাথে যুদ্ধ হয়নি। আর যারা বেকে বসেছে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের পর হতে ঘটে যাওয়া আরব-ইজরাইল যুদ্ধগুলোতে আমেরিকা ইজরাইলিদের পক্ষ নেওয়ায় আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে মার্কিনিদের সম্পর্ক তিক্ততায় পৌঁছে। এরই রেশ ধরে ১৯৭৩ সালে ওপেকভুক্ত ১২টি রাষ্ট্র আমেরিকার ওপর তেল অবরোধ জাড়ি করে, যা সে বছরের (৭৩) অক্টোবর হতে

শুরু করে পরবর্তী বছরের (৭৪) মার্চ মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মাত্র ছয় মাসে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের মূল্য $২৫.৯৭ থেকে বেড়ে $৪৬.৬৩-এ গিয়ে পৌছে।

মার্কিন প্রশাসন এ পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যে কূটনৈতিক চাল চালতে শুরু করে। পারিবারিক দ্বন্দ্বে বাদশাহ ফয়সালের নিহত হলে মার্কিনিদের জন্য পথ আরও সহজ হয়ে যায়। তখন সৌদি সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইজরাইলের জুজু কাজ করছিল। ইজরাইল তার আশেপাশের ভূ-খণ্ডগুলোতে যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে পারে– এমন একটি আতঙ্ক তাদের মধ্যে কাজ করছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে সৌদি-আমেরিকা অস্ত্র-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মূল বিষয় ছিল, সৌদি রাজ পরিবার রক্ষায় আমেরিকা তাদের সামরিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। বিনিময়ে সৌদি আরব তাদের নিকট তেল রপ্তানি করবে। এই তেল পরিশোধন করে আমেরিকা বিশ্ব বাজারে বিক্রি করবে।

ধীরে ধীরে অন্যান্য আরব দেশগুলোও আমেরিকার সাথে বিভিন্ন চুক্তি করে। একপক্ষ দিবে অস্ত্র ও সামরিক নিরাপত্তা, অপরপক্ষ দেবে তেল। এবার ইউরোপীয় বা অন্য কোনো দেশ যদি পরিশোধিত তেল ক্রয় করতে চায়, তবে তা ডলার দিয়েই ক্রয় করতে হবে। অন্য কোনো কারেন্সির বিনিময়ে আমেরিকা তা বিক্রি করবে না। বাধ্য হয়ে প্রতিটি রাষ্ট্র এই নীতি মেনে নেয়। তখন থেকে আমেরিকান ডলারের ভিত্তিমূল্যে স্বর্ণের পরিবর্তে তেল স্থলাভিষিক্ত হয়। এ কারণে ডলারের অপর নাম আজ পেট্রো ডলার।

৭০-এর দশকে আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে শুরু করে, যাতে করে পেট্রো ডলারের যুগ শেষ হয়ে গেলেও বিনিয়োগকৃত অর্থের বদৌলতে ডলারকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ব্যবহার করে চীনের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের অনুমতি পাওয়া আমেরিকার জন্যে ছিল বড়ো অর্জন।

আমেরিকার সাথে রাজনৈতিক দ্বৈরথের দরুন ২০০০ সালে সাদ্দাম হোসেন ডলার বর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি পুনরায় স্বর্ণভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ আমেরিকাকে এখন থেকে ডলার নয়; স্বর্ণ দিয়ে তেল কিনে নিতে হবে। এ কারণে আমেরিকান প্রশাসন ২০০১ সালে অর্থনৈতিক হোঁচট খায়। এরপর কী হলো! ডলারকে বাঁচাতে আমেরিকা পুরো ইরাক দখল করে নেয়; একইসঙ্গে তেল ক্ষেত্রগুলোও। একই ভাগ্য বরণ করতে হয় সিরিয়া এবং লিবিয়াকে। গোটা মধ্যপ্রাচ্য ভূ-রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

ইহুদি ঔদ্ধত্যপনা

এখন আমরা এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছেছি, যখন বড়োদিন পালনের জন্য ইহুদিদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়! ইহুদিরা যে শহরগুলোতে বসবাস করছে, সেখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি, এমনকী গির্জাগুলোতেও বড়োদিন পালন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যদি তারা আমাদের বড়োদিন পালনে অনুমতি প্রদান করে, তবে একটি বিষয় ফলাও করে প্রচার করা হবে যে, বাহ! ইহুদিরা তো অন্য ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতি অনেক উদার। আদৌ ইহুদিরা আমাদের বড়োদিন পালনের অনুমতি দেবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নই। ১৯২১ সালের ৩১ অক্টোবর *Brooklyn Eagle* পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ পায়, যার কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো–

> 'Canon William Sheafe Chase কিছুদিন আগে জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের সচিবের কাছে একটি চিঠি লিখেন। বড়োদিনের প্রাক্কালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতঃপূর্বে যিশুখ্রিষ্টের জীবনী নিয়ে যে আলোচনা হতো, তা বন্ধের জন্য নতুন কোন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়ে তিনি এই চিঠি লিখেন। আমেরিকান গির্জা ফেডারেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, গত বছর কিন্ডার গার্ডেনের এক শিক্ষক বড়োদিন উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মাঝে যিশুখ্রিষ্টের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে তাকে হুঁশিয়ার করা হয়। সেইসঙ্গে এমন কাজ যদি পুনরায় করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।'

আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী, আমেরিকা হলো খ্রিষ্টানদের দেশ। তারপরও হিব্রু সম্প্রদায়ের প্রতি আমেরিকার প্রশাসন যতটা উদারতা দেখিয়েছে, ততটা অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি কখনোই দেখানো হয়নি। খ্রিষ্ট আদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর যেকোনো সম্প্রদায়ের মানুষ আমেরিকায় প্রবেশ করতে পারে, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি বিশ্বাস করি, খ্রিষ্ট ধর্মকে আমাদের সমাজব্যবস্থা থেকে মুছে দিতে যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তার পেছনে পুরো হিব্রুজাতি নেই; বরং তাদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী রয়েছে। তারা বারবার নিজেদের ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এই হলো আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব পালনের বর্তমান অবস্থা। জাঁকজমকতা আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই থাকবে কিংবা আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যে নিগূঢ় ভাবগাম্ভির্যের মধ্য দিয়ে একসময় বড়োদিন পালিত হতো, ভবিষ্যতের দিনগুলোতে তা হারিয়ে যাবে। ধর্মীয় উৎসব রূপ নেবে বিভিন্ন অশালীন কর্মকাণ্ডে। বিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠা নতুন প্রজন্ম হয়তো বুঝতেই পারবে না, কেন এবং কী কারণে এই দিবস পালন করা হয়। তাদের কাছে সবকিছুই হবে আমোদ-ফূর্তির অংশ।

Dr. William Carter দীর্ঘদিন ব্রোকলিন শহরের Throop Avenue Presbyterian Church-এর পাদরি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তার লেখা উল্লেখযোগ্য কিছু বইয়ের নাম হলো– *The Gate of Janus: an epic story of the world war, Milton and His Masterpiece*’ও ‘*Studies in the Pentateuch*। সুবক্তা হিসেবে বিভিন্ন মহলে তার ছিল অসামান্য সুনাম। তা ছাড়া ইতিহাস ও সাহিত্যের ওপর তার মস্তিষ্ক ছিল ঈর্ষণীয় জ্ঞানে পূর্ণ।

Y.M.C.A-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখায় তিনি পারিপার্শিক ঘটনা প্রবাহের ওপর টানা ৩০ সপ্তাহ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে নিউইয়র্ক শিক্ষাবোর্ড তাকে একই বিষয়ের ওপর Erasmus High School-এ নিয়মিত বক্তৃতা প্রদানের অনুরোধ করে। ১৯১১-১৯২১ সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সান্ধ্যকালীন ক্লাসগুলোতে চলমান বিভিন্ন বিষয়াবলির ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন।

শুরুতে খুব একটা সাড়া না পেলেও মাত্র ছয় সপ্তাহের ব্যাবধানে তার শ্রোতা সংখ্যা ৩৫ থেকে ৩৫০-এ গিয়ে পৌছায়। প্রতিদিন তিন ধাপে এই বক্তৃতা চলত। প্রথম ধাপে, শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। দ্বিতীয় ধাপে, সমকালীন ঘটনাবলির সাথে মিল রেখে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর আলোচনা করতেন। তৃতীয় ধাপে, উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীরা তাকে আলোচিত বিষয়সমূহের ওপর প্রশ্ন করতেন।

১৫ নভেম্বর, ১৯২০ সালের কথা। উক্ত সপ্তাহে শিক্ষাবোর্ড আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেয় ‘আমেরিকার বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পরিচয়।’ Dr. Carter বক্তৃতা শুরু করেন– ‘বিশ্বযুদ্ধ শুরুর হওয়ার মাত্র এক মাস আগে প্রচুর বিদেশি নাগরিক আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে প্রবেশ করে। সংখ্যাটা প্রায় ১৪,০৩,০০০-এর কাছাকাছি; যার মধ্যে ৬ শতাংশ গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক, ২ শতাংশ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এবং ১০ শতাংশ ইহুদি।’

পরবর্তী সপ্তাহে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়, 'অভিবাসীরা আমেরিকার জন্য কী করেছে?' Dr. Carter বলেন– 'ইউরোপের কিছু কিছু মানুষ বহু কষ্টে সামান্য আশ্রয়ের আশায় আমেরিকায় প্রবেশ করেছে, তারপরও আমেরিকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। এ দেশের উন্নয়নে তারা নিজেদের সর্বোচ্চটা ঢেলে দিতে ন্যূনতম কার্পণ্য করেনি। তারা প্রত্যেকেই এসেছে অনুন্নত এবং কম উন্নত দেশগুলো থেকে।' (তিনি উন্নত বলতে ইতালির মতো সমপর্যায়ের দেশগুলোকে এবং অনুন্নত বলতে কালো ও বাদামি বর্ণের মানুষদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।)

আলোচনার এক পর্যায়ে ইহুদিদের প্রসঙ্গ চলে আসে। সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, উন্নয়নকর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি ইহুদিদের অবদানের কথা উল্লেখ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেইসঙ্গে ইহুদিদের বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেন। যেমন : Disraeli, Rubinstein, Schiff, Kahn এবং Rabbi Wise। ব্যক্তিগতভাবে যে তারও অনেক ইহুদি বন্ধু-বান্ধবী রয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করেন।

কিছু মানুষের কাছে ভয় দুই ধরনের। এক, অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ করার ভয়। দুই, অনিবার্য বিপদ জেনেও বিবেকের তাড়নায় সত্য না বলতে পারার ভয়। Dr. Carter-এর ক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই।

তিনি ইহুদিদের যে এত এত অবদানের কথা উল্লেখ করলেন, তবে তাদের সেই অবদান কোথায়? রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদি সব তো জ্যান্টাইলদের রক্ত-ঘামে তৈরি হচ্ছে। অপরদিকে ইহুদিরা নরম-মোলায়েম কেদারায় বসে সুদের ব্যবসায় করে যাচ্ছে। ইহুদিদের খুশি করতে তিনি নাহয় কয়েকটি প্রশংসাসূচক বাক্য বলেছেন, কিন্তু তিনি তো দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ! বিবেকের তাড়নায় সত্য বলা থেকে বিরত থাকতে পারেননি।

রাশিয়া থেকে আগত ইহুদিদের একদল অভিবাসী সম্পর্কে তিনি বলেন–

> 'প্রত্যেক জাতির মধ্যে খারাপ কিছু উপাদান পাওয়া যায় এবং এটাই স্বাভাবিক। ইহুদিদের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইহুদিদের প্রায় ১,৪৩,০০০ অভিবাসী রাশিয়া থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। ভুলে গেলে চলবে না, ইহুদিদেরে পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাশিয়ান ইহুদিরা হলো সবচেয়ে খারাপ।'

উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ বরাবরের মতোই স্বাভাবিক ছিলেন। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু হলে দুজন ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি রাশিয়ান ইহুদিদের নিয়ে এত বেশি সমালোচনা করলেন? উত্তরে তিনি বলেন–

'আমি সকল জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করেছি। তা ছাড়া ইহুদি রাশিয়ান জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে পৃথিবীর সবাই একই মন্তব্য করেছে।'

কিছুদিন পর শিক্ষাবোর্ড থেকে নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয়, বক্তৃতার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার দায়ে তার বিরুদ্ধে কিছু ব্যক্তি অভিযোগ করেছে। পরে খবর নিয়ে জানা যায়, সেই আলোচনাসভায় প্রশ্নকারী দুজনই ইহুদি। ভাবা যায়! ৪০০ শ্রোতার মাধ্য থেকে মাত্র দুজন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আর এতে চারদিকে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে আরও অনেক অভিযোগ শিক্ষাবোর্ডে জমা হতে শুরু করে। ফলে Dr. Carter-এর বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। স্বাধীন দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আজ সবার বাক্-স্বাধীনতা রুদ্ধ। এ জাতীয় ঘটনা ইতঃপূর্বে আরও অনেক ঘটেছে। সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তদন্ত কমিটির ডাকে Dr. Carter হাজির হলেন। তার সামনে বসে ছিল সাতজন ইহুদি। এর মধ্যে চারজন স্বীকার করে তারা সেই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিল না এবং সেখানে কী আলোচনা হয়েছে, তার কিছুই ভালোভাবে জানে না। এই পুরো তদন্ত কার্যক্রম যার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছে, তিনি হলেন রাবাই C.H. Levy। তিনি রাবাই ইউনিয়ন, মন্ত্রিপরিষদ ও Kehillah-এর অন্যতম একজন সদস্য। তিনি দীর্ঘকাল ধরে এ দেশে নিজের জাতিগোষ্ঠীর জন্য গুপ্তচর হয়ে কাজ করেছেন। সেই বক্তৃতাসভায় তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন না।

তদন্ত কার্যক্রম যথারীতি শুরু হলে এক এক করে ছয়টি চিঠি খোলা হয় এবং সবার সামনে তা পাঠ করা হয়। প্রতিটি চিঠির বিষয়বস্তু প্রায় কাছাকাছি; ইহুদিদের ব্যাপারে খারাপ বা ভুল মিশ্রিত কোনো তথ্য যেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা না হয়, চিঠিগুলোতে তা-ই বলা হয়েছে। সবগুলো চিঠি পাঠানো হয়েছিল নিউইয়র্ক শিক্ষা বোর্ড পরিচালনা কমিটির সদস্য Dr. W.L. Ettinger-এর নিকট। চিঠি পাঠ করা শেষ হলে Dr. Carter-কে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হলো। তিনি বললেন–

'মনে হচ্ছে সবগুলো চিঠি কেবল একজন ব্যক্তির নির্দেশনায় লেখা হয়েছে। কারণ, তাদের প্রত্যেকের আপত্তির বিষয়বস্তু এক। যদি পৃথক পৃথক মানুষের থেকে চিঠিগুলো আসত, তবে বিষয়বস্তুতে কিঞ্চিৎ হলেও পার্থক্য পাওয়া যেত।'

তিনি পরোক্ষভাবে Levy সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই ব্যক্তির কথা, যার নির্দেশনায় এগুলো লেখা হয়েছে। এরপর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু সাক্ষী হাজির করার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হলো না। অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ ইহুদি ট্রাইব্যুনালের বিপক্ষে বসে আছেন একজন জ্যান্টাইল শিক্ষক।

তদন্তের একপর্যায়ে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তিনি বক্তৃতায় যা কিছু বলেছেন, তা ইচ্ছা করে বলেননি এবং তাতে কোনো মিথ্যা তথ্য ছিল না। তা ছাড়া তিনি কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা করবেন, তা তো শিক্ষাবোর্ড-ই নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার কিই-বা করার আছে! ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা যখন বিতর্কে পেরে উঠছিল না, তখন তারা ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। রাবাই Levy হাস্যকর টিপ্পনী কেটে প্রশ্ন করেন–

'মহোদয়, জানতে পারি কি আপনি আদৌ আমেরিকান না অন্য দেশের নাগরিক?'

Dr. Carter ১৫ বছর বয়সে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় আসেন। বেশ কিছুদিন এখানে থাকার পর নাগরিকত্ব পেয়ে যান। তারপর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। জবাবে তিনি বলেন–

> 'আমি ত্রিশ বছর আগে এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছি এবং তার প্রমাণও আছে। আপনি বললে আমি সেই প্রমাণ হাজির করতে পারব। আশা করি আপনি নিজেও আপনার নাগরিকত্বের প্রমাণ হাজির করতে পারবেন।'

তিনি রাবাই Levy-কে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। জবাবে Levy বলেন–

> 'আমি দেখে নেব, তোমার মতো নোংরা ইংরেজ কীভাবে নিউইয়র্কের কোনো জনসভায় বক্তৃতা দেয়!'

এমন অপমানজনক বাক্য শুনে Dr. Carter মূহুর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তার চোখে রাগের অভিব্যক্তি ঠিকরে পড়ছিল, কিন্তু পুরো ট্রাইব্যুনাল বিপক্ষে হওয়ায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ভাগ্য ভালো, ট্রাইব্যুনালে সেদিন তিনি ছাড়া আরও একজন জ্যান্টাইলন উপস্থিত ছিলেন; Ernest L. Crandall। তিনি সেই শিক্ষাবোর্ডের সান্ধ্যকালীন শিক্ষা কার্যক্রমের সুপাভাইজার ছিলেন। তিনি রাবাই Levy-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> 'একজন ভদ্রলোককে নোংরা ভাষায় যেভাবে অপমান করলেন, তা নিজ চোখে এর আগে কখনো দেখিনি। আপনারা যা করলেন, তার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। এমন নোংরা বাক্য যদি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেন, তবে আপনাদের এখান থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।'

এরপর Crandall সাহেবের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে এ আলোচনা আর দীর্ঘ করতে চাই না। তদন্তে Dr. Carter নির্দোষ প্রমাণিত হন। তাকে সসম্মানে সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। পুনরায় তিনি Erasmus School-এ ফিরে যান।

কিছুদিন পর একটি নোটিশের মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়– আইরিশ ও ইহুদি বিতর্ক নিয়ে তিনি যেন আপত্তিকর কোনো মন্তব্য না করেন, যদিও তা আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলে যায়।

১৯১৮ সালের পর থেকে আয়ারল্যান্ডজুড়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এটিকে এক প্রকার গৃহযুদ্ধও বলা যায়। আইরিশ অধিবাসীরা চাচ্ছিল তাদের নিয়ে চারদিকে আলোচনা হোক, কিন্তু জায়োনিস্ট সংগঠনগুলো তা চাচ্ছিল না। কারণ, তাদের মনে কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসার ভয় ছিল। কারণ, ব্রিটিশ-আয়ারল্যান্ডের মধ্যে যে যুদ্ধের সূত্রপাত, তার পেছনে ছিল এই জাতিগোষ্ঠীটিরই কূট-পরিকল্পনা। সরকারিভাবে আইন পাশ করা হয়, যেন আইরিশ বিতর্ক নিয়ে কোথাও সামান্য টু শব্দ পর্যন্ত করা না হয়।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ বক্তৃতা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পর ডিসেম্বর মাসে Dr. Carter স্বেচ্ছায় এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তখন থেকে তার জীবনে শুরু হয় নিত্য অভাব-অনটন। বিবেকের তাড়নায় তিনি অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকতে পারেননি। পরবর্তীকালে এই পদে যাকে নিয়োগ দেওয়া হবে তার আদৌ সেই ভয় থাকবে কি না– নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, তবে আশার আলো খুবই ক্ষীণ। বাক্‌ স্বাধীনতার নামে এ দেশের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো যে বুলি আওড়ায়, তা যে কতটা মিথ্যা তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা সম্ভব।

ইহুদিদের মায়াকান্না

'ইহুদি বিতর্ক' ও 'সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন' বিষয় দুটি যে এক নয়, তা একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও স্বীকার করবে। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে– যারা নিজেদের সম্পর্কে ন্যূনতম অভিযোগ বা সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সত্য না মিথ্যা, তা কখনোই বিবেচনায় নেওয়া হয় না। তাদের নিয়ে বাজারে কোনো প্রকার বিতর্ক সৃষ্টি করা যাবে না– এটাই মূখ্য বিষয়। আর এ জাতীয় মানুষগুলো ক্ষমতায় গেলে যে কতটা স্বৈরাচারি হতে পারে, সেই শিক্ষা আমরা ইতিহাস থেকেই নিতে পারি। যে বিষয়টি তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায়– তা হলো সত্যের উন্মোচন। কারণ, এটাই একমাত্র বিষয় যা সর্বস্তরের মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে। তাই সত্যকে ধামাচাপা দিতে প্রায়শই তারা এমন কিছু বাহানা সামনে নিয়ে আসে, যা দ্বারা সাধারণ মানুষের আবেগকে ব্যবহার করে পুরো ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব।

পূর্বের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে– যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনার চেষ্টা করে, তখন তাদের ওপর অ্যান্টি-সেমাইট লেবেল চাপিয়ে দেওয়া হয়। বিতর্কের নামে ইহুদিদের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালানো হচ্ছে– এমন মায়াকান্নার রুল চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ মানুষের আবেগ নিজেদের পক্ষে নিয়ে পুরো বিষয়কে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, আজকের যুগে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে স্বৈরাচারী ইহুদিদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো সম্ভব! আজকের দিনে তো একজন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাহেবও নিউ টেস্টামেন্ট হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ করার মতো ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। উপরন্তু প্রশাসনিক বিভিন্ন পদ থেকে 'খ্রিষ্টান' শব্দটির ব্যবহার বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৯২০ সালের মে মাসে আমেরিকার ওহিয়ো প্রদেশের দৈনিক পত্রিকা *Daily American Tribune* প্রকাশ করে– 'আজকের দিনে যা হচ্ছে, তা ইহুদি নিপীড়ন নয়; খ্রিষ্টান নিপীড়ন।' বিখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ Dean Swift বলেন– 'বুঝতে পেরেছি, সহ্য যা করার সব আমাদেরই করতে হবে। আমাদের কোনো কিছু ইহুদিরা সহ্য করবে না।'

এপ্রিল-মে মাসের দিকে *The Jewish Times*-এর সম্পাদক H. Lissauer একটি কলাম লিখেন, যার শিরোনাম ছিল–

> 'ক্রুশ চিহ্ন ইহুদিদের জন্য আপত্তিকর। খ্রিষ্টানদের উচিত মাগান ডেভিডকে ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা। আমরা কখনো সামান্য একটি ক্রুশ চিহ্নের নিকট নিজেদের ধর্ম, আদর্শ ও বিবেকবোধকে ঢেলে দিতে পারি না।'

ক্লিভল্যান্ডের পত্রিকা *Jewish Independent* প্রকাশ করে– 'Gideons-এর যথেচ্ছা ব্যবহার ইহুদিদের জন্য আপত্তিকর।' Gideons বাইবেলে উল্লিখিত এক পয়গম্বর, যিনি একাধারে মহাবীর, যুদ্ধের সেনাপতি ও ন্যায়বিচারক। আমেরিকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার ছবি ঝুলিয়ে রাখা হতো। তিনি আমাদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের প্রতীক। আমাদের আদালত ঘরগুলোতে Gideons-কে একজন আদর্শ বিচারকের প্রতীক হিসেবে স্মরণ করা হয়। ইহুদিরা দাবি করে, সকল স্থান থেকে যেন তার ছবি সরিয়ে ফেলা হয়। C.A. Johnson একবার চেচিয়ে বলেছিলেন–

> 'আদালত ঘরে ন্যায্য বিচারের প্রতীক হিসেবে Gidoens-কে স্মরণ করার কী দরকার, নিজে সৎ বিচারক হলেই তো হয়।'

১৯০৯-১০ সালের দিকে আমেরিকার গির্জাগুলো পথভ্রষ্ট ও মানসিক বিকারগ্রস্ত ইহুদিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোড়দার করা, কিন্তু ইহুদিদের সংগঠনগুলো ঔদ্ধত্যের সুরে বলে ওঠে–

> 'খ্রিষ্টানদের এত বড়ো স্পর্ধা, আমাদের জ্ঞান দিতে আসে! আমাদের কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।'

প্রতিশোধস্বরূপ ১৯১১ সালে তারা নিউইয়র্কে একটি আইন পাশ করে–

> '১৬ বছরের কম বয়সি কাউকে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ধর্মীয় কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত করা বা নিয়মিত গির্জায় যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।'

শিকাগো বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিকাগো গসপেল মিশন সংগঠনটির একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। রাবাইরা তাকে নিয়ে একের পর এক নিন্দনীয় কলাম লিখে যাচ্ছিল। যেমন :

> 'খ্রিষ্টান অভিভাবকদের আজ কী হলো, তারা সন্তানদের একজন ভণ্ড ও দুশ্চরিত্র ধর্ম ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে পাঠাচ্ছে! কীভাবে তারা একজন ধর্ম ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষা আশা করছে!'

একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনে ধর্মের প্রতি উৎসাহী করতেই পারেন। তাই বলে কি তিনি ধর্ম ব্যবসায়ী হয়ে যাবেন? এ দেশের শিক্ষাবোর্ড ইহুদিদের কথামতো সেই অধ্যক্ষকে বিদ্যালয় থেকে চাকরিচ্যুত করে। কিন্তু যখন কোনো রাবাই-এর বিরুদ্ধে মাদক ব্যাবসা, শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও কূট-পরামর্শের মতো জঘন্য সব কাজের সাথে জড়িত হওয়ার প্রমাণ মেলে, তখন তাদের ধর্ম ব্যবসায়ী বলা হয় না কেন?

২৬ নভেম্বর, ১৯২০, Jewish Sentinel প্রকাশ করে–

> 'আমাদের সবচেয়ে পুরাতন এবং বিপজ্জক শত্রু হলো রোমান সম্প্রদায়। তারা যে শাখায় বিচরণ করে, তার প্রত্যেকটি-ই আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। যেদিন রোমের সূর্যাস্ত হবে, মনে রাখবেন! সেদিনই জেরুজালেমের সূর্যোদয় হবে।'

ক্লিভল্যান্ড ও লেকউড শহরের খ্রিষ্টানরা যখন বড়োদিন পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ইহুদিদের পত্রিকাগুলো কটাক্ষ করে বলতে শুরু করে–

> 'আপনাদের কি ধারণা আছে, ক্লিভল্যান্ড ও লেকউড শহরে কি পরিমাণ ইহুদি বাস করে? যদি আমাদের একজন সদস্যও এ শহরে বাস করে, তবে এখানে সাম্প্রদায়িক কোনো উৎসব হতে পারে না।'

পরবর্তী বছরের পহেলা জানুয়ারি ইহুদিদের পত্রিকাগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে–

> 'আরেকটি বড়োদিন ফিরে আসার পূর্বে আমাদের হাতে মাত্র ৩৬০ দিন বাকি আছে। আমাদের উচিত খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এবং বাকি সময়টার উপযুক্ত ব্যবহার করা।'

ইহুদি ব্যবসায়ীরা গত কয়েক বছর যাবৎ নতুন এক খেলায় মেতে উঠেছে। ইস্টার সানডে ও বড়োদিন বন্ধ করতে পারেনি বলে ইহুদিদের দোকান ও মার্কেটগুলো যেকোনো উৎসবের দিন এলেই পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে শুরু করে। যেমন : Levys, Issac, Goldsteins ও Slivermans; কিন্তু নিজেদের উৎসবের দিনগুলো এলে ঠিকই পণ্যের দাম কমিয়ে দেয়।

রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে পালন করাতেও ইহুদিরা আমাদের নিয়ে কম বাজে কথা বলেনি। যেমন–

> 'ছি, ছি! আধুনিক যুগে এসেও খ্রিষ্টানরা কীভাবে পুরাতন একটি কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে! তাদের বিশ্বাসের কী যে শ্রী, রবিবার নাকি মৃত যিশু পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন!'

American Israelite পত্রিকা কয়েক বছর আগে একটি কলাম প্রকাশ করে–

> 'তখন আর কোনো ইহুদিকে লুকিয়ে থাকতে হবে না, যখন প্রতিটি খ্রিষ্টানকে উদারপন্থি ও মুক্তমনা করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।'

একসময় ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিষ্টান নারীগণ পর্দা মেনে বাইরে চলাফেরা করত। আজ সে জায়গায় তাদের ছোটো ছোটো কাপড় পড়তে দেখছি। নগ্ন চলচ্চিত্র, নেশা দ্রব্যের যথেচ্ছা ব্যবহার এবং যৌনতার ছড়াছড়িতে আমাদের সমাজ ছেয়ে গেছে। এগুলোর কোনোটিই যিশুর বার্তা ছিল না। এসবই প্রমাণ করে, তারা আমাদের মন থেকে যিশুকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এমন কোনো ক্যাথলিক চার্চ নেই, যার ওপর তারা আক্রমণ করেনি। তারা বলে– 'এ কেমন খ্রিষ্টসমাজ, যারা উপাসনা করে এক ইহুদি নারীর!' এটাকে নিছক আক্রমণ বললে ভুল হবে। যিশু মাতা 'কুমারী মেরিকে' নিয়ে তারা কত নোংরা ও অকথ্য গল্পের জন্ম দিয়েছে, তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

সামাজিক যেকোনো অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা গীত করা পৃথিবীর অতি প্রাচীন একটি সংস্কৃতি, কিন্তু এই সংস্কৃতি আজ লোপ পেতে বসেছে। ইহুদিরা সর্বত্র বাইবেলের বিরোধিতা করে, কিন্তু সুযোগ পেলে নিজেদের ব্যাপারে স্তুতি গাওয়া থেকে বিরত থাকে না। প্রায়শ ইহুদি রাবাইগণ খ্রিষ্টানদের গির্জা ও বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে জোর গলায় বলে বেড়ায়–

> 'আমরা বাইবেল লিখেছি এবং তোমাদের জন্য তা আমরাই সংরক্ষণ করেছি। তাই আশীর্বাদ চাইলে ইজরাইলের সেবা করো।'

তা ছাড়া, যে যিশু পৃথিবীর কোটি কোটি খ্রিষ্টানের হৃদয়ে দেবতারূপে এতদিন পর্যন্ত টিকে আছে, তাকে নিয়ে যথেচ্ছা গল্প রচনা করতে ইহুদিদের জুড়ি নেই। তারা এটাও প্রচার করে, যিশু ছিলেন ইহুদি। তিনি কস্মিনকালেও খ্রিষ্টান ছিলেন না। তাই আজ যারা খ্রিষ্টান এবং যিশুর উপাসনা করছে, তারা সবাই বিপথগামী।

এত কিছুর পরেও কি বলতে হবে আমরা ইহুদিদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন চালাচ্ছি? সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে আজ ইস্টার সানডে, গুড ফ্রাইডে, বড়োদিন, বড়োদিন সংগীত ইত্যাদি পালিত হয় না। তাদের মতে, একটি অদর্শ ও ধর্ম সহিংষ্ণু দেশ গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হলো– দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) হতে হবে। অন্যথায়, সে দেশ কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়বে। কিন্তু ইহুদি রাবাইগণ নির্বিঘ্নে বিভিন্ন শহরে নিয়মিত সেমিনারের আয়োজন করে যাচ্ছে এবং খ্রিষ্টান যুবকদের মধ্যে জুদাইজমের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

সবশেষে বলতে চাই, ধর্ম পালন এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে খ্রিষ্টান ধর্মকে কলুষিত করার যে নিরন্তর প্রয়াশ ইহুদিরা চালিয়ে যাচ্ছে, আশা করছি এই অধ্যায়টি কিছুটা হলেও জ্যান্টাইলদের মধ্যে চিন্তার খোরাক জোগাতে পারবে।

ইহুদি সন্ত্রাসীদের নানা অপকর্মের চিত্র

পূর্বে বলেছি এখনও বলছি, আমার বই লেখার উদ্দেশ্য পুরো ইহুদি সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা নয়। তাদের মাঝেও এমন অনেক সদস্য আছে, যারা একজন নীতিবান ও আদর্শ জ্যান্টাইলের ন্যায় পুরো জীবন অতিবাহিত করতে উৎসুক। এ সকল অপরাধ কর্মকাণ্ডের পেছনে তাদের কোনো প্রকার সম্মতি নেই। তবে এটা ঠিক যে, Kehillah, B'nai B'rith, Anti-Defamation League, American Jewish Committee, Zionism ইত্যাদি সংগঠন ও মতবাদগুলো তাদের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তারাই আজ পুরো বিশ্বে এক একটি বিষফোঁড়ায় পরিণত হয়ে উঠেছে। তবে ইহুদিদের পুরো সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এতে সে সকল ইহুদিরাও অভিযুক্ত হবে, যারা আজ বিশ্বশান্তির জন্য জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে কেবল অপরাধীদের পরিচয় উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে যে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করছে, তার মূলে রয়েছে ইহুদিরা; যারা ধর্মকে বিশেষভাবে ব্যবহার করছে।

আমেরিকার এমন কোনো শহুরে মেজিস্ট্রেট ও থানা-আদালত পাওয়া যাবে না, যেখানে ইহুদিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। থানা-আদালতগুলোতে শত শত ফৌজদারি মামলা হওয়ার পরও পত্র-পত্রিকায় ইহুদিদের নাম দেখা যায় না।

উকিল, বিচারক ও আইনজীবীরা যে বহু আগেই তাদের উপঢৌকনের নিকট বিক্রি হয়ে গেছে, সে গল্প তো আগেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯০৯ সালে নিউইয়র্কের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার General Bingham চারদিকে ঘটমান বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীটির অপরাধ কর্মের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যা নিয়ে চতুর্দিকে হইচই পড়ে যায়। তিনি বলেন–

> 'আমি নিশ্চিত, আমেরিকার নিকৃষ্টতম বিচারব্যবস্থায় এমন অনেক উকিল ও আইনজীবী খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা এই প্রতিবেদনের প্রতিটি তথ্য মিথ্যা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালাবে।'

প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ে অসহায় ও বিপর্যস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ কিছু সংগঠন থাকে। যেমন : খ্রিষ্টানদের এমন কিছু সংগঠনের নাম হলো– Magdalen Home, Protestant Episcopal House of Mercy ও Catholic House of the Good Shepherd। এখানে ব্যতিক্রম কেবল ইহুদিরা।

নিউইয়র্কের সকল মেজিস্ট্রেট আদালতের সংগৃহীত তথ্য মতে, সমাজের দুই-তৃতীয়াংশ অসহায় নারী সমাজ ইহুদি জনগোষ্ঠীর অংশ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই অসহায় নারীদের দায়ভার গ্রহণ ও পূনর্বাসনের জন্য ইহুদিদের নির্দিষ্ট কোনো সংগঠন নেই! একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা তা বারবার ভঙ্গ করেছে। সবশেষে মানবিক মূল্যবোধ থেকে Protestant Episcopal House of Mercy সংগঠনটি এই অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নিউইয়র্কের এক ইহুদি আইনজীবীর নাম শোনা যায়, যে ওয়ালস্ট্রিট শেয়ারবাজারের বিভিন্ন সদস্যকে সুকৌশলে কুৎসিত সব কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ব্লাকমেইলের চেষ্টা করত। পুরো বাজারে সে 'Wolf of Wall Street' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এই নেকড়ে বাঘকে ফৌজদারি অপরাধের দায়ে জেলখানায় পাঠানো হলে তাকে রক্ষার এগিয়ে আসে Kehillah। অনেক প্রচেষ্টার পর তাকে জেল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। যেহেতু বয়সে সে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে, তাই তার সঠিক চিকিৎসা দরকার– এমন একটি অজুহাতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় মেজিস্ট্রেটের বর্ণণা অনুযায়ী–

> 'ইহুদিরা এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক যে, তাদের প্রতিটি প্রজন্মই জন্মের পর হতে বাবাদের চাপিয়ে দেওয়া ভ্রান্ত শিক্ষার ছায়ায় বড়ো হতে থাকে। খুব অল্প বয়সে ইহুদি সন্তানদের মগজে এমন কিছু খারাপ চেতনার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যার দরুন পরিণত বয়সে তাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করা সম্ভব হয় না। পুরো পৃথিবীকে ইহুদিদের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে–

এটাই তাদের বিশ্বাস। সাব্বাত হলো এমনই একটি উদাহরণ, যা তারা জোরপূর্বক অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করছে। ইহুদিদের কাছে সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার কোনো দাম নেই।'

যে ইহুদিদের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশ মূলত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ থেকে আগত। যেমন : রাশিয়া, গ্ল্যাশিয়া ও পোল্যান্ড। নিজ সম্প্রদায়ে মাঝে ইহুদিরা সর্বদা ইডিশ ভাষায় কথা বলে। জ্যান্টাইল ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন করার পর তারা যে রশিদ ও ক্যাশ মেমো ধরিয়ে দেয়, তাও ঠিক একই ভাষায়। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শ্রমিকদের জোরপূর্বক কর্মস্থলে আসতে বাধ্য করার জন্য যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়, তখন তাদের রক্ষা করতে ইহুদি আইনজীবীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ইহুদিদের রক্ষার জন্যই বিচার বিভাগে প্রতিদিন নিত্যনতুন আইন তৈরি হতে থাকে।

আদালতে দাখিল করা হলে ইহুদি আইনজীবীরা বলে, পূর্ব ইউরোপে দেশগুলোতে বসবাসকালে তারা শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি পালন করত। তাই সেই সংস্কৃতি থেকে ইহুদিরা এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। আদালত পরামর্শ দেয়, শনি-রবি উভয় দিবসে যেন ইহুদিরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে। কিন্তু অর্থের প্রতি তারা এতটা লোভী যে, সপ্তাহে দুই দিন ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ থাকবে– এমনটা মেনে নিতে পারেনি। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে ইহুদিদের কিছু কিছু সংগঠন এ দিনে সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখতে রাজি হয়। যেমন : The Independent Ladies Garment Merchant Association Incorporated জুনের শেষ হতে আগস্টের শেষ পর্যন্ত রবিবার ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ রাখতে রাজি হয়। কিন্তু যে শহরগুলোতে জ্যান্টাইলদের কোনো আধিপত্য নেই এবং আইনিব্যবস্থা খুব একটা জোরালো নয়, সেখানে শনিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন রেখে রবিবার সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রেখেছে।

তা ছাড়া রবিবার যেহেতু জ্যান্টাইলদের সব শপিংমল ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো বন্ধ থাকে, তাই এ দিনে যদি ইহুদিরা নিজেদের দোকানপাট খোলা রাখতে পারে, তবে প্রতি ঘণ্টায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। কারণ, বাজার তখন প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য থাকে। কিছুদিন আগে নিউইয়র্কের পঞ্চম অ্যাভিনিউ রেলওয়েতে একটি বড়ো বিজ্ঞাপন দেখা যায়, যেখানে উল্লেখ ছিল– প্রতি রবিবার, বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ইহুদিদের একটি পাইকারি দোকান খোলা থাকবে। বিষয়টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে যেই না পুলিশ ব্যবস্থা নিতে যাবে, অমনি বিজ্ঞাপনটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা ভাবে, চুরি-চামারি করেও যদি এ দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্য দোকান খোলা রাখা যায়, তাহলেও অনেক নগদ পয়সা উপার্জন করা যাবে।

নিউইয়র্ক প্রশাসন এই অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে বিশেষ একটি আইন পাশ করে। Penal Law ২১৪৯ অনুযায়ী–

> 'সাপ্তাহিক বন্ধের দিনে যদি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালু রাখে, তবে শহরের মেজিস্ট্রেটগণ কোনো প্রকার গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া তাদের সকল পণ্য বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। পরবর্তী সময়ে এই পণ্য সমাজের দুঃস্থ, গরিব ও দাতব্য সংস্থার মাঝে বন্টন করা হবে।'

সত্যি যদি এই আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তবে ইহুদি অর্থলোভী ব্যবসায়ীরা উচিত শিক্ষা পাবে।

তৃতীয় মেজিস্ট্রেটের বর্ণণা অনুযায়ী–

> 'আমেরিকাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করবে– এমন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব ইউরোপিয়ান ইহুদিরা এ দেশে প্রবেশ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ প্রতিদিন যেন বেড়েই চলেছে। ইহুদিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অসংখ্য ফৌজদারি মামলায় আমেরিকার আদালতগুলো পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর ইহুদি নারীদের কথা বলে তো লাভ নেই।
>
> তারা এমনভাবে নিজেদের উপস্থাপন করে, যেন সমাজের স্বর্বহারা দুঃখী জনগোষ্ঠী। আমি কখনোই বলব না– তারা অসহায় বা অবলা নারী; বরং তারা নতুন একটি মতবাদকে এ সমাজে চাপিয়ে দিতে চাইছে আর তা হলো– ফেমিনিজম। নারী স্বাধীনতার নাম করে ইহুদি নারীরা সমাজে যে নোংরা সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে, তা যে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি সভ্য দেশে বিষফোঁড়ায় রূপ নেবে, তা এখনই বলে রাখছি।
>
> অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আজ ইহুদিদের অধীনে চলে গেছে। বাকি অংশটুকু গ্রাস করতেও মনে হয় না খুব বেশি সময় লাগবে। ক্ষমতার প্রতি লোভ সবারই থাকে। কিন্তু এই ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরই যে ইহুদিরা অত্যাচারী হয়ে উঠে, তার নজির ইতিহাসে ভুরিভুরি পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগে নিউইয়র্কের এক লন্ড্রি ব্যবসায়ী আমার নিকট অভিযোগ করেছে, ইহুদিরা সিন্ডিকেট উপায়ে এ শহরের পুরো লন্ড্রি ব্যবসায়কে নিজেদের করে নিয়েছে এবং তাকে সেখান থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ইতিহাস বারবার এটাই প্রমাণ করে, সুযোগ হাতে পেয়ে প্রতিবারই ইহুদিরা অত্যাচারী হয়ে উঠেছে।
>
> এ শহরের পোস্ট অফিসগুলোতে প্রায় ১১,০০০ কর্মী কাজ করে, যাদের অর্ধেকেরও বেশি ইহুদি। পোস্ট ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও তারা পৌঁছে গেছে। ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলো যেমন : রোশ হাসানা,

নববর্ষ, ইয়ম কিপুর, প্রায়শ্চিত্ত দেবোস ইত্যাদি দিনগুলোতে তারা অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখে। অপর দিকে বড়োদিন, খ্রিষ্ট নববর্ষ, গুড ফ্রাইডে ইত্যাদি দিনগুলোতে পূর্ণ কর্ম দিবস পালন করে; এমনকী জ্যান্টাইলদেরও সেদিন কোনো ছুটি দেয় না।

প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে ইহুদিরা ইতোমধ্যেই প্রবেশ করতে শুরু করেছে, যা তাদের নতুন শক্তি এনে দিয়েছে। এখন ইহুদিরা নিজেরাই নতুন নতুন আইন তৈরি করতে পারবে এবং সুকৌশলে তা আমাদের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দেবে, যা পাঠ করে এ দেশের নতুন প্রজন্ম বড়ো হয়ে উঠবে। তাদের আইন অনুযায়ী শনিবার ইহুদিদের জন্য আদালত ও ফৌজদারি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে এবং রবিবার ব্যবসায়িক কার্যক্রম খোলা রাখার অনুমতি থাকবে।'

আরও একজন মেজিস্ট্রেটের বক্তব্য অনুযায়ী–

'কয়েক বছর আগে যখন লন্ডন ভ্রমণে যাই, দেখি-রবিবার সরকারি ছুটির দিনে ইহুদিরা পুরোদমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সুযোগ সবার জন্য ছিল না। কেবল ঘেটো অঞ্চলগুলোতে এই দিনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেদিন খুব দূরে নয়, যখন তারা মুক্ত পদাঘাতে সকল ঘেটোর সীমানা পেরিয়ে আমাদের সমাজে বসবাস শুরু করবে এবং ইহুদি আইনসমূহ সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবে।'

ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ইহুদিদের আক্রমণ

আন্তর্জাতিকভাবে ইহুদিদের চূড়ান্ত আক্রমণ আসে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চেতনার ওপর। ধর্মীয় চেতনাই ছিল শেষ শিকড়, যা আঁকড়ে ধরে আমরা বহু শতাব্দী অবধি নিজেদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু বিশেষ সেই গোষ্ঠীর কাছে এই ধর্মভীরু চেতনা ছিল ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বশেষ প্রতিবন্ধকতা। কীভাবে একটি জাতিকে নাস্তিক জাতিতে পরিণত করা যায়, সে সম্পর্কে তাদের প্রটোকলগুলোতে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেমন :

'খোদাভীতি ও সৃষ্টিকর্তাকেন্দ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস মুছে ফেলার জন্য আমরা জ্যান্টাইলদের হৃদয়ে গাণিতিক বিভিন্ন হিসাব-নিকাশের ধারণা প্রতিস্থাপন করব এবং বস্তুবাদী পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলব।

নাস্তিক জাতিতে পরিণত হওয়ার দরুন নির্দিষ্ট কোনো শাসনব্যবস্থায় তাদের আর বিশ্বাস থাকবে না। ফলে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিষয়টি হয়ে যাবে জনগণের সম্পত্তি, যা থেকে আমরা ইচ্ছামতো ফায়দা লুটে নেব।

আমরা তাদের ওপর এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেবো, যা তাদের নৈতিক চেতনা পঙ্গু করে দেবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত ধ্বংস করে দেবে।'- ৫ম প্রটোকল

'প্রভাবশালী জ্যান্টাইল পাদরিদের ক্ষমতা হ্রাস করতে বহু আগ থেকেই আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছি।'- ১৭তম প্রটোকল

'বিশ্ব শাসন ক্ষমতার একক অধিপতি হওয়ার পর আমরা কেবল নিজেদের ধর্ম প্রচার করব। এর বিষয়বস্তু হবে– এক ঈশ্বর; আমরাই সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সম্প্রদায় এবং পুরো বিশ্ববাসীর ভাগ্য একমাত্র আমাদের ভাগ্যের সঙ্গেই জড়িত। ফলে আমাদের ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর সকল ধর্ম ধ্বংস হবে এবং সবাই ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন শুরু করবে। এর মধ্যে যদি কোনো গোঁড়া নাস্তিকের জন্ম হয়, তবে সে আমাদের জন্য কোনো হুমকির কারণ হবে না।'-১৪তম প্রটোকল

'সকল ধর্মের সমান অধিকার' বিষয়টি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ইহুদিরা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপ তৈরি করল। ১৯০৬ সাল থেকে আমেরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাস থেকে ধর্মীয় শিক্ষা পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়ার জন্য ইহুদিরা ক্রমান্বয়ে চাপ বৃদ্ধিত করতে থাকে। এবার ইহুদি ও আমাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ইহুদি আক্রমণের ঘটনা পর্যায়ক্রমে নিচে তুলে ধরা হলো :

৫৬৬১ (১৮৯৯-১৯০০ খ্রি.) ভার্জিনিয়া প্রদেশের সকল প্রশাসনিক অফিস থেকে 'খ্রিষ্টান' শব্দটি সরিয়ে দিতে ইহুদিরা আন্দোলন করে।

৫৬৬৭ (১৯০৬-১৯০৭ খ্রি.) সংবিধান থেকে যিশুর নাম সরিয়ে দিতে ওকলাহোমায় আন্দোলন করে। ইহুদিদের মতে, সেক্যুলার রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করা নিন্দনীয়।

৫৬৬৮ (১৯০৭-১৯০৮ খ্রি.) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরি দাবিতে চারদিকে ইহুদি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

৫৬৬৯ (১৯০৮-১৯০৯ খ্রি.) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবসে (Thanks Giving Day) খ্রিষ্ট ধর্মীয় সকল পরিভাষা বর্জন করতে হয়। ইহুদি প্রফেসর Gotthard Deutsch বলেন– 'উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রার্থনা সংগীত চর্চা বন্ধ করতে হবে।'

৫৬৭৩ (১৯১২-১৯১৩ খ্রি.) নিউইয়র্কে ইহুদি জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোতে সচিব ও কেরানির চাহিদা বাড়তে শুরু করে।

অনেক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করত 'Christian preferred' বা 'Jews please do not apply'। সে বছর ইহুদি সংগঠনগুলো এ নিয়ে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করে। ইহুদিরা বলে, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা এসব বিজ্ঞাপন থেকেই বোঝা সম্ভব।

৫৬৭৯ (১৯১৮-১৯১৯ খ্রি.) সামরিক বাহিনীতে নতুন কিছু রাজমিস্ত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং সেখানে 'Christian preferred' উল্লেখ করা হয়। কেন এমন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হলো , তার কৈফিয়ত জানতে Newton D. Baker-কে তলব করে Louis Marshall-এর নিকট পাঠানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে– এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কয়জনই-বা রাজমিস্ত্রী পেশায় জড়িত!

সৈন্য নিয়োগ বিভাগের দায়িত্বে থাকা Provost Marshall Crowder এক বিবৃতিতে বলেন– 'যারা জন্মসূত্রে আমেরিকান নয়; বিশেষ করে ইহুদিরা, সামান্য কয়েকদিনের পরিশ্রমে একেবারে ভেঙে পড়ে। তাদের পক্ষে সমরিক বাহিনীতে বেশি দিন টিকে থাকা অসম্ভব।' বিষয়টি Louis Marshall-এর কানে পৌঁছামাত্র তিনি Mr. Crowder-কে টেলিগ্রাম করে বিবৃতিটি সরিয়ে নিতে বাধ্য করেন।

ইউনাইটেড শিপিং বোর্ড নতুন কিছু খ্রিষ্টান কর্মী চেয়ে *Times* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে তারা বিজ্ঞাপনটি সংশোধন করে প্রকাশ করে, আগ্রহী প্রার্থীরা যেন আবেদনপত্রে ধর্ম ও জাতীয়তা উল্লেখ করে। কেউ এ নিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছে কি না, তা ভাইভা বোর্ড খতিয়ে দেখে খ্রিষ্টানদের চাকরিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কেন ধর্ম ও জাতীয়তা নিয়ে তারা এত বাড়াবাড়ি করল, তা নিয়ে ইহুদি সংগঠনগুলো কৈফিয়ত দাবি করে।

Kehillah বলে– 'আমি যে ইহুদি, এটা শুধু আমি জানলেই চলবে। বাহিরের মানুষ এসব জেনে কী করবে?' পরে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে দিয়ে আইন পাশ করিয়ে শিপিং কোম্পানিটিকে শাস্তির মুখোমুখি করা হয়।

একই বছর ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম এবং লিবার্টি লোন কমিটি কিছু খ্রিষ্টান শর্টহ্যান্ড লেখক চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। তাৎক্ষণিক Benjamin Strong প্রতিষ্ঠান দুটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। পরে তারা বাধ্য হয়ে বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেয়। এমন বিজ্ঞাপনের জন্য ট্রেজারি সেক্রেটারি McAdoo আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চান।

৫৬৮০ (১৯১৯-১৯২০ খ্রি.) এ বছর থেকে ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপনগুলোতে ইহুদি প্রার্থীদের কথা উল্লেখ করতে সক্ষম হয়। আগের বছর যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠান খ্রিষ্টান কর্মী চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে পারত না, সেখানে এ বছর তারা ইহুদি কর্মী চেয়ে বিজ্ঞাপণ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। এটাই ইহুদিদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচি থেকে যেন ধর্মীয় শিক্ষার রীতিনীতি উঠিয়ে দেওয়া হয়, তা নিয়ে ইহুদিরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। অবশেষে সফলও হয়েছে। তা ছাড়া, ইহুদিদের আন্দোলনের ফলে এ জাতীয় প্রতিটি ঐতিহাসিক বই ও গল্প-কবিতা বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরূপ কিছু নমুনা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

৫৬৬৮ (১৯০৭-১৯০৮ খ্রি.) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাইবেল পাঠ ও বড়োদিন উদ্‌যাপন বন্ধ করার জন্য ইহুদিরা আন্দোলন শুরু করে। গালভেস্টোন, ক্লিভল্যান্ড, এল পাসো এবং ইংগস্টাওন-এর শিক্ষা বোর্ডগুলোকে বাধ্য করে, যেন পরবর্তী বছরের পাঠ্যসূচিতে 'Merchant of Venice' অন্তর্ভুক্ত করা না হয়।

৫৬৬৯ (১৯০৮-১৯০৯ খ্রি.) ইহুদিদের ভীষণ চাপের মুখে পেনসিলভানিয়ার বিদ্যালয়গুলো প্রাত্যহিক বাইবেল পাঠ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। নিউ জার্সির বিদ্যালয়গুলোতে বাইবেল পাঠ শিক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক করা হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের চাপ দেওয়া যাবে না। লুইসিয়ানার বিদ্যালয়গুলোতে বাইবেল পাঠ বন্ধ করতে স্থানীয় সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। বাল্টিমোরে ইহুদি নারী সমিতি শিক্ষাবোর্ডের নিকট দরখাস্ত করে, যেন বিদ্যালয়গুলোতে বড়োদিনের চর্চা বন্ধ করা হয়। ইহুদিদের চাপের মুখে ফিলাডেলফিয়ার শিক্ষা বোর্ড বড়োদিন চর্চা বন্ধ করে দেয়। রবিবারে ইহুদিরা যেন নিজেদের সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত চালু রাখতে পারে, তার অনুমতি চেয়ে নিউইয়র্ক হিব্রু পরিষদ স্থানীয় সরকারের নিকট আবেদন করে।

৫৬৭০ (১৯০৯-১৯১০ খ্রি.) পেনসিলভানিয়ার ব্রিজপোর্ট শিক্ষাবোর্ড সেখানকার বিদ্যালয়গুলোতে প্রার্থনা সংগীত গাওয়া বন্ধ করে দেয়। একই ঘটনা কেনটারি বিদ্যালয়গুলোতেও ঘটে। ক্লিভল্যান্ডের কিছু শিক্ষকের প্রচেষ্টায় 'Merchant of Venice' পুনরায় পড়ানো শুরু হলে একদল চরমপন্থি ইহুদি এপ্রিল মাসের গোড়াতে বিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে জোড়পূর্বক গল্পটি সরিয়ে নিতে বাধ্য করে।

৫৬৭১ (১৯১০-১৯১১ খ্রি.) ক্যালিফোর্নিয়ার ডেট্রইট শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রাত্যহিক বাইবেল পাঠ ও হামদ-নাত গাওয়ার বিরুদ্ধে ইহুদিরা প্রতিবাদ করে। নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে শনিবারের কর্ম দিবস বন্ধ রেখে রবিবার সবকিছু খোলার আইনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

৫৬৭২ (১৯১১-১৯১২ খ্রি.) কনেকটিকাট প্রদেশের হার্টফোর্ড শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মচর্চা বাতিল করা হয়। নিউজার্সির বিদ্যালয়গুলোতে বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় সংগীত বন্ধ করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করা হয়। তিনজন প্রভাবশালী রাবাইয়ের অনুরোধে ম্যাসাচুসেট প্রদেশের রক্সবারি জেলার বিদ্যালয়গুলো থেকে Christmas tree ও খ্রিষ্টীয় সকল চিহ্ন সরিয়ে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে হার্টফোর্ড ও কানেকটিকাট শিক্ষাবোর্ড সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি থেকে 'Merchant of Venice' সরিয়ে নেয়।

৫৬৭৩ (১৯১২-১৯১৩ খ্রি.) টেনসি শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাইবেল বন্ধ করানো হয়। ভার্জিনিয়া প্রদেশের রিচমন্ড শিক্ষাবোর্ড পুনরায় বাইবেলকে নিজেদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। পেনসিলভানিয়ার স্থানীয় সরকারের নিকট আবেদন করা হয়, যেসব শিক্ষক এখনও বাইবেল পড়াচ্ছে, তাদের যেন চাকরিচ্যুত করা হয়। তাদের চাপের মুখে পড়ে শিকাগো ও ম্যাসাচুসেটের শিক্ষাবোর্ড ধর্মীয় শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউ জার্সিতে রবিবার কর্ম দিবস হিসেবে বরাদ্দ করার দরখাস্ত করা হয়।

৫৬৭৪ (১৯১৩-১৯১৪ খ্রি.) আমেরিকান সরকার অভিবাসন বিষয়ে নতুন নীতি প্রণয়ন করে। তখন ইহুদিরা জোড় প্রচেষ্টা চালায়, যেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইন পাশ না হয়।

৫৬৭৫ (১৯১৪-১৯১৫ খ্রি.) ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষাবোর্ডকে কিছু বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, যেন সেগুলো শিক্ষার্থীদের পড়ানো না হয়।

৫৬৭৬ (১৯১৫-১৯১৬ খ্রি.) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে বাইবেল পাঠ বন্ধ করা নিয়ে ইহুদিদের এতসব আন্দোলন এ বছর সফল হয়। এ বছর থেকে ইহুদিরা 'Merchant of Venice'-এর সাথে 'Lamb's Tales' গল্পটিকেও সরিয়ে দেওয়ার আন্দোলনে নামে।

৫৬৭৭ (১৯১৬-১৯১৭ খ্রি.) অভিবাসন আইন নিয়ে ইহুদিরা এ বছর খুব ব্যস্ত ছিল। পরিশেষে সফলও হয়। এই বছর থেকে আমেরিকায় ইহুদিদের প্রবেশে আর কোনো বাধা থাকল না।

১৯১৯ সালের মধ্যে আমেরিকার ১৫০টি শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইহুদিরা Merchant of Venice' ও 'Lamb's Tales' গল্প দুটিকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। শিকাগো শিক্ষাবোর্ডের নিকট ইহুদিদের পাঠানো চিঠির অংশ বিশেষ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

> 'আমরা জানতে পেরেছি, উচ্চমাধ্যমিক অনেক বিদ্যালয়ে এখনও Merchant of Venice নিয়মিত পড়ানো হচ্ছে। আমরা এই ভেবে ভীত হচ্ছি না যে, গল্পটি পাঠ করানোর দরুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ইহুদি শিক্ষার্থীরা মানসিক হিনম্মন্যতার স্বীকার হবে; বরং জ্যান্টাইল সন্তানদের অবচেতন মনে এটি ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক চেতনার জন্ম দেবে। এটা মানতে হবে, শেক্সপিয়র গল্পটি লিখেছেন কয়েক শত বছর আগে। তখনকার এবং আজকের পারিপার্শিক অবস্থা এক নয়। গল্পটি তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এটা কেবল আপনাদের মতো পূর্ণবয়স্করা বুঝতে পারবে; নাবালক বাচ্চার এর কিছুই বুঝবে না।

শেক্সপিয়রকে যেমন আপনারা ভালোবাসেন, তেমনি আমরাও ভালোবাসি। গল্পটির 'Shylock' চরিত্রটি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সত্যি নাবালক সন্তানদের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম দেবে। এই মানসিকতা নিয়ে বড়ো হলে আমরা কখনো একে অপরের বন্ধু হতে পারব না।

আমাদের বিষয়টির গুরুত্ব অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা ইতোমধ্যে এই গল্প ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস হতে বাদ দিয়েছে। আসা করি আপনারাও গল্পটি পাঠের ক্ষতিকর দিকগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে তা অবিলম্বে পাঠ্যসূচি হতে অপসারণ করবেন।'

মজার বিষয় হলো– তারা আগে থেকেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ সেরে রাখত। চিঠি পাঠানো ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা। এটা ঠিক যে, বিদ্যালয়গুলোতে আর এই গল্পটি পড়ানো হবে না। তারপরও কোনো জ্যান্টাইল সন্তান যদি ঘরে বসে এই গল্পটি পাঠ করে, তবে তারা কি আর বাধা দিতে পারবে? মূলত ইহুদিরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, যেন এই গল্পটি সমাজ থেকে মুছে দেওয়া যায়। মানুষ তো এখন আর বই পড়ে না। সিনেমা হলে গিয়ে সময় কাটাতেই বেশি পছন্দ করে। অতঃপর ইহুদিরা গল্পটির মূল কাহিনি যতটা সম্ভব পরিবর্তন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে শুরু করে। কিছু উক্তি বাছাই করে তারা এমনভাবে প্রচার শুরু করে, যেন শেক্সপিয়র তাঁর অমৃত বাণীগুলো ইহুদিদের জন্যই রেখে গেছেন! যেমন :

'হ্যা, আমি একজন ইহুদি। ঈশ্বর কি আমাদের দেখার জন্য চোখ দেননি? তিনি কি আমাদের হাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আবেগ, ভালোবাসা, অনুভূতি কিছুই দেননি?'

এরপর ইহুদিদের রোষানলে পড়ে আরেকটি কালজয়ী নাট্য-উপন্যাস, Macbeth। ধীরে ধীরে এমন আরও অনেক গল্প যে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে, তা সময়-ই দেখিয়ে দেবে। এসব ঘটনা প্রতিদিন-ই ঘটে চলছে। শুধু আমেরিকায় নয়; গোটা পৃথিবীকেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ করার জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যেখানে ইহুদিরা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারছে না, সেখানে কাজ করছে এজেন্ট। আগেই বলেছি, জ্যান্টাইলরা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে অভ্যস্ত নয়; বরং অন্যের অধিকার রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করাই তাদের রীতি। যে উদারপন্থি ও মুক্তমনা নীতিকে আমরা প্রগতির অংশ বলে মনে করেছি, তা-ই আমাদের সর্বহারা করে দিচ্ছে। একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাই পারে একটি জাতিকে আদর্শ ও শালীনরূপে গড়ে তুলতে। যে শিক্ষা নিয়ে আমরা শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তব জগতের মুখোমুখি হব, তার সাথে যদি ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয় না থাকে, তবে একসময় আমরা অসভ্য জাতিতে পরিণত হব। কারণ, তখন আমাদের বিবেকবোধ ও নৈতিকতা বলতে কিছুই থাকবে না। অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ইহুদিদের আরও কিছু কুকর্মের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

৫৬৬৯ (১৯০৮-১৯০৯ খ্রি.) ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইহুদিরা সাব্বাতকে জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে থাকে। ইহুদি উকিলরা অসুস্থতার দোহাই দিয়ে শনিবারের ফৌজদারি মামলাগুলোকে পিছিয়ে দেয়। ব্যবসায়ীগণ এ দিনে নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ রেখে বে-আইনিভাবে সবকিছু রবিবার খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ধীরে ধীরে অনেক আমেরিকান এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

৫৬৭০ (১৯০৯-১৯১০ খ্রি.) ইহুদিরা শনিবারকে রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন প্রতিষ্ঠায় জোর প্রচেষ্টা চালায়। সেইসঙ্গে শুক্রবার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি অফিস-আদালত যেন অর্ধ দিবস করা হয়, সেই আবেদনও করে। কারণ, সাব্বাত শুরু হয় শুক্রবার বিকাল থেকে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়।

৫৬৭১ (১৯১০-১৯১১ খ্রি.) নিউইয়র্কের সুপ্রিমকোর্টে হিব্রু শিরোনামে ইহুদিরা একটি দরখাস্ত জমা দেয় 'Agudath Achim Kahal Adath Jeshurun'। তারা ভেবেছিল, বিচারক সাহেব হয়তো শিরোনামটুকু বাদ দিয়ে বাকি অংশ পড়ে নেবেন, কিন্তু তিনি পুরো দরখাস্ত পুনরায় ইংরেজিতে লিখে আনার কড়া নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, ইহুদিরা শিকাগো নির্বাচন পিছিয়ে দেয়! কারণ, তা শনিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

৫৬৭৩ (১৯১২-১৯১৩ খ্রি.) নিউ জার্সি, বেয়ন, হবকন ও ইউনিয়ন হিলসহ আরও অনেক শহরে ইহুদিরা শনিবার রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

৫৬৭৪ (১৯১৩-১৯১৪ খ্রি.) অভিবাসন বিভাগ ইহুদি কর্মীদের জন্য শনিবার ছুটির ব্যবস্থা করে। ইহুদিদের পশু হত্যা প্রথা the Shehitah-এ বছরই প্রথম আলোচনায় আসে।

Kosher food হলো ইহুদিদের এক ধরনের ধর্মীয় ভোজ, যা বিভিন্ন প্রাণী ও পোকামাকড়ের শরীর দিয়ে তৈরি করা হয়। সরকারি স্কুলগুলোতে একসময় এই খাবার নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ইহুদিরা প্রতিবাদ করে বলে, তাদের অনেক সন্তানও তো এসব স্কুলে অধ্যয়ন করছে, অন্তত তাদের জন্য যেন এই খাবারের বৈধ্যতা দেওয়া হোক। সেই প্রস্তাবনা বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।

৫৬৭৭ (১৯১৭-১৯১৮ খ্রি.) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় শনিবার কেন ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করল, তা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা শুনতে হয়। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইহুদিদের প্রতি অধিক সচেতন হয়।

এভাবে চলতে থাকলে প্রতিবছরের ক্যালেন্ডার এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায়টির সাথে কোনো ধরনের ঝামেলা না বাধে। তবে পৃথিবীতে অনেক ভালো ইহুদি খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা পরিবর্তিত তালমুদের অনুসারী নয়।

কিন্তু এই গোষ্ঠিটি সংখ্যায় খুবই কম। আসলে পয়গম্বর মোজেসের ওপর আসা সেই তাওরাত আজও অক্ষুণ্ন আছে কি না, তা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। বাজারে এর অনেক ভার্সন খুঁজে পাওয়া যাবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, ইহুদিদের এই ভালো জ্ঞাতি ভাইদের কখনো মিডিয়ার সামনে দেখা যায় না; মূলত আসতে দেওয়া হয় না। কারণ, ইহুদিরা চায় না, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত ইহুদিদের মধ্য থেকেই হোক।

ইহুদিদের ধর্মীয় সংগীত 'Kol Nidre' এবং 'Eli, Eli' সম্পর্কে আলোচনা।

সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকার তিনটি শহরের (নিউইয়র্ক, ডেট্রইট, শিকাগো) থিয়েটার হলগুলোতে ইহুদিদের একটি ধর্মীয় সংগীত নিয়মিত পরিবেশিত হতে শোনা যাচ্ছে। প্রতিবার আমাদের এটাই বলা হচ্ছে যে, বিশেষ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গানটি পরিবেশিত হচ্ছে। কিন্তু কারা এই সংগীতটি শোনার জন্য অনুরোধ করছে? এমন মিথ্যাচারের উদ্দেশ্য কী হতে পারে? সংগীতটির নাম হলো Eli।

১৯২০ সালে *Jewish Daily News* পত্রিকায় একজন ইহুদি লেখক একটি আর্টিক্যাল প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ইহুদি বর্ষ ৫৬৮১-কে অরাজকতাময় বর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

> 'নিজেদের জীবনধারায় ইহুদিরা যে একের পর এক ভুল করে চলেছে, তা তারা কখনোই আমলে আনবে না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে তারা যে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে, তা বর্ণণাতীত।'

বিগত বছরে বিশ্বজুড়ে ইহুদিরা যে অরাজকতার জন্ম দিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : প্যালেস্টাইনে বিশৃঙ্খলতা, অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহে হস্তক্ষেপ, নিজ জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, আত্ম-বিভ্রম ইত্যাদি। ইহুদিরা মানসিকভাবে অসুস্থ।

৫৬৮২ সালকে সামনে রেখে বলতে চাই, তাদের আর ইহুদি বলে সম্বোধন না করে ইজরাইলি বলে সম্বোধন করাই শ্রেয়। তাদের বিশ্বাস এই জাতির ভবিষ্যৎ সফলতা কেবল ইজরাইল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সম্ভব এবং এটাই চূড়ান্ত ঠিকানা। ইহুদিদের পররাষ্ট্রনীতির সার সংক্ষেপ এই যে, পুরো পৃথিবী তাদের আধিপত্য ও বশ্যতা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে।

এ জাতির প্রকৃত শত্রু মূলত তারাই, যারা ধর্মের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের মুনাফার পকেট ভারী করছে, যেমন : American Jewish Committe এবং রাজনৈতিক রাবাইগণ। বর্তমানে আমরা এমন এক মহান নেতার জন্য অপেক্ষা করছি, যিনি আমাদের নির্দয়,

স্বার্থপর ও দুর্নীতিবাজ সমাজ থেকে মুক্তি দেবে। একই সঙ্গে ধ্বংস করবেন সে সকল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের, যারা আমাদের ধর্মকে কলুষিত করেছে। প্রকৃত মুক্তি তখনই মিলবে, যখন অন্যের সম্পদ জবরদখল করার পরিবর্তে আমরা পরিশ্রমের মাধ্যমে রুটি-রুজি উপার্জন করতে শিখব।

তখন দেখা যাবে– আমরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আসলে 'ইহুদি' ও 'ইজরাইলি ইহুদি' বিষয় দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মাঝে কিছু বহিরাগত জীবের আগমন ঘটেছে। তাদের সনাক্ত করা হলেও আমাদের নেতাগণ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ তাদের বিশ্বাস, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এ জাতীয় কিছু শক্তিশালী প্রাণীর প্রয়োজন। এই বহিরাগত প্রাণীরা ভবিষ্যতে যে নতুন এক বিতর্কের জন্ম দেবে, তা এখনই বোঝা যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, সত্যকে দমিয়ে রেখে কখনো একতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত একতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে মিথ্যাকে স্থান দেওয়া যাবে না। সত্য যতই কঠিন হোক না কেন, তা সবাইকে মেনে নিতে হবে। একই আদর্শ ইহুদিদেরও হওয়া উচিত। DEARBORN INDEPENDENT যে সত্য প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তার উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক, ইহুদিরা যেন নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। দুই, জ্যান্টাইল সম্প্রদায়গুলো যেন বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীটির সকল ছলচাতুরী সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করে তুলতে পারে।

আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো থিয়েটারের চূড়ায় অঙ্কিত হয়েছে স্টার অব ডেভিডসহ আরও অনেক ইহুদি প্রতিকৃতি। যেকোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে কীর্তন করে গাওয়া হয় ইহুদিদেরই লেখা স্তুতি-সংগীত, যা একসময় অসম্ভব ছিল। তবে Anti-Defamation League-এর ক্ষমতার বলে ইহুদিরা এ কাজ প্রতিটি আজ ছোটো-বড়ো প্রাব প্রতিটি শহরে করে যাচ্ছে।

তাদের 'Kol Nidre' সংগীতটির অর্থ হলো– 'সকল প্রতিশ্রুতি'। ইহুদিদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই সংগীত তালমুদ ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে–

> 'যে ব্যক্তি এই আকাঙ্ক্ষা করে, তার সকল শপথ ও প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য থাকবে না এবং তা পূরণে সে বাধ্য থাকবে না, তবে সে যেন বছরের শুরুতে 'Kol Nidre' সংগীতের চর্চা করে।'

সত্যি বলতে, এই Kol Nidre সম্পর্কে প্রাচীন তালমুদে পৃথক কোনো ঘোষণা আসেনি। ১৯১৯ সালে নিউইয়র্কে অবস্থিত Hebrew Publishing Company কর্তৃক প্রকাশিত 'Festival Prayers (প্রার্থনা সংগীত)' খণ্ডে প্রথমবারের মতো এই সংগীতটির উপস্থিতি পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে ইহুদি সংগঠনগুলো অনুমোদন করে। ১৯১৯ সালে প্রথমবার সংগীতটি যেভাবে প্রকাশিত হয়–

'বিভিন্ন নিবেদিত নামের ওপর কসম কেটে শপথ, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করেছি,
এক প্রায়শ্চিত্র দিবস (ইয়ম কিপুর) হতে অপর প্রায়শ্চিত্র দিবস (ইয়ম কিপুর) পর্যন্ত,
যা পরিপূর্ণ করতে আমরা সবাই বাধ্য ও অনুগত; নতুবা অনুতপ্ত,
তা হতে আজ আমাদের মুক্তি দেওয়া হলো।
আজ হতে আর কোনো শপথ আমাদের নিকট শপথ বলে গণ্য হবে না,
কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণের বাধ্যবাধ্যকতা থাকবে না
এবং কোনো অঙ্গীকারের প্রতি আমাদের আনুগত্য থাকবে না।'

এটা যদি ইহুদিদের রহস্যময় অতীতের পরিচয় বহন করে, তবে তা কখনো অবহেলার চোখে দেখা উচিত নয়। এমন একটি সংগীত যা কখনো তাদের গ্রন্থে ছিল না, কিন্তু ১৯১৯ সালের সংশোধিত খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। তখন বোঝা যায়, এটা নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। ইহুদিদের কাছে এই সংগীতের গুরুত্ব নেহাত কম নয়। বছরের শুরুতে কিছু ইহুদি বেহালা বাদক নিউইয়র্কে হাজির হয় এবং তাদের ঘিরে হাজারো ইহুদি ভক্ত কান্না শুরু করে। বেহালা বাদকের Kol Nidre গাওয়ার মধ্য দিয়ে ভক্তদের কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটে। শেষ মুহূর্তে তারা এমনভাবে কাঁদতে শুরু করে, যেন নির্বাসিত জনগোষ্ঠী বহু বছর পর নিজ ভূমিতে ফিরে এসেছে।

এই সংগীত ইহুদিদের হৃদয়ের পবিত্র আবেগ ও ভালোবাসার একটি অংশ। তবে এই সংস্কৃতি জ্যান্টাইল সমাজ ব্যবস্থার জন্য কতটা হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এই সংগীতের প্রতিটি বাক্যের ওপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত না করলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এর সাথে যে বাদ্যসুরের চর্চা করা হয়, তা প্রাচীন ও জনপ্রিয়। Jewish Encyclopedia-তে এর প্রেক্ষাপট যেভাবে বণর্না করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়– চাইলেও এ সংগীত অর্চনা বন্ধ করা সম্ভব নয় এবং ইহুদিদের পাঠ্যপুস্তক থেকে এটি মুছে দেওয়া অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, সময়ের প্রয়োজনে ইহুদিরা এর প্রতিটি বাক্য ও শব্দ বিন্যাসে পরিবর্তন আনতে পারে। কারণ, নিয়মিত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করাও ইহুদি সংস্কৃতির একটি অংশ।

যদি এমন হতো, ইহুদিদের প্রার্থনা সংগীতে অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া সকল ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে, তবে তা ভিন্ন বিষয় ছিল। মানুষ স্বভাবতই ধর্মের প্রতি উদাসীন এবং মন্দ কাজের প্রতি অধিক আগ্রহী। তবে পুনরায় যখন ধর্মের কথা স্মরণ হয়, তখন সৃষ্টিকর্তার প্রতি পূর্বের সকল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায় এবং লজ্জিত হয়। এমনটা সব ধর্মেই দেখা যায়।

কিন্তু ইহুদিদের প্রার্থনা সংগীত Kol Nidre যেন অগ্রিম ঘোষণা দিয়ে রাখছে– ভবিষ্যৎ যেকোনো প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পালনে তারা আর বাধ্য থাকবে না। এটা যদি সত্যি ইহুদি ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ হয়, তবে তাদের সঙ্গে কখনোই ব্যবসায়িক বা সামাজিক লেনদেনে যাওয়া উচিত নয়।

Kol Nidre-এর প্রকৃত প্রেক্ষাপট মূলত ব্যাবিলন থেকে শুরু। সেখানে ইহুদিদের দীর্ঘ একটি সময় বন্দি অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল, যা তাদের মনে ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল।

কী উদ্দেশ্য নিয়ে Kol Nidre-এর আবির্ভাব, তা অনেকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। নতুন একটি ভালো ব্যাখ্যা সামনে দাঁড়ানো মাত্রই পূর্বের ব্যাখ্যাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে সবাই একটি বিষয়ে একমত, বহু শতাব্দী ধরে রক্তপিপাসু খ্রিষ্টান জাতি পবিত্র যিশুর নামে ইহুদিদের ওপর যে বর্বর নিপীড়ন চালিয়েছে এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে, তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসেবে তারা এই সংগীত-অর্চনা সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। রক্ত-পিপাসু খ্রিষ্টানরা যদি ইহুদিদের খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে, তবে মুখে তারা সে বশ্যতা স্বীকার করলেও মন থেকে কখনো করবে না।

এই সংগীতের সঠিক উৎপত্তিকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ মতোভেদ রয়েছে। ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর Cleveland Jewish World সমাচার থেকে এই সংগীতের ওপর একটি কলাম প্রকাশ করা হয়, যার অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো–

> 'অনেকে বিশ্বাস করে, স্পেনে যখন ইহুদিদের ওপর প্রথম নির্যাতন শুরু হয়, তখন তারা Kol Nidre সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তারা নিয়মিত বাঙ্কারে জমায়েত হতে শুরু করে এবং দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে এই সংগীত রচনা করে, যা স্বীকার করে আগামী বছরগুলোতে ইহুদিদের যে শপথ বা প্রতিশ্রুতি গ্রহণে বাধ্য করা হবে, তাদের নিকট এর কোনো মূল্য থাকবে না...'

একসময় খ্রিষ্টানরা যখন এই গুপ্ত অবস্থানের কথা জেনে যায় এবং বাঙ্কারের নিচ থেকে শত-সহস্র ইহুদিদের খুঁজে বের করে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতে শুরু করে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য ইহুদি সদস্যরা Kol Nidre-কে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ বলে গ্রহণ করতে শুরু করে।

এ সকল বিবৃতির একটিও সঠিক নয়। এই সংগীতের ইতিহাস আরও পুরোনো। স্পেনিশ নিপীড়নেরও বহু শতাব্দী পূর্বে ইয়ম কিপুরের কোনো এক রাতে এই সংগীত রচিত হয়ছ। নবম শতাব্দীতে রাবাই Arman Goun-এর লেখা একটি সংগীতগ্রন্থে প্রথমবারের মতো এর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এমন একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন, যা দ্বারা প্রমাণ করতে চান, ইয়ম কিপুরের রাতে সৃষ্টিকর্তার নিকট তারা যে সকল প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে, তার কোনোটি পালনে আজ্ঞাবহ থাকবে না। তার সূত্র অনুযায়ী এটা Kol Nidre ছিল না; বরং Kol Nidrim-এর সঠিক রচনাকাল নিয়ে অসংখ্য বিতর্ক থাকলেও সবাই এই মর্মে একমত, তালমুদের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্করণ এই সংগীতটিকে পরিপূর্ণ রূপে সমর্থন করে।

এবার আসি ইহুদিদের খুব জনপ্রিয় একটি হামদ 'Eli, Eli' প্রসঙ্গে। Book of Psalm-এর বাইশ নম্বর হামদের প্রথম শ্লোকের প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করে Eli Eli নামটি চয়ন করা হয়েছে। খ্রিষ্টান দেশগুলোতে এটি 'Cry of Christ on the Cross' নামে পরিচিত।

আশা করি আপনাদের Vaudeville Genre-এর কথা মনে আছে, যা দ্বারা আমেরিকার পুরো থিয়েটারশিল্পকে ইহুদিরা নিজেদের করে নিতে সক্ষম হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইহুদি মালিকানাধীন থিয়েটার ও সিনেমা হলগুলোতে নাটক বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে এই হামদটি একবারের জন্য হলেও পরিবেশন করা হতো। উপস্থিত দর্শকদের বলা হতো, বিশেষ অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ সংগীত পরিবেশন করা হচ্ছে। কিন্তু কারা এ সংগীত পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করছে, তা কারও মগজে ঢুকত না। অবশ্য এ নিয়ে তেমন কেউ চিন্তাও করত না।

সত্যি বলতে, বিশেষ কোনো অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নয়; বরং বিশেষ এক সংগঠনের ক্ষমতাবলে এই সংগীতটি নিয়মিত পরিবেশন করা হতো। তারা হলো Kehillah। এই হামদের প্রতি জ্যান্টাইলদের ন্যূনতম কোনো আগ্রহ নেই, তবুও জোর করে তা শোনানো হচ্ছে। হয়তো জ্যান্টাইলদের ওপর এটা বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলছে না ঠিক, তবে মানসিকভাবে তা ইহুদিদের উসকে দিচ্ছে– যেন তাদের অনাগত সন্তানরা ছোটোকাল থেকেই জ্যান্টাইলদের বিরুদ্ধে এক বিষম ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে।

Eli Eli কখনো ধর্মীয় সংগীত হতে পারে না। এই সংগীত জ্যান্টাইলদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ। নিউইয়র্কের যে কফি হাউজগুলোতে ইহুদিরা বলশেভিক বিপ্লবের পরিকল্পনা করত, সেখানে নিয়মিত এ গানের চর্চাও করত। রাশিয়া ও পোল্যান্ডসহ ইউরোপের অসংখ্য দেশে এই সংগীত চর্চার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে তারা যত পত্রিকা বা ম্যাগাজিন প্রকাশ করত, সেখানে এর বাক্যগুলো নিয়মিত ছাপানো হতো। সহজভাবে বলতে গেল, খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে এই সংগীত ব্যবহার করা হয়। এটা তাদের মস্তিষ্কে মর্ফিনের মতো কাজ করে। গানটি মূলত ইডিশ ভাষায় রচিত। এর অনূদিত অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

'হে খোদা! হে খোদা! কেন আমাদের করেছ পরিত্যক্ত?
আগুনের তপ্ত শিখায় তারা আমাদের করেছে অগ্নিদগ্ধ,
সর্বত্র আমাদের নিয়ে করেছে পরিহাস,
তথাপি ধৃষ্টতা করিনি ছেড়ে যেত সে ঐশী গ্রন্থ
যাতে আছে আমাদের বাণী ও পথ নির্দেশিকা।
হে খোদা! হে খোদা! কেন আমাদের করেছ পরিত্যক্ত?
দিন-রাত কেবল এই প্রার্থনা করি,
যেন ধর্মের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারি
আরও প্রার্থনা করি, যেন তুমি আমাদের পুনরায় রক্ষা করো!

আমাদের সকল পিতামহের দোহাই করে বলছি!
আমাদের প্রার্থনা ও আর্তনাদ ফিরিয়ে দিয়ো না,
কেবল তোমার করুণা তে আমরা রক্ষা পাব। কেননা ঈশ্বর তুমি, কেবলই এক।
শুনো ইজরাইলবাসী, ঈশ্বর শুধু আমাদের,
তিনি কেবলই একজন!'

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সংগীত নিয়মিত প্রতিটি থিয়েটার ও সিনেমা হলে পরিবেশন করা হতো। আর অবুঝ খ্রিষ্টানরা অর্থ খরচ করে সেই হলগুলোতে এসব খাদ্য গিলতে যেত। বিগত শতাব্দীর কয়েক দশক ধরে এটি নিয়মিত পরিবেশিত হওয়ার ফলে এই সংস্কৃতি আমেরিকার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। তারপর তা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পৃথিবীজুড়ে। আজ হয়তো এই সংগীত সিনেমা হলগুলোতে নিয়মিত পরিবেশন করা হয় না, কিন্তু ইহুদিদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নানান প্রতিকৃতি সাংকেতিক চিহ্ন আকারে বিশ্বের অসংখ্য অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব প্রতিকৃতি ও সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ সাধারণ জ্যান্টাইলরা বুঝতে না পারলেও ইহুদি সন্তানরা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে। এর মাধ্যমে তারা নিজ সম্প্রদায়কে জানান দিচ্ছে আমরা আছি, থাকব এবং আমরাই শক্তিশালী।

যারা Eli Eli সংগীতটি শুনেছে, তারা হয়তো ইডিশ ভাষা না জানার দরুন এর অর্থ বুঝতে পারেনি। তবে এর সাথে বাদ্যযন্ত্রের যে সুরলা ধ্বনি পরিবেশন করা হয়, তা যে কতটা হৃদয়স্পর্শী, তা হয়তো অনেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। এখানে বলা হয়েছে, আগুনের তপ্ত শিখায় 'তারা' আমাদের পুড়িয়ে মেরেছে এবং সর্বত্র করেছে পরিহাস। এই তারা দিয়ে কাদের বোঝানো হচ্ছে? অবশ্যই জ্যান্টাইল জাতিদের! হৃদয়স্পর্শী সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের সাথে এ সংগীত গাওয়া সময় যখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন কি মনে হয় না– ইহুদিরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছে এবং এ জন্য তারা পূর্ণরূপে প্রস্তুত!

প্রকৃতপক্ষে জ্যান্টাইলদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের বহু বছরের প্রতিক্ষিত যুদ্ধ যে ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তা চারদিকে তাকালেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ইহুদিদের প্রটোকলসমূহের কতটুকু অংশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, এই যুদ্ধ তার একটি বড়ো ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজকের জ্যান্টাইল সমাজ যে চলচ্চিত্র ও সংগীত সাধনায় মেতে উঠেছে, তা মূলত ইহুদিদের সংস্কৃতি চর্চা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ইহুদি সমাজে ঘেটো ব্যবস্থা

পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি ও কাহালভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ইহুদিরা কতটা অনুগত, তা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রতিটি বিষয় ইহুদিদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ, যা আজ পর্যন্ত নিজেদের রক্ত প্রবাহে অক্ষুণ্ন রেখেছে। একই কথা পুনরায় বলার বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে।

প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশাসন কখনো এক নয়। যখন কোনো মানব সম্প্রদায় তাদের আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক জীবনশৈলীকে বংশপরম্পরায় বহন করে থাকে, তখন তাকে বলা হয় ঐতিহ্য। এটা মূলত অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অপরদিকে, ধর্মীয় অনুশাসন হলো সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জীবনবিধান। একজন মানুষ কীভাবে তার প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করবে, ভালো ও খারাপের পার্থক্য বুঝবে এবং সকল কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তার শাশ্বত পাথেয় হলো ধর্মীয় অনুশাসন। এটা মূলত গ্রন্থকেন্দ্রিক।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দস্যুর আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন, জীবিকার তাগিদ ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ যখন তার জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়, তখন নতুন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় জীবন প্রবাহে পরিবর্তন আসবে এটাই স্বাভাবিক। এ কারণে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সর্বদা প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল। শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছে– এমন অসংখ্য নজির পৃথিবীতে পাওয়া যাবে। এ কারণে খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম আন্তর্জাতিক ধর্মে রূপলাভ করেছে। যদি কোনো সামাজিক রীতিনীতি বা প্রাচীন ঐতিহ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। এ কারণে তাদের মাঝে পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি বলতে কিছু ছিল না। পৃথিবীর যে অংশের মানুষের সাথে তারা বসবাস করেছে, সেখানেই তারা মিশে গেছে। মুসলিম, খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজক এবং ভিন্ন ধর্মের মানুষ একই পাড়ায় বসবাস করেছে, কিন্তু তাদের মাঝে সৌহার্দ্যের কোনো অভাব ছিল না। সামান্য কিছু বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হলেও তা অল্পতে শেষ হয়ে যেত।

এবার ইহুদিদের সম্পর্কে আসি। ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সামাজিক রীতিনীতির গুরুত্বই ইহুদিদের নিকট অধিক বেশি। এ কারণে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন এনেছে। তবে যাযাবর জাতি হয়েও যে ইহুদিরা আজ অবধি নিজেদের জ্যান্টাইল সম্প্রদায় হতে অচ্ছুত রাখতে পেরেছে, এ জন্য অবশ্যই প্রসংশা করা উচিত।

এর পেছনে অবশ্য ইহুদিদের বিশেষ একটি সমাজ ব্যবস্থার অবদান রয়েছে, যার নাম 'ঘেটো'। এটি অনেকটা গ্রাম বা মহল্লার মতো, যেখানে সংঘবদ্ধ উপায়ে বসবাসের জন্য গড়ে তোলে পৃথক কোনো উপনিবেশ। যতদিন পর্যন্ত না ইজরাইল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন ইহুদিরা এই উপায়ে বসবাস করবে– এটাই ছিল প্রতিজ্ঞা।

এ সম্পর্কে নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কের পাশে অবস্থিত Congregation Shearith Israel সিনাগগটির রাবাই David de Sola Pool তার একটি বিবৃতিতে বলেন–

> 'ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। ইহুদি জাতীয়তাবাদের প্রকৃত স্বাদ কেবল এই সমাজ ব্যবস্থার মাঝেই নিহীত। মুখে দাড়ি রাখা, মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা, ধর্মীয় বই সঙ্গে রাখা, দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তায় হাঁটা ও সাব্বতাসহ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করা কেবল এই সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণেই সম্ভব হচ্ছে।'

অপর একটি বিবৃতিতে রাবাই Dr. M. H. Segal বলেন–

> 'শেষ বিশ্বযুদ্ধটি পোল্যান্ড ও লিথুনিয়ায় বসবাসরত ইহুদিদের পুনরায় তাদের পূর্ব সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে ইহুদির অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। এই অভিবাসীরা পৃথিবীর যেখানে গিয়েছে, সেখানেই ঘোটো সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জোড় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির কল্যাণে ইহুদিরা আজও নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সগর্বে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।'

নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়তা টিকিয়ে রাখার অধিকার পৃথিবীর প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর আছে। কিন্তু সমস্যা হয় যখন এই পৃথক জাতিসত্তা নীতি সহ্যের চরমসীমা অতিক্রম করে এবং স্বাধীন একটি সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার আন্দোলনে Israel Friedlaender হলেন অন্যতম এক পথিকৃৎ। ১৯০৯ সালে The Problem of Judaism in America শিরোনামে তিনি একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেখানে বলেন–

'যেকোনো স্বাধীন রাষ্ট্রে ইহুদিবাদ প্রতিষ্ঠার কিছু উপায় আছে–

১. অ্যান্টি-সেমিটিজম ছড়িয়ে দিতে হবে।
২. ইহুদি অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
৩. স্বাধীন দেশগুলোতে ঘটো সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে।'

কিছুদিন পর তিনি একটি আর্টিক্যাল প্রকশ করেন, যার নাম 'The Americanization of the Jewish Immigrant।' সেখানে তিনি বলেন–

> 'যতই অনাকর্ষণীয় বা কুৎসিত হোক না কেন, আমাদের প্রাচীন ও সেকেলে পোশাক রীতি বজায় রাখা উচিত। পৃথিবী যতই আধুনিক হোক না কেন, আমরা প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে সরে আসতে পারি না।'

তার পরামর্শে সে সময় পোল্যান্ড থেকে প্রায় ২,৫০,০০০ ইহুদি অভিবাসী হিসেবে আমেরিকায় প্রবেশ করে, যাদের পোশাক-আশাকে ছিল সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি প্রজন্ম যেন এই সংস্কৃতিকে নিজেদের রক্তে ধারণ করে বড়ো হয়, সে জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ইহুদি সন্তাদের এ জাতীয় পোশাক পরিধান করতে বাধ্য করা হয়। আগেই বলেছি, যদি এমন হতো– তারা কেবল নিজেদের নিয়ে পড়ে আছে; ইহুদিদের সামাজিক রীতিনীতি অন্যান্যদের জীবন-প্রবাহে কোনো সমস্যা তৈরি করছে না, তবে এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু দিনে দিনে ইহুদিরা যে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে উঠছে, তা চতুর্দিকে চলমান বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

যেমন : বেশ কিছুদিন আগে আমেরিকার এক বিজ্ঞাপনী সংস্থা তার ইহুদি মক্কেলের জন্য একটি বিজ্ঞাপন তৈরি করে, যেখানে তারা 'আমেরিকানিজম' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করে। তৎক্ষণাৎ এই খবর Anti-Defamation League ও B'nai B'rith সংগঠন দুটির নিকট চলে যায়। তারা বিজ্ঞাপন সংস্থাটিকে মাফ চাইয়ে ছাড়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করে দেয়, যেন এমন ভুল দ্বিতীয়বার না হয়।

ইহুদিরা বিশ্বাস করে, সংখ্যায় অতি অল্প হয়েও তাদের যে শক্তি, তা কেবল ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার ফলেই সম্ভব হয়েছে। যদি ঘেটো সংস্কৃতি সমাজ থেকে হারিয়ে যায়, তবে এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিও হুমকির মুখে পড়বে। যে আধ্যাত্মিক ও অতিমানবীয় শক্তি তারা অর্জন করেছে, তা খড়কুটার ন্যায় দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই এ সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্ব বর্ণণা করতে গিয়ে রবাই David de Sola Pool বলেন–

> 'আমাদের নতুন প্রজন্মগুলো এমন সব পারিপার্শিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বড়ো হচ্ছে, যেখানে ধর্মীয় অনুশাসনের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই। চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়, আগামী দিনগুলোতে এই অনুশাসন মেনে চলা

প্রতিটি ইহুদির জন্য আরও অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। নিজ জাতিসত্তার প্রকৃত পরিচয় পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আমাদের পুনরায় মধ্যযুগীয় ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত; নতুবা একদিন আমরা খড়কুটার ন্যায় দুর্বল হয়ে পড়ব।'

'The beginning of the decay' আর্টিক্যালটিতে Israel Friedlaender উল্লেখ করেন–

'ইহুদিদের ধর্মীয় ও জাতিতাত্ত্বিক অধঃপতন সেদিন থেকে শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে তারা ঘেটো সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে জ্যান্টাইলদের সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে।'

কীভাবে এই অধঃপতনের সূচনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে David de Sola Polo বলেন–

'জ্যান্টাইলরা যেভাবে তাদের মস্তক অনাবৃত রেখে প্রার্থনা করে, ইহুদিরাও আজ একই উপায়ে প্রার্থনা করছে। হিব্রু ভাষাকে উপেক্ষা করে অন্যদের ন্যায় তারাও আজ ইংরেজিতে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করছে। সাব্বাতের গুরুত্ব আমাদের অনেকের নিকট বহুলাংশে কমে গেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে আজ যে সংগীত ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও জ্যান্টাইলদের হাতে তৈরি হচ্ছে।'

এ জন্য Mr. Friedlaender তার বিভিন্ন বিবৃতিতে বলেছেন–

'ইতিহাসজুড়ে যে সকল ধর্মীয় সহিংসতার দরুন আমরা অসংখ্যবার রক্তাক্ত হয়েছি, তা একদিক থেকে আমাদের অনেক উপকারও করেছে। এটা আমাদের বুঝিয়েছে, জাতীয় একতা ও জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের গুরুত্ব কতটুকু। সংখ্যায় অধিক হয়েও কেবল একতার অভাবেই যে অনেক জাতি বিলিন হয়ে গেছে, এমন অনেক উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালেই পাওয়া যায়। যখনই আমরা জাতীয় স্বার্থকে ছোটো করে ব্যক্তি স্বার্থকে বড়ো করে দেখছি, তখনই বিপদে পড়তে হয়েছে। সে সময় সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। কারণ, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই নিজেদের শক্তিশালী করতে আমাদের পুনরায় ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় ফিরে আসতে হবে।'

Cyril M. Picciotto তার আর্টিক্যাল 'Conceptions of the State and the Jewish Question'-এ উল্লেখ করেন–

'আধ্যাত্মিকতা হরিয়ে গেলে আর কখনো ইহুদিবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয়, যারা সবাইকে ধর্মের পথে আহ্বান করবে এবং ধর্মীয় অনুশাসনে উৎসাহিত করবে।

আরেকটি দল থাকবে রাজনৈতিক সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যেকোনো ধ্বংসাত্মক কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত থাকবে। সাম্প্রতিক বলশেভিক বিপ্লব এমনই একটি উদাহরণ।'

রাবাই Segal তার আর্টিক্যাল 'The Future of Judaism'-এ উল্লেখ করেন–

'আগাগোড়া ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ যে বিজাতীয় সমাজব্যবস্থায় আজ আমরা বসবাস করছি, তার চেয়ে মধ্যযুগীয় নিপীড়িত সমাজব্যবস্থা অনেক মধুর ছিল। নির্যাতনের স্বীকার হলেও সে সমাজব্যবস্থা আমাদের শিখিয়েছে– কীভাবে পারস্পরিক সম্প্রিতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়।'

তিনি আরও বলেন–

'কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও অনুশাসন মেনে চলা যেন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে চলে যায়, তবে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হবে এটাই স্বাভাবিক। উঁচু পদগুলোতে সংখ্যালঘুরা জায়গা করে নিতে না পারলে একদিন তারা হারিয়ে যাবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে আজও অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেখা মেলে, যারা বহু বছর ধরে সেখানে টিকে আছে। এর কারণ, জাতীয়তাবাদ নীতি এবং সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা। কেবল নির্যাতন-নিপীড়নে একটি জাতি ধ্বংস হয় না, প্রকৃত ধ্বংস হয়– যখন তারা নিজেদের শিকড় হারিয়ে ফেলে। এ কারণে বলতে চাই, মধ্যযুগীয় ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপায় নেই।'

আশা করি, ইহুদিদের নিকট ঘেটোভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু, তা আপনারা বুঝতে পারছেন। তবে একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে ইহুদিদের প্রত্যেকটি কাজের মাঝেই দুমুখো নীতির ছাপ খুঁজে পাবেন। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বাইবেল পাঠ উঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিজ সন্তানদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাশ করেছে– গির্জায় যাওয়া কিংবা ধর্মীয় বই পাঠে খ্রিষ্টান অভিভাবকরা সন্তানদের জোর করতে পারবে না, কিন্তু নিজেদের বেলায় ঘটেছে এর উলটো। সম-অধিকারের নামে ইহুদিরা নারী সমাজকে দিয়ে উগ্রতার চাষ করাচ্ছে, কিন্তু তারা পুরো পরিবার এক হয়ে ঠিকই সাব্বাত পালন করছে। জ্যান্টাইল তরুণদের শরীরে আধুনিকতা ও নাস্তিকতার রং ছিটিয়ে দিলেও নিজেদের জন্য বেঁধে দিয়েছে ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

আসলে জাতীয়তাবাদের চেতনায় ইহুদিরা নিজেদের অবস্থান যতটা শক্ত করতে পেরেছে, জ্যান্টাইল সমাজ তা পারেনি। তবে একই ভূখণ্ড যে বহুজাতিক মানুষ একত্রে বসবাস করতে পারে না– এমনটা ভাবা কখনো উচিত নয়। কারণ, পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে শ'খানেক মানুষ একত্রে বসবাস করছে। এমনকী তাদের রয়েছে বহুরূপী ভাষা; তবুও তারা শান্তিতে বসবাস করছে! তাহলে ইহুদিরা কেন পারবে না? আসলে সমস্যাটা মানসিকতায়।

আজ পর্যন্ত ইহুদিদের যতজন সদস্য এই মানসিক সমস্যা হতে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তারাই আমাদের সাথে আনন্দচিত্তে মিশে যেতে পেরেছে। তাই বলে তারা যে, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে তা কিন্তু নয়। আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত উঠাবসা করলেও তারা কখনো সাব্বাত পালনে ছাড় দেয় না এবং উৎসবের দিনগুলোতে সিনাগাগে যাওয়ার কথা ভুলে যায় না।

তবে ইহুদিদের অধিকাংশ সদস্য এই চেতনা গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস, এই জাতীয়তাবাদ কখনো ইউরোপ-আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সাময়িক সময়ের জন্য বাধ্য হয়ে ইহুদিরা এই অঞ্চলগুলোতে খুঁটি গেড়ে বসলেও দ্রুতই তাদের জেরুজালেম ফিরে যেতে হবে; নতুবা ইহুদিদের আত্মা পরিপূর্ণতা পাবে না এবং মহান মসিহের সাথে সাক্ষাৎ মিলবে না। তাই খুব সুচতুর উপায়ে তাদের জ্যান্টাইল সমাজে কাজ করে যেতে হবে। ঠিক যেমন Cyril M. Picciotto বলেছেন– 'একটি দল থাকবে যারা নিয়মিত ধর্মের প্রতি আহ্বান করবে; দ্বিতীয় দলটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক চালিয়ে যাবে এবং শেষ দলটি ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর শক্তিধর সব রাষ্ট্রের পতন ঘটাবে, যা জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার পথ সহজতর করবে।'

ইহুদিদের কিছু গুপ্ত সংগঠনের পরিচয়

অনেকে বলে– ইহুদিদের গুপ্ত সংগঠনগুলো চারপাশ থেকে আমাদের অক্টোপাসের মতো পেচিয়ে ধরেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যখন এমন কয়েকটি সংগঠনের নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তারা কিছুই বলতে পারে না। The Jewish Kehillah, American Jewish Committee ও B'nai B'rith-এর নাম কয়জন শুনেছে? ভালোভাবে জরিপ করলে এক শতাংশ মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা এদের নাম পর্যন্ত শুনেছে। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নে তাদের রয়েছে অসীম ক্ষমতা।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী– ১৯২০ সাল পর্যন্ত আমেরিকাতে তাদের ৬,১০০টি সংগঠন গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে ৩,৬৩৭টি কেবল নিউইয়র্কে-ই অবস্থিত। তাদের যে সংগঠনটির সঙ্গে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিচিত তা হলো– B'nai B'rith। সংগঠনটির আরও এক নাম আছে– Independent Order of B'nai B'rith,

যার সদর দপ্তর শিকাগোতে অবস্থিত। ১৮৪৩ সালে Henry Jones-এর হাত ধরে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। Mr. Jones একবার তার কিছু বন্ধুর সঙ্গে এসেক্সের কোনো মদের দোকানে বসে এমন একটি সংগঠন তৈরির পরিকল্পনা করেন, যা বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। সংগঠনটির নাম হিব্রুতে করা হয় B'nai B'rith; অর্থাৎ ভাইদের চুক্তিনামা। পরিচালনা পর্ষদে থাকা সবাই একে অন্যকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে থাকে। ইতোমধ্যে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠান ভারত, প্যালেস্টাইন, পারস্য, আরব ও ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে গেছে। সাম্প্রাদায়িকতার বিষ ঢেলে দিয়ে প্রতিটি দেশে ইহুদিরা যে অন্তর্কোন্দলের জন্ম দিয়েছে, তার শেষ কোথায় তা কেউ জানে না।

তাদের প্রতিটি সংগঠনকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করছে Alliance Israelite Universal। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জমজ ভাইয়ের মতো Kehillah ও Jewish Committee সংগঠন দুটি গড়ে ওঠে। তখন General Bingham মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের ক্ষমতায় ছিলেন। তার নির্দেশে নিউইয়র্কে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ওপর তদন্ত শুরু হয়।

উনিশ শতাব্দীর শুরুতে একদল আমেরিকান পর্ন বাণিজ্যে মেতে ওঠে। শিশু পর্ন থেকে শুরু করে তারা সব ধরনের পর্ন নির্মাণ করত। সেখানে সাদা চামড়ার মেয়েদের বিশেষভাবে ব্যবহার করা হতো। এই পুরো অপরাধ চক্রটিকে তখন বলা হতো– 'White Slave Traffic'। তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হয়, এই অপরাধ চক্রের সাথে জড়িত ৫০ ভাগেরও অধিক সদস্য হলো ইহুদি। এই রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পরপরই তাদের গুপ্ত সংগঠনগুলো নড়েচড়ে বসে।

ইহুদিরা চায় না বিশ্ববাসী তাদের কু-কর্মের কথা জেনে যাক। তারা Mr. Bingham-কে চাপ দিতে শুরু করে, যেন এ নিয়ে আর কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করা না হয়। সামনের দিনগুলোতে তাদের যেন এ জাতীয় অযাচিত কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়, সে জন্য ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় American Jewish Committee। পরে এর শাখা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর আরও বহু দেশে।

'Kehillah' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'Kahal' শব্দ থেকে, যার অর্থ সম্প্রদায়, জনসমাবেশ বা নির্বাচিত সরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি আলোচনার মধ্য দিয়ে পোল্যান্ড ও রুমানিয়াতে Kahal প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তা নিউইয়র্কেও বিস্তার পায়। অর্থাৎ আমেরিকায় বসবাসরত খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জন্য রয়েছে পৃথক বিচারব্যবস্থা। পৃথিবীতে সংগঠনটির যতগুলো শাখা রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো নিউইয়র্কের শাখাটি। ক্যাথলিকদের জন্য ভ্যাটিকান, মুসলিমদের জন্য মক্কা এবং ইহুদিদের জন্য নিউইয়র্ক একই অর্থ বহন করে। এই শহরটি জেরুজালেমের চেয়েও অধিক নিরাপদ। সংগঠনটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হলো–

'নিউইয়র্কে ইহুদিদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।'

এটি মূলত ইহুদিদের একটি মৈত্রী সংগঠন। নিউইয়র্কে গড়ে উঠা ইহুদিদের বিভিন্ন ব্যাবসা, শিল্প, ব্যাংকিং, গুপ্ত, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও স্বেচ্ছা সংগঠনগুলো এর সদস্য। সংগঠনটি যতটা না রক্ষণাত্মক, তার চেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক। পুরো নিউইয়র্ককে তারা ১৮টি জেলায় বিভক্ত করেছে এবং প্রতিটি জেলাকে কেন্দ্র করে নতুন কিছু ঘেটো গড়ে তুলেছে। এখান থেকে পাশ হওয়া আইনগুলো পৌঁছে যায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলা অফিসে।

প্রথম বছর ২২২ টি সংগঠন Kehillah-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৭৪টি সিনাগাগ, ১৮টি দাতব্য সংস্থা, ৪২টি সমবায় সংগঠন, ৪০টি ক্লাব, ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৯টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ৯টি সংগীত প্রতিষ্ঠান, ৯টি জায়োনিস্ট সংগঠন ও ৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পরবর্তী বছর আরও ২৩৮ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ১৩৩ টি প্রার্থনা গৃহ, ৫৮ টি ক্লাব সংগঠন, ৪৪ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ৩ টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিবছর-ই এর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এর কত হাজার সদস্য রয়েছে, তা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। এত বড়ো একটি সংগঠন হওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ Kehillah সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। প্রথম জায়োনিস্ট সম্মেলনে Judha L. Magnes সংগঠনটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন–

'ইহুদিদের স্বার্থ, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ধরনের একটি সংগঠন গড়ে তোলা আবশ্যক।'

তার এই বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে রাবাই Asher উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন–

'গোটা আমেরিকার স্বার্থ এক, আর আমাদের স্বার্থ হবে আরেক।'

১৯১৭-১৮ সালে নিউইয়র্কের একটি অ্যাজেন্সি সেখানে বসবাসরত ইহুদিদের জনসংখ্যা প্রকাশ করে। সেখানে দেখানো হয়– ম্যানহ্যাটন– ৬,৯৬,০০০, ব্রোকলাইন– ৫,৬৮,০০০, ব্রোনক্স– ২,১১,০০০, কুইন্স– ২৩,০০০, রিচমন্ড– ৫,০০০ সর্বমোট ১৫,০৩,০০০ জন ইহুদি। এরা প্রায় তিন বছর আগে নিউইয়র্ক শহরে বাস করত। এবার ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ককে ১৮টি জেলা ও ১০০টি ঘেটোতে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই ঘেটোগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বিভাজন রয়েছে। যেমন : বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, আবাসিক এলাকা ইত্যাদি। West Side and Harlem District-এ তাদের আবাসিক ঘেটোগুলো অবস্থিত।

১৯১৫ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিউইয়র্কের প্রতি বর্গমাইলে ১৬,০০০ মানুষ বসবাস করত, যার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫,৩৩৩ জনই ছিল ইহুদিদের সদস্য। কিছু কিছু জায়গায় বর্গমাইল প্রতি ইহুদিদের জনসংখ্যা ছিল ২০,০০০-৩০,০০০-এর বেশিও। বোঝাই যাচ্ছে, এই শহরে তাদের সদস্য সংখ্যা কতটা সমৃদ্ধ।

মূলত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের সদস্যদের এখানে জড়ো করা হয়েছিল, যেন মার্কিন প্রশাসনের বিশেষ নজর আকর্ষণ করা যায়। পরে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া ও পোল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি হলেও আমেরিকার সকল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু নিউইয়র্ক। তাই এই শহরটিকে নিয়েই ইহুদিদের এত পরিকল্পনা। কেউ যদি আমেরিকার সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে চায়, তবে নিউইয়র্ক শহর কেন্দ্র করেই করতে হবে। তাই আজ হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাদে এই শহরের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ইহুদিদের দখলে।

আমেরিকার প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন ইহুদি American Jewish Commitee-এর সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কোথাও যদি তাদের ৩০ থেকে ৭৫ জনের একটি গোষ্ঠী থাকে, তবে তা পরিচালনার জন্য অবশ্যই একজন দলপতি, রাবাই বা অফিসার থাকবে, যে Kehillah-এর প্রধান সদরদপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। মজার বিষয় হলো– তাদের তালিকায় এমন অনেক খ্রিষ্টান পাদরির নাম রয়েছে, যাদের প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা হবে বলে পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়েছে; এমনকী কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে পরিকল্পনাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

শুরুতে তাদের কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। যদি সাধারণ মানুষ সংগঠনটির কথা জেনে যায়, তাহলে আন্দোলন শুরু করতে পারে। পরে সেই ভয় কেটে যায়। কারণ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, আদালত, সংবাদপত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই ইহুদিদের সদস্য দিয়ে ভরে গেছে। কীভাবে সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়, তা ইহুদিদের ভালো করেই জানা আছে। মূলত আমেরিকানদের মতো ব্রেইন ওয়াশড জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

১৯১৮ সালের সম্মেলনে সংগঠনের সদস্য হিসেবে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া হলো : Jacob H. Schiff, ব্যাংকার; Louis Marshall, আইনজীবী এবং American Jewish Committee-এর প্রেসিডেন্ট; Otto A. Rosalsky, নিম্ন আদালতের বিচারক; Adolph S. Ochs, *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার মালিক; Otto H. Kahn, তিনি Kuhn, Loeb & Company-এর সদস্য; Benjamin Schlesinger, কয়েকদিন আগেই লেনিনের সাথে বৈঠক শেষ করে রাশিয়া হতে এসেছেন;

Joseph Schlossberg হলেন Amalgamated Clothings Workers-এর মহা পরিচালক; গধি চরহব, বলশেভিক বিপ্লবের উপদেষ্টা; Joseph Barondess, শ্রমিক নেতা; Judge Mack, তিনি আমেরিকার War Risk Insurance-এর প্রধান পরিচালক।

এ ছাড়াও আরও অনেক ইহুদি সংগঠন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। যেমন : Central Conference of American Rabbis, Easter Council of Reform Rabbis, Independent Order of B'rith, Independent Order of B'rith Sholom, Independent Order Free Sons of Israel, Independent Order B'rith Abraham, Federation of American Zionists, Orthodox Jews, Reform Jews, Apostate Jews, Zionist Jews, American Jews, Rich Jews, Poor Jews, Red Revoulationary Jews এবং আরও অনেক।

এই প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়েছে ইহুদিদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে। প্রশ্ন হচ্ছে– তারা কী এমন বিপদ বা হুমকি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে? এ দেশে কি এমন কেউ আছে, যে অন্যের অধিকার হরণ করতে চায়? আমেরিকার সাধারণ মানুষরা কি এমন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, যা তারা পাচ্ছে না? তাহলে তারা কাদের বিরুদ্ধে এবং কী উদ্দেশ্যে সংগঠিত হচ্ছে? কোন অত্যাচার-নির্যাতনের দোহাই দিয়ে তারা এই মায়াকান্না দেখাচ্ছে?

যদি American Jewish Committee নিয়ে অনুসন্ধান করা যায়, তবে তাদের মাঝেও একই উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। সংগঠনটি ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পুরো আমেরিকাকে ১২টি জেলায় বিভক্ত করেছে। সর্বশেষ জেলাটি হলো নিউইয়র্ক, যা তারা District XII বলে। এবার সাংগঠনিক উদ্দেশ্যগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১. ইহুদিরা যেন বিশ্বের কোথাও কোনো প্রকার নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা।

২. কোথাও যেন বৈষম্যের স্বীকার হতে না হয়, সে জন্য প্রয়োজনে আইনি সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষায় সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. যেকোনো সামাজিক নিপীড়ন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করা।

মূলত ইহুদিদের নিরাপত্তার অর্থ হলো– জ্যান্টাইল সমাজ কখনো তাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে পারবে না। এককথায় অবারিত স্বাধীনতা। রাবাই Elias L. Solomon-এর একটি উক্তি নিচে উল্লেখ করা হলো–

> 'আমেরিকার বাইরে এমন কোনো ইহুদি নেই, যে তার ভাগ্যের জন্য এই দেশটির দিকে তাকিয়ে নেই। ইহুদিদের নিকট এই দেশ হলো অনন্ত স্বাধীনতার দেশ। এটা এ জন্য নয় যে, আমেরিকার মানুষ আমাদের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি দিচ্ছে; বরং প্রকৃতি আমাদের জন্য এভাবেই গড়ে তুলেছে।'

তারা বর্হিবিশ্বের নিকট আমেরিকাকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন এটি একটি স্বর্গরাজ্য; এখানে যা ইচ্ছা করা সম্ভব। সবার জন্য আমেরিকা একটি স্বাধীন ও উন্মুক্ত দেশ। এখানে সকল ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-কালচার গ্রহণীয়। স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে উদারপন্থি নীতি দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটা বিষয় ভাবুন, আমরা যদি সত্যিই স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই, তাহলে এত আইনের কড়াকড়ি থাকতে হবে কেন? মূলত এসব ছিল তাদেরই পরিকল্পনার অংশ, যা দ্বারা আমেরিকাকে সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। সামনেই এর প্রমাণ পাবেন।

ইহুদি বর্ষ ৫৬৬৮ (১৯০৭-১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) অনুযায়ী–

> 'আমেরিকার সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ এবং তা হতে খ্রিষ্টান ও সকল ধর্মের চিহ্ন সরিয়ে দেওয়া ইহুদিদের সাংবিধানিক অধিকার।'

ইহুদিদের প্রটোকলের একটি ধারায় বলা হয়েছে– পৃথিবীর সকল ধর্ম মুছে দিয়ে একমাত্র ইহুদিবাদ প্রতিষ্ঠা করাই তাদের হাজার বছরের উদ্দেশ্য। প্রথম ধাপে মানুষকে নাস্তিক্যবাদে ধাবিত করতে হবে। এ জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারপন্থি নীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এভাবে একটি-দুটি প্রজন্ম পেরিয়ে গেলে মানুষের মনে ধর্মীয় চেতনা এমনিতেই হ্রাস পেতে শুরু করবে।

কিছু মানুষ থাকবে যারা নিজ ঘরে ধর্ম পালন করা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। রাস্তায় নেমে কথা বলার মতো সাহস তাদের হবে না; তার ওপর নগ্নতা ভরা যৌন চলচ্চিত্রের প্রদর্শন তো আছেই। একসময় মানুষ ধর্ম কী, তা-ই ভুলে যাবে; প্রতিষ্ঠা পাবে নাস্তিক্যবাদ। যখন আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না, তখনই ইহুদিরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হবে।'

আমেরিকানদের কপালে ঠিক এমনটাই ঘটেছে। আজ সরকারি অফিসগুলোতে 'Christmas Tree' এবং 'Christmas carols'-এর কোনো আয়োজন করা হয় না। যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশচিহ্ন এখন আর কোনো সরকারি অফিসে ঝুলিয়ে রাখা হয় না। ধর্মের ওপর এত কেন বল প্রয়োগ, তা নিয়ে তদন্ত করতে গেলে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। যদি কেউ মুখ খুলতে চায়, তবে তাকে অ্যান্টি-সেমাইট বলে থামিয়ে দেওয়া হয়। Justice Brewer তার একটি আর্টিক্যালে উল্লেখ করেন–

> 'খ্রিষ্টধর্ম আমেরিকায় বহু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে। যারা এই ধর্মকে নিয়ে কুৎসিত বিভিন্ন ঘটনার জন্ম দিয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো– Herbert Friedenwald নিউইয়র্ক, Isaac Hassler ফিলাডেলফিয়া ও Rabbi Ephraim Frisch আরক্যানসাস থেকে।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বাইবেল পাঠ এবং বড়োদিনের সংগীত অর্চনা বন্ধ করতে Central Conference of American Rabbis সংগঠনটি আইনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, কিন্তু নিউইয়র্কে পালটা আন্দোলনের মুখোমুখি হলে তারা বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফিলাডেলফিয়া, সিনসিনাটি, স্টেন্ট পাওয়েল ও আরও অনেক জায়গায় ইহুদিরা পালটা আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছে।'

এগুলোই ইহুদিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। আমেরিকার ডজনখানেক প্রদেশ ও শতশত শহরে তাদের এই পরিকল্পনা ইতোমধ্যে সফল হয়েছে। কিছু জায়গায় তারা ব্যর্থ হয়েছে, তবে সাময়িক সময়ের জন্য।

যদি কেউ ইহুদিদের পরিকল্পনায় সম্মতি না দেয়, তবে তার ওপর সেই পুরোনো কায়দায় অর্থনৈতিক অবরোধসহ বিভিন্ন ধরনের চাপ আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তারা আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

একটি বিষয় বলে রাখা জরুরি, এখানে কিন্তু ইহুদিরা সরাসরি কাজ করছে না; বরং তারা জ্যান্টাইল ফ্রন্ট ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, যেন ইহুদিদের কেউ দোষারোপ করতে না পারে। আমেরিকান সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও সিটি মেয়রকে ব্যবহারের মাধ্যমে তারা এই উদ্দেশ্যগুলো আদায় করে নিচ্ছে। এর পাশাপাশি পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো তো রয়েছেই। মানুষ চিন্তা করে পায় না– তাদের ক্ষমতাধর খ্রিষ্টান ভাইয়েরা কেন নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছে!

এবার ইহুদিদের এমন কিছু অধিকারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো, যার জন্য তারা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে এবং ইতোমধ্যে সফলও হয়েছে।

১. পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে আমেরিকায় ইহুদিদের পূর্ণাঙ্গ প্রবেশাধিকার।

Kehillah গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান হিসেবে কাজ করেছে। Kehillah দাবি জানিয়েছে, আমেরিকায় প্রবেশে যেন তাদের কোনো সদস্যকে আইনি ঝামেলা পোহাতে না হয়। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন– রাশিয়া, পোল্যান্ড, সিরিয়া, আরব বা মরক্কো, আমেরিকায় যেন তারা নিরাপদে প্রবেশে করতে পারে। অর্থাৎ তাদের ভিসার কোনো প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে এই প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে।

২. শহর, উপ-শহর, রাষ্ট্রীয় ও সরকারি সকল পর্যায়ে ইহুদি ধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান।

ইহুদিরা দাবি জানিয়েছে, ইহুদি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাৎসরিক উৎসবের দিনগুলোতে তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন : ইয়ম কিপুর। এ জন্য তাদের কোনো বেতন কাটা যাবে না। এ দিন হলো বাৎসরিক ক্যালেন্ডারের সপ্তম মাসের দশম দিন, যেদিন তারা পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করে থাকে।

কিন্তু যদি কোনো ক্যাথলিক খ্রিষ্টান তার লেটেন দিবসগুলো পালনের জন্য কর্ম-বিরতি পালন করে, তবে তার বেতন কাটা যাবে। খ্রিষ্টান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী একটানা ৪০ দিন তাদের রোজা রাখতে হয়, যা লেটেন দিবস নামে পরিচিত। কেন উভয় ধর্মের এক নীতি হলো না?

৩. শহর, উপ-শহর, রাষ্ট্রীয় সরকারি সকল স্থান থেকে খ্রিষ্টধর্ম অপসারণ।

১৯১৪-১৫ সালের দিকে ওকলাহোমার ইহুদিরা আদালতে একটি মামলা করে, যেন রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে খ্রিষ্টধর্ম ও যিশুকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর একজন রাবাই আরক্যানসাস গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কেন Thanksgiving Day Proclamation- তে তিনি যিশুর নাম উল্লেখ করলেন?

৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে সাব্বাত দিবসকে স্বীকৃতি প্রদান।

আমেরিকায় সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলো রবিবার। এই দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিসসহ কল-কারখানা বন্ধ থাকে। তারা বহু বছর চেষ্টা করেছে– সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার করতে। তারপরও যখন ইহুদিরা নিজেদের দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়, তখন জোরপূর্বক নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলো শনিবার বন্ধ রেখে রবিবার খোলা রাখতে শুরু করে। ইহুদি বিচারকগণ শারীরিক অসুস্থতার ভান করে শনিবারে আদালতে আসা বন্ধ করে দেয়। ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো শনিবারে আংশিক বা পুরোপুরি কার্যক্রম বন্ধ রাখে।

৫. রবিবার সরকারি ছুটির দিন হলেও এ দিনে তাদের সকল ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক থিয়েটার খোলা থাকবে।

Jewish Sabbath Alliance-এর প্রধান Rabbi Bernard Drachman বলেন– 'পবিত্র সাব্বাত পালন করাতে যা করা দরকার, আমরা তাই করব।' এ জন্য তিনি নিউইয়র্কের সকল সদস্যদের একত্রিত করে সমঝোতা করেন যে, সাব্বাত ইস্যুতে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত যত খ্রিষ্টান আছে, তারা শনিবার ছুটি পালন করে রবিবার কাজে উপস্থিত হবে। এভাবে তারা কোনো কোনো শহরে ছোটো পরিসরে হলেও সাব্বাত দিবস প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

৬. সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুলিশ স্টেশন, রাস্তা, পার্ক, দোকান, শপিংমল ইত্যাদির কোথাও বড়োদিন পালন করা যাবে না; এমনকী Christmas tree-ও প্রদর্শন করা যাবে না।

নিউইয়র্কের যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে খ্রিষ্টান ধর্ম পাঠ করানো হয়, সেগুলোকে তারা সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে। সেখানে যেন আর বড়োদিনের সংগীত অর্চনা করা না হয়, সে জন্য আদালতে মামলা করে। ইহুদিরা নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরিষদকে বাধ্য করে, যেন সেখানে Christmas tree না রাখা হয়। এ ছাড়াও আরও তিনটি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালকে বড়োদিন পালন বন্ধ করে Christmas tree সরিয়ে নিতে বাধ্য করে।

৭. যদি কেউ ইহুদি ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করে বা কোনো কটূক্তি করে, তবে অবশ্যই তাকে চাকরিচ্যুত করতে হবে। প্রয়োজনে জনসম্মুখে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

নিউইয়র্কে সে সময় ঘটে যাওয়া কিছু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য City Magistrate Cornell কেন ইহুদি যুবকদের দোষারোপ করলেন, তা নিয়ে ইহুদিদের সংগঠন Kehillah উঠেপড়ে লাগে। এই ঘটনার কিছুদিন আগে কোনো এক পুলিশ কমিশনার বিংগহামে অবস্থানরত ইহুদিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সমালোচনা করলে সিটি মেয়রের সাহায্যে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

৮. সরকারি আদালতগুলোতে ইহুদিদের জন্য পৃথক বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ইতোমধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার জন্য ইহুদি ধর্মাবলম্বী অপরাধীরা সহজেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। নিউ জার্সিতেও তাদের জন্য পৃথক বিচারব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯. ইহুদি ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, এমন সকল বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচি থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

Kehillah বাধ্য করেছে, যেন আমেরিকার সকল স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচি থেকে শেক্সপিয়ারের "Merchant of Venice" এবং লাম্বের "Tales from Shakespeare" বাদ দেওয়া হয়। টেক্সাস, ক্লিভল্যান্ড, ওহিও, ইয়ংগস্টাওন, এল পাসো, গালভস্টোনসহ আরও অনেক শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের জোড়াজোড়ির কাছে আনুগত্য স্বাকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের প্রস্তাবিত নিয়মমাফিক পাঠ্যসূচি সাজিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি লাইব্রেরিতে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লেখা প্রতিটি বই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. যেকোনো পোস্টার বা বিজ্ঞানের শুরুতে "Christian" পারিভাষিক কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এর পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে 'State, Religion বা Nationality'।

একবার American Jewish Committee-এর প্রেসিডেন্ট Louis Marshall তার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপাতে Christian পারিভাষিক একটি শব্দ ব্যবহার করেন; যা ইহুদিদের নীতির মধ্যে পড়ে না। পরবর্তী সময়ে এ কাজের জন্য তিনি Charles M. Schwab, Bejamin Strong ও McAdoo ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন।

১৯২০ সালে একবার ইহুদিদের বেশ কিছু পত্রিকা প্রতিষ্ঠান না বুঝে খ্রিষ্টানদের থেকে অধিক বিজ্ঞাপন পাওয়ার আসায় Chrisitan শব্দটি ব্যবহার করে। তৎক্ষণাৎ Kehillah হতে সেই পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বার্তা পাঠানো হয়, যেন তারা অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এমন কাজ দ্বিতীয়বার না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

এগুলোই হলো ইহুদিদের দাবি-দাওয়ার পরিচয়। এত সব আন্দোলন চালাতে যে বিশাল অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইহুদিদের আছে অজস্র ব্যাংক।

প্রতিবছর তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের একটি অংশ এসব আন্দোলন চালানোর ফান্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইহুদিরা আজ শুধু আমেরিকাই নয়; পুরো পৃথিবীকে নিজেদের কবজায় নিয়ে এসেছে।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে জ্যান্টাইলদের যে বৈরী আচরণ, তা নিছক কাকতালীয় ঘটনা নয়। কারণ, তারা পৃথিবীর যে অংশেই একত্রে বসবাস করেছে, সেখানেই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা ইহুদিরা বংশ পরম্পরায় নিজেদের চরিত্রে জড়িয়ে রেখেছে। এর দরুন জ্যান্টাইলদের সাথে ইহুদিদের দ্বন্দ্ব চিরকাল অব্যাহত থেকেছে এবং থাকবে। এ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।' Jesse H. Holmes, in The American Hebrew

আশাহত এক ইহুদির চোখে তার সম্প্রদায়ের চিত্র

এই অধ্যায়ে আমরা ইহুদিদের মঙ্গল কামনায় একজন ইহুদির বক্তব্য উপস্থাপন করব। তিনি হলেন Bert Levy, যিনি Jewish Women's Councils ও B'nai B'rith-এর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি এমন কিছু অকাট্য সত্য তুলে ধরেন, যা তার জ্ঞাতি ভাইদের মাঝে প্রবলভাবে বিদ্যমান। তিনি সেই বক্তব্যের শিরোনাম নির্ধারণ করেন– 'স্বজাতির মঙ্গল কামনায়'। এবার বক্তব্যটি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

স্বজাতির মঙ্গল কামনায় : 'বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে, ব্যথাতুর-বিষন্ন হৃদয়ে, স্বজাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বুকে ধারণ করে আমি এ দেশে প্রবেশ করি। পোলিশ ও রাশিয়ান পিতা-মাতার সন্তান হওয়ায় খুব ছোটোকাল থেকেই কোত্থেকে যেন দুঃখের এক খণ্ড কালো মেঘ আমার হৃদয়ে জেঁকে বসে। আমার পিতা-মাতা জীবদ্দশায় যে নিপীড়নের সাক্ষী হয়েছেন, সে দুঃখ-ই হয়তো পৈতৃকসূত্রে আমার বুকে এসে স্থান পেয়েছে। বাল্যকাল থেকে সহপাঠীদের অ্যান্টি-সেমিটিক আচরণ আমাকে আরও বেশি অভিমানি করে তুলেছে।

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌছালে একটি দেশের নাম নিয়মিত শুনতে পেতাম, যেখানে আমার জাতির প্রতি কোনো প্রকার অবহেলা বা বৈষম্য করা হয় না। সেখানে তারা উড়ে বেড়াতে পারে স্বাধীন পাখির ন্যায়। সে দেশটির নাম নিউ জেরুজালেম (নিউইয়র্ক)।

যদি আমেরিকার কোনো বই বা ম্যাগাজিন হাতে পেতাম, গভীর ভালোবাসায় লাজুক হাসি মেখে সেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরতাম। গর্বের সাথে ম্যাগাজিনের পাতাগুলোতে হাত বোলাতাম, যেখানে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখার জন্য আমার স্বজাতিদের মুখচ্ছবি বড়ো করে ছাপানো হতো। এই হাজার মুখচ্ছবির মাঝে একদিন নিজেও জায়গা করে নেব– এটাই ছিল আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন।

বাবা আমার কত কাছের বন্ধু ছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সেই বাবাকে ছেড়ে পরিস্থিতির চাপে একসময় নিউ জেরুজালেমে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার আগ মুহূর্তে শেষবারের মতো বাবার চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বাবা আমাকে কাছে ডেকে বললেন–

> "কখনো ভুলে যেয়ো না তুমি একজন ইহুদি। যখন তোমার ভালোবাসা ও সহানুভূতির প্রয়োজন হবে, তখন নিজ জ্ঞাতি-ভাইদের নিকট ফিরে যাবে এবং কোনো অবস্থায় আরবা কানফোট[৩০] পরিধান করা বন্ধ করবে না।"

শেষ মুহূর্তের উপদেশবাণীগুলো বুকে নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ি। কিন্তু তার অশ্রুময় মুখায়ব প্রতি মুহূর্তে যেন তির হয়ে আমার বুকে বাঁধতে থাকে। জাহাজের এক কোণে বসে কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানি না। ভাবতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল যে, বাবা আর আমার পাশে নেই। শত কষ্ট ও হতাশার মাঝে আমি তার বাণীগুলো বিশ্বাস করে নিলাম, ইহুদিরাই আমার ভাই-বোন।

দূর থেকে আমেরিকার দ্বীপগুলো যখন ভেসে উঠতে শুরু করল, তখন কল্পনার জগতে নতুন এক পৃথিবীর চিত্র আঁকতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছিল– Robert Louis Stevenson-এর রূপকথার রাজ্যটি দূরের দ্বীপগুলোর পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে। দীর্ঘকাল যাবৎ নিপীড়নের জাঁতাকলে প্রাণ-সর্বস্ব থাকার পর যখন জানতে পারলাম, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই স্বাধীন এক রাজ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, তখন আমার হৃদয়ে যে দোলা বইতে শুরু করে, সে অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না।

নীল সাগরের তারাময় সেই রাত্রিতে স্রষ্টা যেন আমাদের খুব কাছে নেমে এসেছিল। তার নিজ গুণে রাঙিয়ে দেওয়া সেই রাত্রির সৌন্দর্যকে ইঞ্জিনের প্রতিটি কম্পনময় আওয়াজ যেন বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। জাহাজের ডেকে বসে একটি সংগীতদল সুর তুলেছিল বিখ্যাত অপেরা শিল্পী Puccini-এর রচিত গান La Boheme-এর। জাহাজের প্রত্যেক যাত্রী নীরব হয়ে সে সুর উপভোগ করছিল; সাথে আমিও। হয়তো সবাই তখন অতীত চারণে ব্যস্ত ছিল। কেউ সুখের, কেউ বা দুঃখের।

আমার হৃদয়ের মানসপটে তখন অজস্র তারা ভেসে উঠেছিল, যার প্রত্যেকটি-ই বহন করছিল এক একটি দুঃখের চিত্র। চারদিকে বইছিল সুনসান নীরবতা। জাহাজের পাটাতনে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পরার শব্দ কানে ভেসে আসছিল। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে হাভার্ডফেরত এক যাত্রী ডেকের ওপর উঠে বললেন–

> "ওহ! এটা শয়তান ইহুদি ছাড়া আর কারও কাজ নয়।"

বলেই তিনি পড়ে গেলেন এবং কিছুটা আঘাত পেলেন।

---

[৩০]. আরবা কানফোট (Arba Kanfoth)– ইহুদিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক।

এই ইহুদিবিদ্বেষী মন্তব্যটা আমার হৃদয়ে যেন বিষমাখা তির হয়ে আঘাত হেনেছিল। পরে যখন শুনলাম তিনি ইহুদিদের দ্বারা আহত হয়েছেন, তখন স্বজাতীর কথা ভেবে মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হলাম। তাকে যে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে গেলাম। তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে একেবারে বিমোহিত হয়ে গেলাম। প্রবীণ সেই ব্যক্তিটি জীবনের পুরোটা সময় ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকলের পরোপকারে ব্যয় করেছেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কেবল একটিবারের জন্য জেরুজালেমে যেতে চাইছেন, যেন সেখানকার পবিত্র পাথরগুলো ছুঁয়ে জীবনের সকল পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে ক্রন্দন করতে পারেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে কার্ড খেলায় অংশগ্রহণ করতে বলেন। তাকে মনে করিয়ে দিলাম, "আমিও একজন শয়তান ইহুদি।"

বললেন– সে রাতে তিনি যা বলেছেন, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আচমকা তা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে এবং তা নিছক একটি বাক্য ছাড়া অন্য কিছু যেন না ভাবি।

আমরা খুব দ্রুত বন্ধু হয়ে গেলাম। রুমের এক কোণে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার খুব কাছে চলে আসলাম। কথায় কথায় তার মনে আমার স্বজাতি সম্পর্কে ভালো ধারণা জন্মানোর চেষ্টা করলাম। আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি বললেন–

> "এক বছর তোমার স্বজাতিদের সাথে আমেরিকায় থাকো, তারপর তোমার মনোভাব কী হয়, তা আমাকে জানিয়ো।"

তারপর আমেরিকার বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহরে হেঁটেছি এবং স্বজাতীয় ভাইদের কান্নার সুরে বলেছি– "নিজেদের সংযত করো!" নিউইয়র্কে পা ফেলার পরপরই জানতে পারলাম, আমার বাবা পরলোকগমন করেছেন। ধর্মীয় আচার অনুযায়ী পরলোকগত পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে কাদ্দিশ[৩১] প্রার্থনা সংগীত গাইতে হয়। প্রতিটি পুরুষ, যার শরীরে ইহুদিদের রক্ত রয়েছে, তাদের জন্য এ সংগীত অর্চনা করা বাধ্যতামূলক। ধর্ম-কর্ম থেকে দূরে থাকলেও সবাইকে একদিন এই সংগীত গাইতে হবে, এ থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই।

এই প্রার্থনা সংগীত অন্তত দশজন প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদির উপস্থিতিতে অর্চনা করতে হয়, আর এই সমাবেশকে বলা হয় মিনিয়ান[৩২]। ভেবেছিলাম, এমন একটি শহরে খুব সহজেই এই কাজটি করতে পারব। সেই ম্যাগাজিন ও পত্রিকাগুলোতে আমার যে বিখ্যাত জ্ঞাতি-ভাইদের মুখচ্ছবি দেখেছিলাম এবং যাদের নাম পুরো পৃথিবীর সবাই জানত– এমন একজনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম; ঠিকানা সংগ্রহ করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না।

---

৩১. কাদ্দিশ (Kaddish)– পারিবারিক বা প্রিয় কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার আত্মার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার স্তুতি গেয়ে ইহুদিরা যে প্রার্থনা সংগীত করে, তাকে কাদ্দিশ বলে।

৩২. মিনিয়ান (Minyan)– কাদ্দিশ পালনে আয়োজিত সমবেত সংগীত মঞ্চকে কাদ্দিশ বলা হয়। এ জন্য ১৩ বয়সোর্ধ্ব অন্তত দশজন ইহুদি সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক।

অফিসের দরজায় পৌছালে দারোয়ান আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইল। বললাম– কাদ্দিশ অর্চনার জন্য আমি এক মিনিয়ানের আয়োজন করতে চাই। দারোয়ান ছিল একজন হিব্রু। সে চোখের ইশারায় আমাকে আরও কিছু হিব্রু ক্লার্কের টেবিল দেখিয়ে দিলো। সবার চোখ যেন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরায় পরিপূর্ণ। মশকরা করে তারা আমার নাম দিলো "Greehorns" (গ্রাম থেকে শহরে আগন্তুক লোকেদের দেখে যেমন গ্রাম ভূত বলে কটাক্ষ করা হয়)। এত সব ভেংচি কাটা মুখায়বের ধাক্কা পেরিয়ে আমি সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলাম।

এক মিনিট কথা বলে বুঝলাম, তিনি শুধু পোশাক-আশাকেই ইহুদি। এ ধর্মের শিল্প, ঐতিহ্য, ও ভালোবাসার প্রতি তার ন্যূনতম কোনো আকর্ষণ নেই। মিনিয়ান কী, সেটাই তিনি জানেন না। উদ্দেশ্য শুনে অবজ্ঞার স্বরে তিনি আমাকে পাশের একটি দোকানে চলে যেতে বললেন। বুঝতে পারলাম, স্বজাতিদের পাশে থেকেও আমি আজ খুব অপরিচিত। নিউইয়র্কের রাস্তায় হাঁটার সময় খেয়াল করলাম, আমার জ্ঞাতি-ভাই-বোনেরা কী পরিমাণ ব্যস্ত। সবাই কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ধর্মীয় বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার ছাপ যেন তাদের মন থেকে হারিয়ে গেছে।

> "ওহ খোদা! এরা কি ইজরাইলের সন্তান? এরা কি সেই জাতি, যারা নিপীড়নের শিকার হয়ে পৃথিবীর চতুষ্কোণে ছড়িয়ে পরেছিল?"

বিলাপ করে সেদিন শুধু এসবই বলছিলাম।

ক্লান্ত-ক্ষুধার্থ শরীরে এক হোটেলে হাজির হলাম। মার্বেল পাথরের তৈরি মেঝে, ফুলেল সুবাস, চাকচিক্যময় কারুকাজ, আলোকসজ্জা, অর্কেস্ট্রা দল ইত্যাদি সবই আমার নিকট মিথ্যে বলে মনে হলো। কোনো কিছুতেই আনন্দ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যে টেবিলে বসতে গেলাম, বলা হলো– এটা দখল হয়ে গেছে। বসার জন্য একটি টেবিলও পেলাম না। ডায়মন্ডের গহনা আর ঝকমকে গাউন পরিহিত ইহুদি নারীরা তাদের মতোই অমার্জিত ও কুরুচিপূর্ণ পুরুষদের সাথে প্রতিটি টেবিলে বসে আছে। মুখ ভর্তি খাবার ও হুইস্কি খেতে খেতে তারা শরীর দুলিয়ে গাচ্ছে Mississippi ও Georgia। তারা কি দেখতে পায়নি, তাদেরই স্বজাতি এক ইহুদি সেদিন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছিল! আমার বাবার বলে দেওয়া আরবা কানফোট পরেই আমি সেদিন তাদের সামনে হাঁটছিলাম, তারপরও তারা আমাকে চিনতে পারেনি!

এরপর রাস্তা, মহাসড়ক, উপসড়ক, যানবাহন বা দোকানপাট যেখানেই হাজির হয়েছি, আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কারও পথের সামনে পড়েছি, তো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতসব রূঢ় ব্যবহার দেখেও তাদের অভিসাপ দিইনি; বরং হৃদয়ের গভীর থেকে চিৎকার করে কেঁদে বলেছি–

> "ওহে আমার ভাই-বোনেরা! স্বজাতির মঙ্গল কামনায় তোমরা নিজেদের সংযত করো!"

আজ আমরা আমেরিকায় যে স্বাধীনতা আমরা পাচ্ছি, তা ইতঃপূর্বে অন্য কোনো দেশে পাইনি। আফসোস হচ্ছে, আমরা এ স্বাধীনতার পূর্ণ অপব্যবহার করছি। পত্রিকার পাতায় খুনি, ঘুষখোর, ডাকাত, জুয়াড়ি, অবৈধ্য অস্ত্রধারী ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগের তির আমাদের সম্প্রদায়ের দিকে ছুড়ে মারা হয়। এটা ঠিক যে, অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মাঝেও এ জাতীয় অনেক অপরাধী খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। আমাদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এমনিতেই আলাদা। তাই ভদ্র ও মার্জিত উপায়ে নিজেদের শুধরে নেওয়ার এটাই ভালো সময়। এর চেয়ে বেশি দুঃখের আর কী হতে পারে, যখন আমাদের স্বজাতিরা ইহুদিদের মতো মুখায়ব থাকার পরও খ্রিষ্টানদের সাথে মিলিয়ে নিজেদের নাম রাখছে!

কখনো ভাবতে পারি না, আমার স্বজাতিরা দেরি করে থিয়েটারে এসে একদম সামনের সারিতে যেয়ে আসন গ্রহণ করবে। সবার সমানে দাঁড়িয়ে গায়ের কোট ও হাত মোজা খুলে সেখানে আসন গ্রহণ করবে, যার দরুন সাধারণ দর্শকেরা বিরক্ত হবে। কিন্তু তিনি যদি ধৈর্যসহকারে টিকেট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকেট ক্রয় করতেন এবং যানবাহনে চলাচলের সময় বৃদ্ধ কোনো মহিলাকে আসন ছেড়ে দিতেন, তবে তিনি খুব সহজেই সাধারণ মানুষের বন্ধু হতে পারতেন। তবে অধিকাংশ ইহুদি আজ খুবই আক্রমণাত্মক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এটা ঠিক যে, এই ব্যক্তিত্বের দরুন তারা অনেকে দ্রুত বাড়ি-গাড়ি, সম্পদ ও প্রতিপত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তারপরও এই ব্যক্তিত্ব ইহুদিদের অনেকটা নিষ্ঠুর ও নির্মম করে তুলেছে।

বাবার কথাগুলো স্মরণ করে খুব কষ্ট হয়–

> "যখন তোমার ভালোবাসা ও সহানুভূতির প্রয়োজন হবে, তখন নিজ জ্ঞাতি-ভাইদের নিকট ফিরে যাবে।"

কিন্তু এ দেশে আমি যতবার বিপদে পড়েছি, তার প্রত্যেকটির জন্য আমার ইহুদি ভাইয়েরাই দায়ী। আমি ধোঁকা খাই এক মতলববাজ উকিলের কাছে, একদল নীতিহীন কেরানির কাছে, উদাসীন এক টিকেট কালেক্টরের কাছে এবং সবশেষে হোটেল বালকদের কাছে। যদি এমন হতো, এই প্রতিটি দুঃখ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে জ্যান্টাইলদের কারণে, তাহলে নীরবে মেনে নিতাম।

এমন একটা সময় ছিল, যখন আমার পকেটে কোনো পয়সা ছিল না। কাজের জন্য ব্যাকুল হয়ে এদিক-ওদিক ছুটেছি। এক হিব্রু সাহেবের দোকানে গিয়ে বলি– "আমি এক গোঁড়া ইহুদি। ধর্মীয় বিধান মেনে পুরোটা জীবন পার করছি। ধর্মের জ্ঞাতি-ভাই হিসেবে আপনার নিকট আমি একটি চাকরি দাবি করছি।" তিনি আমার কথা শুনে হা...হা...হা... করে হাসতে শুরু করলেন।

তিনি বলেন–

> "আমার জ্ঞাতি-ভাই! আমরা এখন আধুনিক যুগে বাস করি। এই যুগে ইহুদিতন্ত্র কেউ মেনে চলে না এবং মানারও প্রয়োজন নেই। আমি ইহুদি হয়েও খ্রিষ্টানদের অর্চনায় অভ্যস্ত। এতে আমার ব্যাবসা ভালোই চলে।"

তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে উঠপাখির মতো মাথা তুলে তিনি জানানোর চেষ্টা করছেন, তিনি সবার চেয়ে আলাদা।

তাকে বুঝিয়ে বললাম, ইহুদিতন্ত্র কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়; এটা শরীরের রুধি ধারার মাঝে প্রবহিত। যদি কোনো চিতাবাঘ নিয়মিত সিনাগাগে যাওয়া বন্ধ করে গির্জায় যাওয়া শুরু করে– তবে এটা নয় যে, সে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। সে আগেও চিতা ছিল, এখনও তা-ই আছে। এভাবে কথা বলার দরুন নিশ্চিত ছিলাম, সেই দোকানে কাজ করার সুযোগ পাব না।

এরপর আরও অনেক অফিসে চাকরির জন্য ধরনা দিলাম। সবশেষে বুঝলাম, ইহুদিতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমার স্বজাতিদের মন থেকে একেবারে হারিয়ে গেছে। নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে একসময় বহু পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের নিয়ে এ দেশে পাড়ি জমিয়েছিল, কিন্তু সেই সন্তানরা আজ বধ্য উন্মাদের মতো থিয়েটার হলগুলোতে রাতের পর রাত আমোদ-ফূর্তি করে কাটাচ্ছে। ঘরে বসে অভিভাবকগণ যেখানে সন্তানদের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত, সেখানে তাদের সন্তানরা উগ্র আমোদ-ফূর্তিতে ব্যস্ত। লেখক, অভিনেতা, সমালোচক, শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গনে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, তবে নিজ নামে নয়; খ্রিষ্টানদের ছদ্মনামে।

ক্লান্ত পায়ে বহু পথ হাঁটার পর– সিটি হলের এক তরল দুধের দোকানে এসে থামলাম। এক সেন্টের সমপরিমাণ তরল দুধ আমাকে বিনা পয়সায় দেওয়া হলো, যার স্বাদ অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা সম্ভব নয়। আমার পাশে বসে এক ভদ্রলোক ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল–

> "এটা খুব প্রশংসনীয় কাজ। যিনি বিনামূল্যে এভাবে তরল দুধ বিতরণ করছেন, তার দরুন অনেক ছোটো ছোটো শিশুর জীবন রক্ষা পাচ্ছে। তিনি একজন সম্পদশালী ইহুদি। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুক। আমার তিনটি সন্তান আছে।"

স্বজাতি সম্পর্কে হঠাৎ এমন প্রশংসার বাণী শুনে হৃদয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। আমি সে লোকটির পাশে আরও এক ঘণ্টা বসেছিলাম এবং কীভাবে সেই ইহুদি ব্যক্তিটি ধর্ম-মত নির্বিশেষে লাখো শিশুর প্রাণ রক্ষা করছে, সেই গল্প শুনলাম। আমেরিকায় আগমনের পর এটাই ছিল প্রথম কোনো ঘটনা, যার দরুন আমি গর্ববোধ করছি।

এরপর ছোটো এক পার্কে গিয়ে বসলাম। আমার পাশ ঘেঁষে ছোট্ট একটি মিছিল চলে গেল। সেই মিছিলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মাঝে এক আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম।

দেখলাম, এটা ছোট্ট কোনো মিছিল নয়; বরং একটি প্যারেড। বিভিন্ন প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে আমার স্বজাতিরা সেখানে প্যারেড করছে। প্রথম প্লাটুনে, কমান্ডারের পেছনে পতাকাবাহী সদস্যটির হাতে বড়ো একটি ব্যানার, যাতে লিখা ছিল– "স্বজাতির মঙ্গল কামনায়"। সে প্লাটুনে প্রত্যেক সদস্যের হাতে ছিল একটি করে সিল্কের ব্যানার, সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল তাদের প্রকৃত ইহুদি নাম। এদের পর আসে জুয়াড়ি ইহুদিদের প্লাটুন। তাদের হাতে থাকা ব্যানারই বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তারা কোনো নোংরা কাজের প্রতিনিধিত্ব করছে।

এরপর আসে একদল দাস-দাসী, যাদের সামনে রয়েছে ক্ষমতালোভী ও সুবিধাবাজ রাজনীতিবিদ। তদের হাতে থাকা প্লেকার্ডে লেখা ছিল– "শর্ত সাপেক্ষে আমরা কাজে ফেরত যাব।" এরপর আসে একদল সুদি ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সিন্ডিকেট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ। প্যারেডের এ অংশটি ছিল অনেক বড়ো। তারা এসেছে সাধারণ ও মার্জিত বেশভুশায়। তাদের হাতে থাকা ব্যানারগুলোতে লিখা ছিল– "আমরা আর মিথ্যে বলব না, আর অতিরিক্ত সুদের বাণিজ্য করব না" এবং আরও অনেক প্রতিজ্ঞা। উপস্থিত জনতা খুশি হয়ে বলল– "Missouri! Missouri!"

এরপর আসে Hebrew Firebugs Union-এর একটি দল। তাদের পরনে ছিল জেল কয়েদিদের পোশাক। সেটি ছিল একদল আক্রমণাত্মক সৈন্যবাহিনী; সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার। তাদের ব্যানারের লেখা ছিল– "আমরা নিজেদের সংযত করে চলব, "নিজেদের শুধরে নেব এবং আরম্বরপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করব।"

হঠাৎ এক ইহুদি পুলিশ কর্মকর্তার ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভাঙে। তিনি আমাকে জোড় করে থানায় নিয়ে গেলেন। পার্কে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য দায়িত্বরত এক ইহুদি মেজিস্ট্রেকে জরিমানা দিতে বললেন। কিন্তু আমার পকেট যে পুরো ফাঁকা। মেজিস্ট্রেট সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন– "অকর্মণ্য-আগাছা, পরেরবার থেকে পার্কে গিয়ে সজাগ থাকবে।"

সজাগ থাকবে! এর চেয়ে বাজে উপদেশ আর কী হতে পারে? স্বজাতির মঙ্গল কামনায় যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তার ব্যাঘাত ঘটল অপর এক স্বজাতি ভাইয়ের আঘাতে। এরপর সেই থানাতে ঘটল এক আকস্মিক ঘটনা। সেখানে উপস্থিত প্রৌঢ় বয়স্ক এক বিদ্বান ইহুদি আমার বেশভুশা দেখে কাছে এলেন। আমার চেহারা দেখেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নতুন দেশে আমি কী বিপদের মুখে পড়েছি। তিনি আমাকে বস্তির মতো এক ঘেটোতে নিয়ে গেলনে। রাতের খাবারের পর তিনি আমাকে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। পাড়ার সকল ইহুদিদের তাদের প্রথম নামে ডাকতে শুরু করলেন। এক এক করে অনেকে জমা হলো। বাবার মৃত্যু উপলক্ষ্যে কাদ্দিশ অর্চনা সেখানেই শেষ করলাম।

তখন থেকে হতো-দরিদ্র গরিব ইহুদিদের আমার বন্ধু করে নিয়েছি। কারণ, প্রকৃত ধর্মের স্বাদ-গন্ধ কেবল এই দলটির মাঝেই পেয়েছি। দারিদ্র্য-পীড়িত এই দলটি জীবনে বহু নির্মমতা দেখেছে, কিন্তু তারপরও ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা ভোলেনি। প্রৌঢ়-বয়স্ক-বিদ্বান ইহুদিরা বহু দিন ঠোঁট আওড়িয়ে আমাকে অমৃত বাণী শুনিয়েছে। তারা আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন– "ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখ এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করো।" এতসব হতাশার মাঝে সেদিন নিজেকে তাদের মাঝে আবিষ্কার করতে খুব গর্ববোধ হয়।

প্রকৃত ইহুদিদের নিকট স্বর্গ, পার্থিব কোনোটিই উপেক্ষিত নয়। স্বর্গ-নরকের ভয় আছে বলে তারা সকল কু-কর্ম হতে নিজেদের পৃথক রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। মৃত্যু নিয়েও আমাদের রয়েছে সুন্দর দর্শন। মৃত্যুরপর আর কোনো শারীরিক যন্ত্রণা নেই। শারীরিক মুখোশ থেকে বেরিয়ে যারা একবার রৌদ্রোজ্জ্বল নতুন সে পৃথিবীতে প্রবেশ করবে, তাদের আর কোনো কষ্ট নেই। পৃথক এ দুটি জগতের মাঝে মৃত্যু একমাত্র প্রতিবন্ধকতা, যা অতিক্রম করে মানুষ অমরত্বের জগতে পৌঁছে যায়। The Old Curiosity Shop অধ্যায়ে মৃত্যু সম্পর্কে Charles Dickens বলেন–

> "একবার যিনি মারা যান, তার জন্য আশেপাশের আত্মীয়স্বজন যতই বিলাপ করুক না কেন, তার মৃত্যুপরবর্তী জীবনে কোনো রকম পরিবর্তন আসে না। তা মূলত পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। গরিব-দুঃখী ইহুদিদের নিকট এগুলো অমৃত বাণী, যার দরুন তারা আজও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পায় এবং নোংরা বস্তিতে থেকেও প্যালেস্টাইনের সুগন্ধ শুকতে পায়।"

শহরের অপর প্রান্তে থাকা আমার স্বজাতীয়দের বড়ো এক অংশের হয়তো প্রচুর সম্পদ হয়েছে, কিন্তু তাদের মনে ধর্মের কোনো স্থান নেই। তারাই আজ উদ্ভ্রান্তের মতো বিবেক-বিবর্জিত নিষ্ঠুরতাকে পুঁজি করে বিশ্ব দখলের পথে ছুটে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই জ্যান্টাইলদের মনে অ্যান্টি-সেমেটিক মনোবৃত্তির জন্ম দিয়েছে। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে গেলে, দেখিয়ে দেয় তাদের ঘরেও তালমুদ আছে, কিন্তু তারা তা কখনো পড়ে দেখে না; অনুসরণ করা তো দূরের কথা।

এই সম্পদশালী ইহুদিদের পিতা-মাতারা কী পরিমাণ নিপীড়ন সহ্য করে, বহু সাগর পাড়ি দিয়ে এ দেশে থাকার সৌভাগ্য পেয়েছে, সেই মর্ম তারা বুঝবে না। যে কমেডিয়ানগণ Vaudeville Genre সংগীতে করে থিয়েটার বাণিজ্য করে রাতারাতি বহু অর্থ উপার্জন করছে, তাদের দশজনের মধ্যে নয়জনই ইহুদি সন্তান। গল্প-উপন্যাস, কৌতুক-অভিনয়, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি নানা ছলে তারা আদি পিতা-মাতাদের নিপীড়নের চিত্র সাধারণ দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত। তাদের নিকট সবকিছু যেন অর্থ উপার্জনের রাস্তায় রূপ নিয়েছে।

প্রৌঢ় বয়স্ক দরিদ্র ইহুদিদের জীবনে আমোদ-প্রমোদের কোনো স্থান নেই। তারা দিন আনে দিন খায়। একই সঙ্গে চালিয়ে যায় ধর্মীয় অনুশীলন। একদিন এক মুরগির খামারের পেছনে অন্ধকার একটি স্থানে বসে দেখছিলাম, এক ১০৪ বছরের বৃদ্ধ তালমুদের ৬০ তম পৃষ্ঠার ওপর কিছু গরিব যুবককে জ্ঞান প্রদান করছে। সেখানে একটি যুবক তার সবজির ভ্যান পাশে রেখে বৃদ্ধের নিকট জ্ঞান লাভের জন্য বসে আছে। যুবক জানে, ভ্যানের ওপর যে সবজিগুলো পড়ে আছে তা পঁচনশীল। তারপরও জ্ঞান লাভের জন্য সেখানে বসে আছে। পাশ থেকে অসংখ্য শিশু-বাচ্চা সেই ভ্যানগাড়িটি নিয়ে খেলা করতে শুরু করে, তারপরও সে নির্বিকার। এমন সময় অন্য পাশ থেকে কোনো বৃদ্ধ কাগজে মোড়ে এক টুকরো মুরগির মাংস সেই যুবককে উপহার দেয়, যেন সে তালমুদের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার উৎসাহ পায়। এই গরিবদের জীবনে ফূর্তি করার কোনো অবকাশ নেই। আমি সেই বিদেশি বন্ধুকে ডেকে বলতে চাই, প্রকৃত ইহুদিদের স্বাদ আমি এই গরিবদের মাঝেই খুঁজে পেয়েছি।

সম্পদশালী ইহুদিদের দুর্ব্যবহার, অসভ্যতা ও নোংরামি দেখে যখন লজ্জিত হই, তখন বলতে চাই, কোনো ইহুদিকে যদি ধর্মের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়, তবে যেন এই গরিবদের বিচারের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তালমুদের কিছু বাণী রাবাই Myers-এর মুখে প্রায় শোনা যায়; যার অর্থ বুঝতে পারা কারও জন্যই কঠিন নয় :

> "Which is the path, both right and wise,
> That for himself a man should find?
> That which himself much dignifies,
> And brings him honor from mankind."'

০

জ্যান্টাইলদের প্রতি ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদি বিতর্ক নিয়ে আমরা ততদিন পর্যন্ত কোনো সমাধানে পৌছাতে পারব না, যতদিন না তারা নিজ উদ্যোগে এ বিতর্কের সমাধানে এগিয়ে আসে। জ্যান্টাইলদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ইহুদিদের অভিযোগ–

> 'মেনে নিলাম আপনারা যা প্রকাশ করছেন তা সত্য এবং কিছুসংখ্যক ইহুদি সত্যিই অপরাধী। তাই বলে প্রতিবার নাম প্রকাশের সময় 'ইহুদি' শব্দটি উল্লেখ করতে হবে কেন? আপনারা চাইলে Al Wood, Morris Gest, Louis Marshall, Samuel Untermyer, Edward Lauterbach ও Felix Warburg নামগুলোকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারেন। যখন আপনার ইহুদি উচ্চারণ করেন, তখন কি পুরো সম্প্রদায়কে এক কাতারে নিয়ে আসা হচ্ছে না? এর দরুন পুরো সম্প্রদায় অভিযুক্ত হচ্ছে।'

এমন যদি হতো, শুধু জড়িত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে এবং জাতিগত পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না, তবুও কিন্তু সমাজে আহামরি কোনো পরিবর্তন আসত না।

হাজারো বছর ধরে জ্যান্টাইলদের সাথে ইহুদিদের যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, তার কোনো অবসান হতো না। কিছুদিন পরপর ইউরোপজুড়ে যে অ্যান্টি-সেমেটিক আন্দোলন জেগে উঠে, তা থেকে ইহুদিরা কখনো পরিত্রাণ পেত না। জ্যান্টাইল প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষত DEARBORN INDEPENDENT ইহুদিদের সমালোচনা করে যে অসংখ্য আর্টিক্যাল প্রকাশ করেছে, তার উদ্দেশ্য– জ্যান্টাইলদের মনে ইহুদিবিদ্বেষী চেতনা জাগিয়ে তোলা নয়; এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো– ইহুদি বিতর্ক সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সজাগ করে তোলা। মূলত পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, নিরপেক্ষ ও সত্য তথ্য প্রকাশ করতে গেলেও তা ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জ্যান্টাইলদের মনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেবে। এ পর্যন্ত পত্রিকা প্রতিষ্ঠানটি ইহুদিদের সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য ছাপিয়েছে, তার একটিও যদি ভুল হতো, তবে এত দিনেও তারা কোনো মামলা করলা না কেন?

এ ক্ষেত্রে ইহুদিরা নিরুপায়। জ্যান্টাইল পত্রিকাগুলো দ্বারা প্রকাশিত তথ্যসমূহ ভুল প্রমাণিত করার জন্য কোনো রকম তথ্য-প্রমাণ ইহুদিদের হাতে নেই। তারা চায়, প্রকাশিত আর্টিক্যাল ও কলামগুলো সমাজের মানুষ না পড়ুক। তারা অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বাজারে হাস্যরসের পাত্র বানানো যায় কি না। তা ছাড়া নিজ জাতিগোষ্ঠীর জন্য জ্যান্টাইলের ছাপানো এ জাতীয় আর্টিক্যাল ও কলাম পড়া তো একেবারে নিষিদ্ধ, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, ইহুদিরা চায় না– অ্যান্টি-সেমিটিক বিক্ষোভ তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য জাগ্রত হোক। আমাদের অভিযোগসমূহ শোনার পর ইহুদি সংগঠনগুলো যে জবাব দিলো, তা শুনে সত্যি অবাক হবেন। এমন কয়েকটি জবাব সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নিচে উপস্থান করা হলো–

১. 'তোমরা যা বলছ, তার সবই সত্যি তবুও তোমরা আমাদের অভিযুক্ত করতে পারো না।'

সাংবাদিকতা শিল্পে ইহুদিদের বেশ কিছু মূলনীতি রয়েছে, যার একটি হলো– ইহুদিরা কখনো গণ-আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারবে না। যদি তাদের নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়, তবে তা কেবল ভালোর জন্যই হতে হবে। ইহুদিদের প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে– এমন কোনো বিতর্ক জনসম্মুখে আনা যাবে না। এর উদ্দেশ্য হলো– ইহুদিদের অপকর্মগুলো যেন জনসম্মুখে প্রকাশ না পায়। শুধু জ্যান্টাইলরাই নয়; ইহুদিদের কোনো মুখপাত্র পর্যন্ত এমন কোনো কাজ করতে পারবে না।

২. 'আপনারা যা বলছেন, তার সবই সত্যি। কিন্তু আপনারা যে সমাধান চাইছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। আপনাদের জন্য ইহুদিরা কখনো পরিবর্তিত হবে না; বরং আমাদের জন্য আপনাদের পরিবর্তন হতে হবে।'

তারা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ইহুদিরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি এবং তাদের প্রয়োজনে আমাদেরকেই পরিবর্তীত হতে হবে। তাহলে থিয়েটার ও চলচ্চিত্র শিল্পে ইহুদিরা যে নগ্ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, তা কি আমাদের মেনে নিতে হবে? পুঁজিবাজার ও অর্থবাজারকে পৃথক করে যে ধ্বংসাত্মক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, তা কি আমাদের মেনে নিতে হবে? সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় তারা যেভাবে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ দখল করে যাচ্ছে, তা কি আমাদের মেনে নিতে হবে? খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে ইহুদিরা প্রতিদিন বিষ পান করাচ্ছে, তা কি আমাদের মেনে নিতে হবে?

তারা নিজেদের যে Mosaic Law-এর অনুসারী দাবি করে থাকে, সত্যি বলতে মোজেস যদি এই যুগে বেচে থাকতেন, তবে তিনি কখনো ইহুদিদের এই বানানো আইনসমূহ গ্রহণ করতেন না।

৩. 'আপনাদের দাখিল করা অভিযোগসমূহের সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আমরা চাইব। কিন্তু আমাদের এমন কোনো প্রয়োজন পড়েনি যে, আপনাদের অভিযোগগুলো মাথা পেতে নিতে হবে।'

যারা নিজেদের প্রকৃত ইহুদি বলে দাবি করে, তাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণের কথা হাজার বছর আগে ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলো জিহুদিয়া (Judah), প্যালেস্টাইনে ফিরে যাওয়ার অর্থ হলো– বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করা। ইহুদিরা যে নিজেদের মোজেসের অনুসারী বলে দাবি করে, সেই মোজেস কখনো জিহুদিয়ার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজেদের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ইজরাইলবাসী একত্রিত হয়ে এই গোত্রটিকে হাজার বছর আগে বহিষ্কার করে। এমন নয় যে, তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে; বরং শাস্তিস্বরূপ ইজরাইল থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। তাহলে কীসের ভিত্তিতে আজকের জায়োনিস্টরা দাবি করে, তারা প্যালেস্টাইনের প্রকৃত মালিক?

যখন কেউ বাইবেল পড়বে, তার খুব সতর্কতার সাথে বাইবেল পড়া উচিত। ইহুদিরা দাবি করে তারা পয়গম্বর Abraham-এর অনুসারী। একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতে চাই, ওল্ড টেস্টামেন্টের নয়-দশমাংশ হলো ইজরাইলি গ্রন্থ, যা ইজরাইলবাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, Gideon, Samuel, Esther ও Mordecai সবাই ছিলেন ইজরাইলবাসীর পয়গম্বর। তারা কেবল জুদাহদের জন্য পয়গম্বর হয়ে আসেনি। এমনকী যিশু যে অনুসারীদের খুঁজে পান, তাদের অবস্থান ছিল গ্যালিলি অঞ্চলে, যা ছিল জুদাহ থেকে অনেক দূরে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেবল একজনকে পাওয়া যায়, যিনি বেনজামিন প্রদেশ হতে যিশুর অনুসারী হতে গ্যালিলিতে আসেন। তার নাম হলো St. Paul। তিনি হলেন যিশুর একমাত্র ইহুদি অনুসারী।

আমেরিকান ইহুদিদের উচিত, নিজেদের চরিত্রে আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা। তারা যদি জীবনের অর্ধেকটা সময় কেবল নিজেদের সমালোচনায় ব্যয় করত, তবে কখনোই এতসব আক্রমণের মুখোমুখি হতে হতো না; বরং সাধারণ মানুষের উন্নয়নকল্পে তারা বিশেষ অবদান রাখতে পারত। যেখানে ইহুদিরা জ্যান্টাইলদের যেকোনো কাজের প্রতি উচ্চ সংবেদনশীল মনোভাব পোষণ করে, সেখানে নিজেদের সকল ভুলত্রুটিতে থাকে নীরব।

ইহুদিদের ওপর আসা যেকোনো অভিযোগ ও সমালোচনা মোকাবিলা করতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু অসংযত জীবন পরিহার করে ইহুদিরা যে সুন্দর সমাজব্যবস্থায় ফিরে আসবে, এমনটা তাদের মাঝে কখনো দেখা যায় না। এমন নয় যে, জ্যান্টাইলরা ইহুদিবিদ্বেষী হয়ে জন্মগ্রহণ করে; বরং তাদের নিয়মিত কার্যকলাপই জ্যান্টাইলদের ধীরে ধীরে ইহুদিবিদ্বেষী করে তুলে।

-Walter Lippmann, in The American Hebrew

জ্যান্টাইলদের দৈনন্দিন জীবনচক্রে ইহুদিদের দৌরাত্ম্য

একটা সময় ছিল, যখন অর্থের চেয়ে সৃজনশীলতায় মানুষ বেশি আনন্দ খুঁজে পেত। বেছে বেছে এমন জিনিসকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করত, যা করে আনন্দ পাওয়া যেত। অর্থের চেয়ে মানসিক প্রশান্তি-ই ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার মনস্তত্ত্বকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে পূর্ণরূপে ব্যবহার করত। নিজেকে স্রষ্টারূপে কল্পনা করতে পারাটা তাদের কাছে ছিল গর্বের বিষয়।

মনের সুখে গান গেয়ে সকাল-সন্ধ্যা মাঠে কাজ করে যেত কৃষাণের দল। রোগে-শোকে তাদের সাহায্য করতে মাঠে এগিয়ে আসত কৃষাণীর দল। তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্মান, মায়া, ভালোবাসা ইত্যাদি কোনোটির কমতি ছিল না। মৌসুম শেষে তারা যতটুকু ফসল পেত, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। তাদের মনে অতি লোভ বলতে কোনো বিষয় ছিল না। তা ছাড়া একের বিপদে অন্যজন এগিয়ে আসা ছিল সামাজিক রীতি।

গৃহপালিত প্রাণীগুলোর প্রতি ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। নিজ সন্তানের মৃত্যুতে কৃষাণির বুক চিরে যতটা আর্তনাদ শোনা যেত, ততটাই আর্তচিৎকার ভেসে উঠত দুই মাসের একটা বাছুর মারা গেলেও। পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই তাকে সহমর্মিতা জানাতে ছুটে আসত। এমনও দিন যেত, যখন ক্ষরা বা অতি বৃষ্টির দরুন মাঠের সব ফসল নষ্ট হয়ে যেত, তবুও তাদের গোয়াল ঘরে থাকা নিষ্পাপ প্রাণীগুলো কখনো অভুক্ত থাকেনি। সন্তানদের অভুক্ত না রাখতে বাবা-মায়েরা যেমন কম খেয়ে দিনানিপাত করত, তেমনি নিষ্পাপ এই প্রাণীগুলোর জন্যও তারাও অর্ধভুক্ত থাকত।

অভাব-দরিদ্রতা কেবল পেট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; বুক পেরিয়ে মগজ পর্যন্ত উঠতে পারেনি। কারণ, এই চিন্তা বুক পেরিয়ে মাথায় উঠে গেলে– তা লোভ-লালসায় রূপ নিতে পারে, যা পৃথিবীর সকল ধন-সম্পদ দিয়েও মেটানো সম্ভব নয়। এই সুন্দর সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো– মানুষের মগজে লোভ-লালসার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া। এটাই একমাত্র অস্ত্র, যা পৃথিবীর যেকোনো সুন্দর সমাজব্যবস্থাকে মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর ইহুদিদের সুদি ব্যাংকগুলো এই বিশেষ অস্ত্রের পেছনেই কাজ করেছে।

ডলারভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু হওয়ায় আমেরিকার প্রতিটি মানুষ এটিকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নিরূপায় হয়ে কৃষকরা নিজেদের সকল সম্পদ (স্বর্ণ-রৌপ্য) তুলে দেয় ব্যাংকের হাতে। সেইসঙ্গে সঙিন করে নেয় বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ। আগেই বলা হয়েছে, ফেড চালু হওয়ার পর বাছাই করে করে শুধু উৎপাদনশীল খাতগুলোর ওপরই অধিক সুদের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এই সুদের বর্ধিত খরচ মেটাতে কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই ধাক্কায় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম মুহূর্মুহু করে বাড়তে শুরু করে। সীমিত আয়ের মানুষদের ছটফটিয়ে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। এদিকে কৃষকেরই-বা কী করার আছে? তাদেরও তো বর্ধিতমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হবে! নতুবা সুদের অর্থ পরিশোধ করবে কীভাবে? সমাজে যারা অভিজাত এলাকায় বসবাস করে, তারা কি আদৌ গ্রামের এই কৃষকদের আর্তনাদ শুনতে পায়?

ইহুদিভিত্তিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোও নিজদের কাজে নেমে পড়ে। তাদের হাতে আছে কলম, যা পৃথিবীর যেকোনো মরণাস্ত্রের চেয়ে অধিক ধ্বংসাত্মক। তারা একের পর এক কলাম প্রকাশ করতে শুরু করে। যেখানে গ্রামের কৃষকদের অতি মুনাফালোভী, মজুতদার, অন্ন ডাকাত ইত্যাদি বলে প্রচার শুরু করে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে এগিয়ে আসে আমেরিকান প্রশাসন।

সরকারিভাবে প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়, যেন শহরে বসবাসরত মধ্যবিত্তদের কোনো সমস্যা না হয়। কিন্তু সরকারি ভাবে যে বিক্রয়মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়, তা দিয়ে কৃষকদের উৎপাদন খরচই উঠে না। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন ফসল নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তো রয়েছেই! রাগে-দুঃখে তারা নিজেদের শস্যখেত নিজেরাই পুড়িয়ে দেয়। দুধ-ডিমের অপ্রত্যাশিত কম বিক্রয়মূল্য দেখে কৃষকরা নিজের হাতেই সব নষ্ট করতে শুরু করে।

তবে পৃথিবীতে তো বেঁচে থাকতে হবে! শুরু হয় খাদ্যে ভেজাল মেশানোর যুগ। যে কৃষকরা একসময় নিজের রক্ত-ঘামে ভেজা হাতে ফসল ফলাত, সেই হাত দিয়েই তারা আজ খাদ্যে বিষ মেশাতে শুরু করে। নিজেদের এই অধঃপতন দেখে ভগ্ন হৃদয়ে সন্তানদের বলছে– 'শহরে গিয়ে পড়ালেখা করে অন্য কোনো কাজ করো; কৃষক হওয়ার প্রয়োজন নেই।' এভাবেই আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যায় সৃজনশীলতার স্বর্ণালি অধ্যায়। সেই সন্তানরা পড়ালেখা করে আজ যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, তার সবই প্রায় ইহুদিদের অঙ্গ সংগঠন!

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের গল্প তো আগেই বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ডের ওপর কমিউনিস্টরা সিংহাসন গেঁড়ে বসেছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে গড়ে তুলেছে ফেমিনিস্ট সোসাইটি। বলে রাখছি, এই তথাকথিত নারীবাদী ফেমিনিস্ট সোসাইটি একদিন প্রতিটি রাষ্ট্রের-ই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সমাজের যে নারীরা একসময় স্বামীর বুকে আশ্রয় খুঁজত, আজ সেই নারীরা ইহুদিদের প্ররোচনায় পড়ে অর্ধনগ্ন হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। তাদের চোখে যিশু তো নারী অধিকার লুণ্ঠনকারী দোসর!

ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার দরুন ফেমিনিজমের মতো নতুন নতুন অজস্র পরগাছা পুরো পৃথিবীজুড়ে গড়ে উঠবে। নতুন প্রজন্ম হয়তো আর জানতে পারবে না, যিশুর প্রকৃত পরিচয় কী এবং কেন তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তারা বুঝবে না, কেন বাইবেলে মেয়েদের শালীন ও পর্দানশীল হতে বলা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে বহু আগেই প্রার্থনা সংগীতের চর্চা উঠে গেছে। লাইব্রেরিগুলোতে ধর্মতত্ত্বের পরিবর্তে ইহুদি সাহিত্য জায়গা করে নিয়েছে। সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মনগড়া সব গল্পের বই।

ইহুদিরা ধর্মের শিকড় কেটে দেওয়ার যত চেষ্টাই করুক না কেন, এই পৃথিবী থেকে তো সৃষ্টিকর্তার পরিচয় মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। সামান্য চিন্তাশীল মানুষও যদি হৃদয়ের চোখ দিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাতে শুরু করে, তবে অবশ্যই মহান সৃষ্টিকর্তার সাড়া খুঁজে পাবে। তাই শিকড় কাটতে হলে প্রতিটি মানুষকে হৃদয় শূন্য করতে হবে। যেহেতু তা করা সম্ভব নয়, তাই এই আবেগকে নিয়ে ইহুদিরা ভিন্ন খেলায় মেতে উঠেছে। গির্জাগুলোতে আজ পাদরিদের চেয়ে রাবাইদের দৌরাত্ম্য যেন অধিক বেশি। তারা বলে–

> 'আমরাই সৃষ্টি কর্তার মনোনীত সম্প্রায়। আমরা তোমাদের নিকট রক্ষাকর্তা পাঠিয়েছি। আমরা তোমাদের নিকট বাইবেল পাঠিয়েছি। সুতরাং ইজরাইল যাও এবং আশীর্বাদ নিয়ে এসো।'

Karl Marx-এর ধ্বংসাত্মক সমাজতন্ত্রের নাম করে ইহুদিরা পুরো রাশিয়াজুড়ে কী তাণ্ডব চালিয়েছে, সে গল্প আশা করি আপনাদের মনে আছে। 'ন্যায়ভিত্তিক' সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নাম করে তারা রাশিয়ার সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করেছে। আগেই বলেছি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই পৃথিবী এমন এক সময় পার করেছে, যখন অর্থনীতির ওপর লেখা দশটি বইয়ের মধ্যে আটটি-ই লিখেছে ইহুদি লেখকরা। সেগুলো আজ পৃথিবীর বিখ্যাত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। নতুন প্রজন্মগুলো গড়ে উঠছে মানসিক প্রতিবন্ধিরূপে।

স্কুল-কলেজ ও গির্জাগুলো আজ যেন কমিউনিস্টদের দূর্গ হয়ে উঠেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত-ঘামে নির্মিত যে সমাজ, তা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই ধ্বংস হতে বসেছে। যে জাতির ইতিহাসে শিক্ষা নেই, সে জাতিকে মেরুদণ্ডহীন বলাই শ্রেয়। আমরা হলাম তেমনই এক মেরুদণ্ডহীন জাতি।

১৯১৭-১৮ সালের দিকে কোনো এক ম্যাগাজিন পত্রিকা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, যাতে কিছু প্রশ্ন করা হয়। যেমন : আমাদের সমাজের কী হয়েছে? আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কী পড়ানো হচ্ছে? আমাদের তরুণ-তরুণীরা এত উগ্রতায় মত্ত হয়ে পড়ছে কেন?

এর উত্তর খুবই সহজ; শিক্ষা ব্যবস্থা। বলশেভিক আন্দোলনকারীরা ইতোমধ্যে পৃথিবীর অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বামপন্থি দলের জন্ম দিয়েছে। প্রতিটি জায়গায় একদল প্রফেসর এবং তাদের অনুগত কিছু শিষ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে লেনিন-ট্রটস্কিকে বিপর্যস্ত মানবতার আদর্শ নেতা হিসেবে উপস্থাপনে চেষ্টা করে যাচ্ছে; অনেকাংশে সফলও হয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন প্রফেসরকে তারা অর্থের বিনিময়ে কিনেও নেয়, যা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পর্যন্ত জানে না। পরে এই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঝান্ডা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। খুব অল্পতে উঠতি বয়সি শিক্ষার্থীরা নিজেদের নেতা-কর্মী বলে ভাবতে শেখে। তারা কল্পনা করে, তাদের হাতেই দুনিয়া পালটে যাবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, এই ক্ষমতার দৌড় কতটুকু। তারা নিজেদের রুশ বিপ্লবের লাল পতাকাবাহী বলে কল্পনা করে। তাদের দ্বারা বিপ্লব চালিয়ে নিতে ইহুদিভিত্তিক ব্যাংকগুলো থেকে আসতে থাকে পানির মতো বিনিয়োগ।

রুশ বিপ্লবে ছাত্র রাজনীতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে কথা কেবল তারাই বলতে পারবে, যারা এই বিপ্লব নিজ চোখে দেখেছে। তাই বিপ্লবকালে খাদ্য সংকট যেন মহামারি রূপ ধারণ না করে, সে জন্য Maxim Gorky ছাত্র রাজনীতিবিদদের জন্য নিয়মিত খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। বলতে বাধা নেই, এই বামপন্থি দলগুলোর সহায়তার বলে-ই ইহুদিদের বিষাক্ত সংস্কৃতি আমাদের সমাজকে প্রতিনিয়ত কলুষিত করে যাচ্ছে।

তর্ক-বিতর্ক কখনো সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমরা যে মানসিক দাসত্বের বন্ধনে ইতোমধ্যেই আটকে পড়েছি, তা থেকে নিজেদের রক্ষা করার একটাই উপায়; শিক্ষার আলো জাগ্রত করা। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের চাদরে যে ইউরোপ একসময় চাপা পড়েছিল, সেও আলোর সন্ধান পেয়েছে কেবল প্রকৃত শিক্ষার বদৌলতে।

মহান সৃষ্টিকর্তা এ পর্যন্ত আমাদের মাঝে অসংখ্য পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, যাদের কল্যাণে এই অসভ্য মানবজাতি সভ্যতার সন্ধান পেয়েছে। যে মনীষীদের কল্যাণে আমরা আজকের আলোকিত সমাজব্যবস্থা পেয়েছি, তাদের গল্প সন্তানদের শোনাতে হবে। যদিও এই সমাজের চৌকাঠগুলোতে ঘুণ ধরেছে, তবুও আশা রাখি– উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে চৌকাঠগুলো ঘুণমুক্ত করা সম্ভব হবে। আমাদের সন্তানরা যদি জানত, তাদের শরীরের কাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের ইতিহাস কতটা গৌরবময়, তাহলে কখনো এই মানবরূপী ভণ্ড ইহুদিদের বানোয়াট সব মতবাদে নিজেদের উজার করে দিত না।

প্রকৃত খ্রিষ্টানরূপে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে চাইলে ইজরাইলের ইতিহাস নিয়েও অধ্যয়ন করতে হবে। আব্রাহাম, জ্যাকব, মোজেস, জোসেফ ও ইজরাইলের ১২টি গোত্রের প্রতিটির পরিচয় জানতে হবে। কেন তাদের ওপর অভিশাপ এলো এবং কেন তাদের জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত করা হলো; সব জানতে হবে। এই শিক্ষার কোনো শেষ নেই; নতুবা ইহুদি শয়তানরা ভালো মানুষরূপে প্রতিবার আমাদের ধোঁকা দিয়ে যাবে।

ইহুদি বিতর্ক নিয়ে জ্যান্টাইলদের প্রতি কিছু সতর্কবাণী

আমাদের একটি সমস্যায় প্রায়ই পড়তে হয়, যখন চিন্তা করি নন-ইহুদি সম্প্রদায়দের একত্রে কী বলে সম্বোধন করা উচিত?

জ্যান্টাইল শব্দটি এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সমাধান হতে পারে না। যখন আমরা ইহুদিদের কোনো সদস্যকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করি, তখন সে ভালো করেই জানে, সে একজন ইহুদি। ইহুদিদের প্রতিটি সদস্য একে অপরকে সনাক্ত করতে সক্ষম। এ কারণে যদি ইহুদিদের কোনো এক সদস্যকে উদ্দেশ্য করে কেউ সমালোচনা করে, তবে তাকে রক্ষায় পুরো জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর যেখানেই ইহুদিরা অবস্থান করুক না কেন, নিজ জ্ঞাতি-ভাইদের সকল প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের নিকট মজুদ থাকে। দূরত্ব বাড়লেও ইহুদিদের বন্ধন কখনো দুর্বল হয় না।

এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য জ্যান্টাইলদের মাঝে পাওয়া যাবে না। পুরো বিশ্বে ইহুদিদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যেমন এক ও নির্দিষ্ট, জ্যান্টাইলদের বেলায় তেমনটা নয়। এ কারণে জ্যান্টাইলদের পক্ষে একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। জ্যান্টাইলদের রয়েছে বহু ভাষা, ধর্ম, জাতীয়তা ও সংস্কৃতি। এ কারণে প্রকৃতিগতভাবেই জ্যান্টাইলরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, যা থেকে তাদের কোনো মুক্তি নেই।

তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা হাতিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন রকমের সুবিধা, যা ইতিহাসে অসংখ্যবার প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও জ্যান্টাইলদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে, যারা এই জাতিগোষ্ঠীটির নানান অপরাধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গেয়ে তাদের সকল উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে। এ কারণে বলতে হয়–

> 'স্রষ্টা কিছু কিছু মানুষের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন, যারা চোখ থাকতেও দেখে না এবং কান থাকতেও শুনতে পায় না।'

আন্তর্জাতিক বিশ্বে ইহুদিরা যে ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করেছে, তা দেখে মনে হয়– তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কখনেই সফল হওয়া যাবে না। খ্রিষ্টানদের অবস্থা আজ এমন, যেন ইহুদিদের পরিয়ে দেওয়া চশমা ব্যতীত বাইবেল পাঠ করা অসম্ভব। এ কারণে তারাও বিশ্বাস করে, ইহুদিরা স্রষ্টা মনোনীত সম্প্রদায় এবং একদিন তারাই বিশ্বশাসন করবে। অন্ধের মতো বাইবেলের এমন সব ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ার দরুন খ্রিষ্টানরা আজ ভয়ানক রকমের বিভ্রান্তিতে পড়েছে।

ইহুদিদের 'শান্তি! শান্তি!' নামক মিথ্যে বুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা ইতোমধ্যে অনেকটা সময় পার করেছি। সততা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে তারা যা করছে,

তা এককথায় ভণ্ডামি। গত কয়েক দশক ধরে Kehillah, American Jewish Committee, Anti-Defamation League-সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তাল মিলিয়ে জ্যান্টাইল সমাজ বহু লজ্জার জন্ম দিয়েছে।

বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে বিশ্ব গণমাধ্যমের সিংহভাগ অংশই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে চাইলেও ঘুমিয়ে থাকা জ্যান্টাইল জাতিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। যেখানে আমাদের সন্তানরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় পার করছে, সেখানে পরিণত বয়সে বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীটির বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের মস্তিষ্কে আমূল পরিবর্তন আনা সহজ কোনো কাজ নয়।

বলে রাখা উচিত, যেকোনো বড়ো ধরনের বিপ্লবের শুরুটা কিন্তু অল্প কিছুসংখ্যক মানুষের হাত ধরেই হয়। আমরা যদি নিয়মিত ইহুদিদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত থাকি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ (যা বিষাক্ত) বর্জনের তালিকায় নিয়ে আসি, তবেই তা জায়োনিস্টদের অন্তরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আরও ভালো হয়, যদি আমরা পুনরায় আমাদের হারিয়ে যাওয়া নৈতিকতাকে জাগিয়ে তুলতে পারি।

আধুনিক অর্থব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত, আমাদের উচিত সে প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া। ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা উপার্জনের পরিবর্তে আমাদের উচিত, পণ্যের গুণগত মানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা। তবে এটা ঠিক, ইহুদিরা কখনো হাল ছাড়বে না। তারা চারদিক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করে যাবে এবং মনুষত্বহীন জাতিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

একটা যুগ ছিল যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মূল্য তালিকার পরিবর্তে পণ্যের গুণগত মানকে বেশি প্রধান্য দিত, সে সময়ে বাজার ছিল জ্যান্টাইলদের নিয়ন্ত্রণে। এরপর আসে ইহুদি বণিকদের যুগ, যাদের দৌড়াত্ম্যে বাজার হয়ে পড়ে একচেটিয়া।

নকল করার কাজে ইহুদিরা কতটা দক্ষ, তা ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অসহায় ক্রেতারা না বুঝে, পণ্যের গুণগত মানের কথা না ভেবে, ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি বিপণিগুলোতে হাজির হতে শুরু করে। অপরদিকে বিক্রি কমে যাওয়ার দরুন জ্যান্টাইল বণিকরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারাও ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষ যখন বুঝতে পারে, সস্তা মূল্যে তারা যা খাচ্ছে তা কেবলই বিষ, তখন তারা পুনরায় জ্যান্টাইলদের বিপণিগুলোতে ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু ততদিনে চারদিক ভেজাল পণ্যের ব্যবসায়ীতে ভরে গেছে।

ইহুদিদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হতে নিজেদের রক্ষা করার আরেকটি উপায় হলো– তথাকথিত উদারপন্থি ও মুক্তচিন্তাধার নীতির নামে যে মতবাদগুলো নিয়মিত সমাজে ঢুকে পড়ছে,

তা গ্রহণ করার পূর্বে এর উৎস, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা। আমোদ-বিনোদনের খোরাক হিসেবে যেসব চলচ্চিত্র, নাটক-থিয়েটার ও কৌতুক-অভিনয়ের পেছনে আমরা নির্বোধের মতো সময় পার করছি, বুঝতে পারছি না এর ভেতরে কী ভয়ংকর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। সুকৌশলে উশৃঙ্খলতা ও সাম্প্রাদায়িকতার বিষ আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সংবাদপত্রে যা নিয়মিত পাঠ করছি, তার কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, তা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহুদিদের অনুমতি ছাড়া আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় বই পাঠ করানো যেন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, কীভাবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করে ব্যাখ্যা করতে হবে, সে কায়দা-কানুনও এখন ইহুদিদের কাছে শিখতে হচ্ছে! বুঝতে পারছি না, আমাদের সন্তানরা যে সকল গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের বই নিয়মিত পাঠ করছে, তার ছলে না জানি কোন চেতনার বিষ মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধীরে ধীরে আমাদের প্রকৃত নেতাদের পরিচয় একেবারে ভুলতে বসেছি। আমরা একদল মানুষের অনুসরণ করতে শুরু করেছি, যারা কিনা আমাদের ভাষায় ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না। আজ না আছে এমন কেউ, যে আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দেবে, আর না আছে এমন কেউ, যে ঈশ্বরের নিকট সঠিক পথের প্রার্থনা করবে। পুরো মাঠ আজ বিরান ভূমি। সেখানে সবাই নখ-দন্তহীন অসহায় বাঘের সমতুল্য। এমতাবস্থায় আমরা যদি হিংস্র কোনো প্রাণী দ্বারা আক্রমণের স্বীকার হই, তবে আমাদের রক্ষায় কেউ এগিয়ে আসবে না।

আমাদের যে পুনরায় পূর্বের সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে, তা এখন আর বিবেকের দাবি নয়; বরং সময়ের দাবি। এর চেয়ে আরও অধঃপতনের দিকে চলে গেলে সমাজকে আর শুধরে নেওয়া সম্ভব হবে না। আমাদের স্কুল-কলেজগুলোকে এক্ষুনি ইহুদিদের শয়তানি প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। আমাদের সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম এবং সিলেবাসের ওপর ইহুদিরা যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এক্ষুনি সরিয়ে দিতে হবে। আমাদের আদালত ব্যবস্থাকে তাদের থাবা থেকে সরিয়ে নিরপেক্ষরূপে গড়ে তুলতে হবে। ধর্মীয় উপাসনায়গুলোতে পূর্বের পবিত্র সব রীতি পুনরায় চালু করতে হবে। মত প্রকাশের প্রকৃত স্বাধীনতা তথা প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৯২২ সালের জানুয়ারিতে *Atlantic Monthly* পত্রিকায় নিউইয়র্কের এক রাবাইয়ের মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, ইহুদিরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত সম্প্রদায়। তারপরও এ জাতির সদস্য হতে পেরে তিনি ভীষণ গর্বিত। এ জাতির ওপর সহস্র বছর ধরে যে নিপীড়ন চলেছে, তার প্রধানতম কারণ হলো– জ্যান্টাইলদের অ্যান্টি-সেমিটিক মনোভাব। কিন্তু আগের অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরা হয়েছে, কেন ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এত সব নিপীড়ন চালিয়েছে।

এতসব কিছুর পরও ইহুদিদের জন্য সম্মান উপার্জনের একটি পথ খোলা আছে। আর তা হলো- সত্য স্বীকার করা। ইহুদিদের প্রকৃত ইতিহাস; কেন সাধারণ মানুষ তাদের এত বেশি ঘৃণা করে এবং কেন তাদের এত নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, এসবের প্রকৃত ইতিহাস কেবল ইহুদিদের কাছ থেকেই জানা সম্ভব। আমরা তাদের ব্যাপারে যা বলি এবং যেসব তথ্য প্রকাশ করি, তার অধিকাংশই মূলত ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং ঐতিহাসিক দলিলের ওপর ভিত্তি করে। আমরা ইহুদিদের সম্পর্কে জানতে যেখানে বিভিন্ন দলিলের অনুসন্ধান করি, সেখানে তারা সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং ইহুদিদের ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য কেবল তাদের মুখ থেকেই জানা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাস বলে, ইহুদিরা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সত্যকে। তাদের ক্ষমতার ভিত্তি কেবল মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি।

বাইবেলে ইহুদিদের সম্পর্কে হাজার বছর পূর্বে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে, তা এখন বাস্তবায়ন হতে চলেছে। নব্য ইজরাইল প্রতিষ্ঠার পথে তারা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তবে এই নব্য ইজরাইল বিশ্ব মানবতার জন্য কতটা হুমকিস্বরূপ, তা দিনে দিনে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আলোচনার শেষাংশে বলতে চাই, যে হাজার হাজার পাঠক ও সমালোচক DEARBORN INDEPENDENT-এর নিকট তাদের মতামত পাঠিয়েছেন, তাদের একটি বিষয় বেশ ভালো লেগেছে, তারা কেউ-ই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নিয়ে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেনি। শুরুর দিকে বেশ কিছু রাবাই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নিয়ে বহু উসকানিমূলক মন্তব্য ছড়ালেও ধীরে ধীরে নীরব হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা নতুন কোনো ফন্দি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যে আলোচনার দ্বার বহুকাল মানবসমাজে রুদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল, তা উন্মুক্ত করতে DEARBORN INDEPENDENT-এর যে প্রচেষ্টা, তা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ আরও বেশি মুক্ত আলোচনামুখী হয়ে উঠবে– এটাই প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যাশা। এই আলোচনায় যুক্ত হতে হবে আন্তর্জাতিক পত্রিকা সংস্থাগুলোকে; নতুবা সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে, সত্য যতই তিক্ত হোক না কেন, এটাই একমাত্র ওষুধ, যা পুরো মানবজাতিকে অশুভ শয়তানের বিরুদ্ধে এক করতে পারে।

অনুবাদক পরিচিতি

ফুয়াদ আল আজাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। অনুবাদ সাহিত্যে তরুণদের মধ্যে অন্যতম একজন। 'সিক্রেটস অব জায়োনিজম : বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির' তার অনূদিত প্রথম গ্রন্থ। জন্মেছেন কুমিল্লা শহরের বুড়িচং থানায়। স্বপ্ন দেখেন এক নৈতিক সমাজব্যবস্থার; যেখানে সাম্য, ইনসাফ, উদারতা আর মানবতার বসবাস হবে একসাথে।
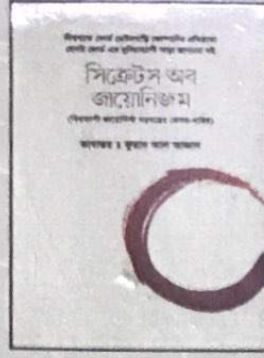
আমেরিকার বিখ্যাত ফোর্ড মোটরগাড়ি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মালিক হেনরি ফোর্ড। কর্পোরেট দুনিয়ার অন্যতম সফল উদ্যোক্তা। কোম্পানি পরিচালনা করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে তাঁর তো চক্ষু চড়কগাছ! এ কি! ইহুদিদের জায়োনিস্ট জাল অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে পৃথিবীকে! তিনি উপলব্ধি করলেন, পৃথিবীর শান্তি অব্যাহত রাখতে হলে বিশ্ববাসীকে জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম কীভাবে ফাংশন করে, তা জানিয়ে দিতে হবে।

ফোর্ড ১৯২০ সালে শুরু করলেন নিজের পত্রিকা *দ্যা ডিয়ারবর্ন ইনডিপেন্ডেন্ট*। সেখানে ৯১ পর্বের ধারাবাহিক কলামে তুলে ধরলেন দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত ইহুদি নেটওয়ার্ক। আমেরিকান ব্যবসায়ীর কলমে জায়োনিস্ট মুখোশ উন্মোচিত হওয়ায় চারিদিকে শুরু হলো তুমুল হইচই। ইতোমধ্যে ফোর্ড-এর কলামসমূহ একত্রিত করে চার খণ্ডের বই তৈরি হলো; নাম- ***The International Jew***। প্রতিক্রিয়ায় ইহুদি লবি জবাব দিতে লাগল। আমেরিকা থেকে কয়েকদিনের ব্যবধানেই সব বই লাপাত্তা! ফোর্ড-এর পত্রিকার বিরুদ্ধে সম্প্রীতি নষ্টের উসকানির অভিযোগ উঠল। ১৯২৭ সালে বন্ধ করে দেওয়া হলো তাঁর পত্রিকা এবং আলোচিত এই বই।

কিন্তু চাইলেই কি সব বন্ধ করে দেওয়া যায়? আশির দশকে আবার প্রকাশিত হলো বইটি। দুনিয়াব্যাপী ২৩টি ভাষায় অনূদিত হলো। বিশ্বখ্যাত সেই বইটির বাংলা অনুবাদ 'সিক্রেটস অব জায়োনিজম : বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির'।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789848 254684